গীতাপাঠ।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রণীত।

প্রকাশক

ইণ্ডিয়ান প্রেস

এলাহাবাদ।

১৩২২ সাল।

প্রকাশক
শ্রীঅপূর্ব্ব কৃষ্ণ বসু—ইণ্ডিয়ান প্রেস
এলাহাবাদ।

এই "গীতাপাঠ" তত্ত্ববোধিনী এবং প্রবাসীতে ছাপাইতে দিবার পূর্ব্বে সময়ে সময়ে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মবিদ্যালয়ের আচার্য্যগণের সভা আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে উত্তরোত্তর-ক্রমে শুনানো হইয়াছিল, তাই ইহার অধ্যায়গুলি'র নাম দেওয়া হইয়াছে "অধিবেশন।"

কলিকাতা
৫৫নং অপার চিৎপুর রোড্
আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে
শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।
১৩২২ সাল।

মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র।

গীতাপাঠ।

শান্তিনিকেতনের নিভৃত আশ্রমে গীতাপাঠের প্রথম অধিবেশন।

ভূমিকা। (১)

এ শান্তিনিকেতন। আমার কুটীরে বিনা-তৈলে একটি দীপ জ্বলিতেছে—ভগবদ্‌গীতা। আমাদের দেশের মস্তকের উপর দিয়া এত যে বাত্যার উপর বাত্যা চলিয়া যাইতেছে—কিন্তু আশ্চর্য্য ঈশ্বরের মহিমা—উহার অটল জ্যোতি সেকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত সমান রহিয়াছে—ক্ষণকালের জন্যও ক্ষুব্ধ বা ম্লান হয় নাই। পশ্চিমের সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান একত্র পুঞ্জীভূত হইয়া যত না আলোকছটা দিগ্‌দিগন্তরে বিস্তার করিতেছে—আমাদের ঐ ক্ষুদ্র দীপের অপরাজিত শিখা সে সমস্তেরই উপরে মস্তক উত্তোলন করিয়া স্বর্গীয় মহিমায় দীপ্তি পাইতেছে। উহা হইতে যে একপ্রকার সূক্ষ্ম বাষ্প উদ্‌গীরিত হইতেছে তাহাতে আমাদের দেশের বায়ু পবিত্র হইতেছে; আর সেই বাষ্পনিচয়ের শ্বেতাভ্র হইতে বিন্দু বিন্দু শান্তিবারি যাহা আমাদের ত্রিতাপতপ্ত হৃদয়ে সিঞ্চিত হইতেছে তাহা মৃতসঞ্জীবনী সুধা, তাহা অমরত্বের সোপান। আমার শরীর যখন শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন—কোনো কার্য্যে হস্তার্পণ করিতে যখন আমার মন উঠিতেছে না, সেই সময়ে

একছিটা অমৃত আমার গায়ে লাগিল; তাহা এই যে, "উদ্ধরেৎ আত্মনাত্মানং নাত্মানং অবসাদয়েৎ" আত্মার বলে আত্মাকে টানিয়া তুলিবে—আত্মাকে অবসন্ন হইতে দিবে না। এই আরোগ্যদায়িনী কল্যাণ-বাণীর মন্ত্রবলে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কুটীরের যথাসর্ব্বস্ব কাঙালের সম্বল আশপাশ হইতে কথঞ্চিৎপ্রকারে জড়ো করিয়া থাল সাজাইয়া আনিয়াছি—শান্তিনিকেতনের সজ্জনসেবায় তাহা বিনিয়োগ করিয়া ধন্য হইব—ইহারই প্রত্যাশায়। অতএব আর কালবিলম্ব না করিয়া—"ওঁ যোদেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যোবিশ্বং ভুবনমাবিবেশ। যওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ" যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি বিশ্বভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে সেই দেবতাকে বার বার নমস্কার করি; এবং তাঁহার প্রসাদ যাচ্ঞা করিয়া অনুষ্ঠিতব্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হই।

ভগবদ্গীতার প্রথম পইঠাতেই সাংখ্যশাস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। গীতার সে যে সাংখ্য তাহা কি এই সাংখ্য অর্থাৎ যাহা সাংখ্যকারিকা গ্রন্থে আর্য্যাচ্ছন্দে সূত্রপরম্পরায় গ্রথিত হইয়াছে—সেই সাংখ্য? না তাহার অধিক আর কিছু? এবিষয়ের মীমাংসার জন্য দার্শনিক পুরাতত্ত্বের অন্ধকার হাতড়াইয়া বেড়াইবার বিশেষ কোনো প্রয়োজন দেখিতেছি না। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, সাংখ্যকারিকা-গ্রন্থের মূল বচনগুলি সমস্তই গীতার অনুমোদিত। এই জন্য গীতার ব্যাখ্যায় সহসা প্রবৃত্ত না হইয়া ভূমিকা স্বরূপে সাংখ্যদর্শনের ভিতরের কথাটা বিবৃত করা আবশ্যকবোধে অগ্রে তাহাতেই প্রবৃত্ত হইতেছি। সমগ্রভাবে সাংখ্যদর্শন পর্য্যালোচনা করিবার স্থানও এ নহে, কালও এ নহে, আর, যাহা কর্ত্তৃক তাহা হইতে পারা সম্ভবে সে মানুষও আমি নহি। আমার বিবেচনায়,

আমাদের দেশের ভাষ্যকারদিগের চিরপ্রচলিত প্রথা অনুসারে সাংখ্যদর্শনের উপক্রমণিকা এবং উপসংহারের মধ্য হইতে সাংখ্যের নিগূঢ় মর্ম্মকথাটি সোজাসুজিভাবে সুকৌশলে বাহির করিয়া আনাই সংকল্পিত অভীষ্ট সাধনের সুচারু পন্থা—সেই পন্থা অবলম্বন করাই এস্থলে আমার পক্ষে কর্ত্তব্য। সাংখ্যকারিকার প্রথম সূত্র এই :—

"দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ জিজ্ঞাসা"

আধিভৌতিক আধ্যাত্মিক এবং আধিদৈবিক অর্থাৎ বাহ্য বস্তুঘটিত, আপনাঘটিত, এবং দেবতাঘটিত, এই ত্রিবিধ দুঃখের কিরূপে বিনাশ হইতে পারে, তাহাই জিজ্ঞাসার বিষয়। "তদভিঘাতকে দৃষ্টে হেতৌ সা অপার্থাচেৎ" যদি বল "দুঃখ বিনাশের উপায় তো কাহারো অবিদিত নাই; চিকিৎসাদি দ্বারা রোগ নিবারিত হইতে পারে, প্রিয়-সম্মিলনাদির দ্বারা মনোগ্লানি নিবারিত হইতে পারে, দেবার্চ্চনাদি দ্বারা দৈবকোপ নিবারিত হইতে পারে—এ তো সকলেরই জানা কথা; জিজ্ঞাসা নিষ্প্রয়োজন।" "ন" "না"; "একান্তাত্যন্ততোঽভাবাৎ" সাধিতব্য বিষয় এখানে দুঃখের শুধু-যে-কেবল ক্ষণিক বা আংশিক বিনাশ তাহা নহে পরন্তু দুঃখের ঐকান্তিক এবং আত্যন্তিক বিনাশ—দুঃখ যাহাতে ক্ষণকালের জন্যও ভোক্তাপুরুষের ত্রিসীমা স্পর্শ করিতে না পারে তাহারই জন্য জিজ্ঞাসার প্রয়োজন। ও-সকল লোক-প্রচলিত উপায় দ্বারা দুঃখের আংশিক এবং ক্ষণিক বিনাশ বই ঐকান্তিক বা আত্যন্তিক বিনাশ হয় না। তত্ত্বজ্ঞানই ঐকান্তিক দুঃখ নিবৃত্তির একমাত্র উপায়।

"ঐকান্তিক দুঃখনিবৃত্তি!" কী তেজের কথা! এ কালের কোনো ইংরাজি অধ্যাপক ওরূপ একটা কথা মুখে উচ্চারণ করিতে পারেন কি? তাহা যদি করেন তবে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে প্রত্যুত্তর শুনিতে

হইবে এই যে, From the sublime to the ridiculous there is but a step আশ্চর্য্যরস এবং হাস্যরসের মধ্যে কেবল এক পা ব্যবধান। তিতুমিয়াবীরের অসামান্য সাহস দেখিয়া একদিকে যেমন আমরা আশ্চর্য্যসাগরে নিমগ্ন হই, আর এক দিকে তেমনি আমাদের মনে হাস্যসাগর উথলিয়া ওঠে—কিছুতেই রোধ মানে না। পাড়ার লোকের ম্যালেরিয়া নিবারণ করিবার যাঁহার ক্ষমতা নাই সেইরূপ একজন চিকিৎসক যদি বলেন যে, যম'কে কিরূপে বিনাশ করা যাইতে পারে তাহারই চেষ্টা দেখা যাইতেছে---তবে তাঁহার স্পর্দ্ধাকে ধন্যবাদ দিতে হয়। কিন্তু তাহার মধ্যে একটি কথা আছে—সেটাও বিবেচ্য। তিতুমিয়াবীরের দুঃসাহসিকতা তাহার পক্ষে নিতান্তই বিসদৃশ, তাই তাহা শোভা পায় না; কিন্তু অভিমন্যুকে কিম্বা নেপোলিয়ন বনাপার্টিকে উহা অপেক্ষা সহস্রগুণ দুঃসাহসিকতা শোভা পাইয়াছিল। পঁচিশজন সৈন্যের ভেঁপুর জোরে নেপোলিয়ন দশহাজার অষ্ট্রেলীয় সৈন্যের উপরে জয়লাভ করিয়াছিলেন—ইহা বিগত শতাব্দীর ইউরোপীয় যোদ্ধাগণের দেখা কথা। তেমনি, একালের একজন অমুকানন্দ স্বামী যিনি নামের আনন্দেই আনন্দে আছেন, আর, সেইজন্য দুঃখনিবৃত্তির উপায়চেষ্টা যাঁহার পক্ষে অনাবশ্যক, তাঁহার মুখে ঐকান্তিক দুঃখনিবৃত্তির কথা শুনিলে আমাদের হাসি পাইতে পারে; কিন্তু কপিল মুনির মুখ হইতে উহা অপেক্ষা সহস্রগুণ জোরালো কথা বাহির হইলেও আমাদের কর্ত্তব্য—কথাটা যাহা বলিলেন তাহার মর্ম্মগত ভাবটা যে কি, তাহার ভিতরে তদ্গতচিত্তে তলাইতে চেষ্টা করা। কপিল মুনি জিহ্বা সংযত করিয়া বলিতে পারিতেন যে, "যথাসম্ভব দুঃখনিবৃত্তিই জিজ্ঞাসার বিষয়" কিন্তু তাহা হইলে তিনি কপিল মুনি হইতেন না—তাহা হইলে তিনি একালের ইংরাজি গ্রন্থকারদিগের দলভুক্ত হইতেন। একালের

গ্রন্থসমালোচকেরা ঐকান্তিক সত্যের প্রতি বড়ই নারাজ। দশ আনা সত্যের সঙ্গে অন্ততঃ পাঁচ আনা মিথ্যা মিশ্রিত না থাকিলে সত্য ইঁহাদের মনঃপূত হয় না। কাজেই একালের কৃতবিদ্য লেখকেরা একটি সহজ-শোভন অকৃত্রিম সত্য প্রকাশ করিতে হইলেও যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে বোঝা বোঝা কৃত্রিম বেশভূষায় সাজাইয়া দাঁড় করাইতে না পারেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা পাঠকগণের দৃষ্টি-পথে বাহির করিতে সাহসী হ'ন না। কপিল মুনি যদি বেন্থাম্ হইতেন তবে তিনি বলিতেন—অধিকাংশ লোক কিসে সুখী হইতে পারে তাহাই জিজ্ঞাসার বিষয়। বেন্থামের এটা দেখা উচিত ছিল যে, সুখই যাঁহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাঁহাদের সুখের প্রধান একটি অঙ্গ হচ্চে আপনাদিগকে অধিকাংশ অপেক্ষা সুখসৌভাগ্যশালী বলিয়া জানা, আর জাঁকজমক করিয়া লোককে তাহা জানানো। এ তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে যে, সুখের অনন্যভক্ত উপাসকদিগের মুখে অধিকাংশ লোকের সুখোদ্দেশে জীবন উৎসর্গ করিবার কথা, যেমন—বিগত সার্দ্ধশতাব্দীর ফরাসীস বিপ্লবের দলপতিদিগের মুখে পারিস্ নগরীর আবাল বৃদ্ধ বনিতা যাহাতে দীর্ঘজীবী হইয়া পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে সুখসমৃদ্ধি সম্ভোগ করিতে পারে তাহার উদ্দেশে জীবন উৎসর্গ করিবার কথা, শোভা পায় না; শোভা পায় শুধু এই কথা যে, "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" ঋণ করিয়া ঘৃত ভোজন করিবে। কেননা সুখভোগই যদি মনুষ্যজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় তবে ভোক্তাদিগের আপনার আপনার সুখসমৃদ্ধিই সে উদ্দেশ্যের একমাত্র সাধন-সম্বল, তা বই, অপর ব্যক্তি দিগের সুখসৌভাগ্য সে উদ্দেশ্যের পথের কণ্টক। জর্ম্মান দেশের সুবিখ্যাত তত্ত্ববিৎ কাণ্ট্ আমাদের দেশের তত্ত্বজ্ঞানীদিগের অনেকটা কাছাকাছি আসিয়াছিলেন যদিচ,—কিন্তু তাঁহার দুইমুখা কথাগুলির

ভাব সহজ-ধাঁচার বুদ্ধিতে আঁকড়িয়া পাওয়া সুকঠিন। কাণ্ট্ বলেন যে, অন্তরের অহেতুকী আজ্ঞা পালন করাই—Categorical Imperative-এর কথা শোনাই—ধর্ম্মসাধনের একমাত্র পথ। কাণ্ট্ যদি বলিতেন যে অন্তর্যামী পুরুষের আজ্ঞাপালন করাই ধর্ম্মসাধনের একমাত্র পথ, তবে তাঁহার কথা আমরা সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য্য করিতাম; কিন্তু তাহা বলিতে তিনি ইতস্তত করিয়াছেন অতিমাত্র। কাণ্ট্ তাঁহার নিজের কথার অসম্পূর্ণতা নিজে অনেকটা বুঝিতে পারিয়াও তাহার যথোচিত প্রতিবিধান করিতে পারিয়া ওঠেন নাই। এটা তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, অন্তরের অহেতুকী আজ্ঞার সঙ্গে যদি কোনো প্রকার কার্য্যপ্রবর্ত্তনী শক্তি সংযুক্ত না থাকে তবে তাহা ফাঁকা আওয়াজ বই আর কিছুই নহে। রাজাজ্ঞার সহিত যদি রাজবল বা প্রজাগণের রাজভক্তি সংযুক্ত না থাকে তবে তাহা যেমন জনসমাজের কোনো উপকারে আসে না, তেমনি অন্তরের অহেতুকী আজ্ঞার সঙ্গে কার্য্যপ্রবর্ত্তনী শক্তি সংযুক্ত না থাকিলে তাহাতে কোনো ফল দর্শিতে পারে না। কাণ্ট্ আর কোনো কার্য্যপ্রবর্ত্তনী শক্তি খুঁজিয়া না পাইয়া বলিলেন যে, নিয়মের প্রতি ভক্তিই কর্ত্তব্য কার্য্যের একমাত্র প্রবর্ত্তক। কাণ্টের এ কথায় সহজ লোকের মন কিছুতেই প্রবোধ মানিতে পারে না। রাজনিয়মের প্রতি ভক্তি রাজভক্তি ছাড়া আর যে কি তাহা বুঝিতে পারা সুকঠিন। যদি বল যে, সাধারণতন্ত্র-রাজ্যের রাজা নাই অথচ রাজনিয়ম আছে—এমত স্থলে রাজনিয়মকে রাজা অপেক্ষাও বড় বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার প্রতি ভক্তি সমর্পণ করা সকলেরই উচিত। কিন্তু একটা প্রাণশূন্য বৈজ্ঞানিক মূলতত্ত্বকে ভক্তি করা উচিত বলিলেই তো আর তাহার প্রতি আমাদের ভক্তি যায় না। আমেরিকার রাজ-সভাপতি Lincoln-এর তুল্য সাধারণতন্ত্রের মস্তক-

শ্রেণীয় লোকেরা যদি ভক্তির উপযুক্ত পাত্র হ'ন, তবে সাধারণতন্ত্রের রাজনিয়মের প্রতি ভক্তি বলিলে—হয় বুঝায় সেই মস্তকশ্রেণীর লোকদিগের প্রতি ভক্তি, নয় বুঝায় ওয়াশিঙ্‌টনের ন্যায় দেশের পিতৃপুরুষদিগের প্রতি ভক্তি, তা বই, দণ্ডবিধির প্রতি ভক্তি যে কিরূপ পদার্থ তাহা সহজ লোকের বুদ্ধির অগোচর। নিয়মের প্রতি ভক্তি না বলিয়া কাণ্ট্‌ বলিতে পারিতেন অন্তর্যামী পুরুষের প্রতি ভক্তি। কিন্তু কাণ্ট্‌ ধর্ম্ম-নিয়মের গোড়ায় প্রকৃতিকেও যেমন স্থান দিতে নারাজ—প্রকৃতির অধীশ্বর পরমাত্মাকেও তেমনি স্থান দিতে নারাজ। তিনি বলেন ধর্ম্মের নিয়ম জীবাত্মার স্বনিয়ম Autonomy ; পুনশ্চ বলেন যে, আপনার নিয়মে নিয়মিত হওয়ার নামই ধর্ম্মের নিয়মে নিয়মিত হওয়া, আর, তাহারই নাম স্বাধীনতা। কাণ্টের এ কথা যদি সত্য হয়—ধর্ম্মের নিয়ম যদি আমার আপনার নিয়ম হয়, তবে তাহার প্রতি আমার ভক্তি যাইবে কেমন করিয়া ? আপনার পুত্রের প্রতি পিতার ভক্তি যেমন একটা অসঙ্গত কথা, আপনার নিয়মের প্রতি আপনার ভক্তি সেইরূপ একটা অসঙ্গত কথা ইহা কে না স্বীকার করিবে ? প্রকৃত কথা এই যে, ঈশ্বরের ঐশী শক্তির নামই প্রকৃতি ; অন্তর্যামী পুরুষ বলিলে ঈশ্বর এবং ঐশীশক্তি দুইই এক সঙ্গে বুঝায়। আমাদের শাস্ত্রানুসারে (১) ঈশ্বরের প্রেরণা (২) অন্তর্যামীপুরুষের প্রেরণা এবং (৩) মঙ্গলময়ী আদ্যা প্রকৃতির প্রেরণা এ তিনের মধ্যে বস্তুত কোনো প্রভেদ নাই। আর, ঐশীশক্তি যেহেতু সমস্তেরই কারণ—তাহার উপরে যেহেতু আর কোনো কারণ নাই, এইজন্য ঐশীশক্তির প্রেরণাকে অহেতুকী প্রেরণা বলিলে কোনো দোষ হয় না, আর সেই অহেতুকী প্রেরণাকে অন্তর্যামী পুরুষের অহেতুকী আজ্ঞা বলিলেও তাহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে কাহারো বিলম্ব হয় না। কিন্তু যে ভাষায় সে আজ্ঞা বিশ্বভুবনে প্রচারিত হয়,

সে ভাষা সংস্কৃত ভাষাও নহে, ইংরাজী ভাষাও নহে, জর্ম্মান্ ভাষাও নহে—সে ভাষা হ'চ্চে রজোগুণের প্রবর্ত্তনা বা দুঃখের উত্তেজনা। উদরে যখন ক্ষুধানল প্রজ্বলিত হয়, তখন সেই অহেতুকী আজ্ঞার বা অহেতুকী প্রেরণার বশবর্ত্তী হইয়া জীব অন্ন-চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়। পরের দুঃখ দেখিয়া যখন আপনার দুঃখ উদ্দীপ্ত হয়, তখন সেই অহেতুকী প্রেরণার বশবর্ত্তী হইয়া মনুষ্য সেই দুঃখের প্রতিবিধান চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু আমার ক্ষুধা নাই—অথচ যদি সুখের উদ্দেশে ভূরিভোজনে প্রবৃত্ত হই, তবে সেরূপ কার্য্য সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রকৃতির প্রেরণামূলক নহে; সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহা আমাদের দুর্ব্বুদ্ধির প্রেরণা-মূলক। আমার মনে দীন-দরিদ্রের প্রতি লেশমাত্রও দয়া নাই অথচ যদি আমি জাঁকজমকের সহিত দানকার্য্যে প্রবৃত্ত হই তবে সেরূপ কার্য্যও সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রকৃতির প্রেরণামূলক নহে; তাহা অহঙ্কারের প্রেরণামূলক। এক কথায় বলিতে হইলে এইরূপ বলাই সঙ্গত যে, ঐ প্রকার নিম্নশ্রেণীর কার্য্য সকল সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিকৃতির সহেতুকী প্রেরণা অনুসারে প্রবর্ত্তিত হয়। নচেৎ যবনিকার আড়াল হইতে গৌণ-রূপে যাহা মূল প্রকৃতি দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয় তাহার প্রবর্ত্তনাকেও যদি প্রকৃতির প্রেরণা বলা যায়, তবে সেভাবে সবই প্রকৃতির অহেতুকী প্রেরণা। কেননা বিশেষ বিশেষ স্থলে বিশেষ বিশেষ বিকৃতি আমাদের অনুষ্ঠিত কার্য্যের অপরোক্ষ কারণ বা সাক্ষাৎ কারণ হইলেও সর্ব্বস্থলেই মূল প্রকৃতি সকল কার্য্যের মূল কারণ।

এত কথা উঠিল কেবল প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনশাস্ত্রের ভেদাভেদের মোটামুটি রকমের একটা আদর্শ শ্রোতৃবর্গের বিবেচনা-ক্ষেত্রে আনয়ন করিবার উদ্দেশে। ভারতে যে সময়ে কপিল মুনি বিরাজমান ছিলেন সে সময়ে নারদ মুনির ঢেঁকি যে চুপ করিয়াছিল তাহা বোধ হয় না। গ্রীক দেশে যে সময়ে Sophist শ্রেণীর তার্কিকদিগের প্রাদুর্ভাব

হইয়াছিল তাহার পূর্ব্বে আমাদের দেশের জ্ঞানান্দোলনী সরস্বতী-নদীতেও ঐরূপ একটা তর্কবিতর্কের ঝড় উঠিয়াছিল—এমন কি উপনিষদের নিভৃত কূল-প্রদেশেও তাহার প্রাবল্যের কিছু কিছু চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে। সে ঝড়ে যে-সকল সারবান্ বৃক্ষ হ্যালে নাই টলে নাই তাহাদিগকে লইয়া যোজন-ব্যাপী ছায়া বিস্তার করিয়া মহা বনস্পতি কে ইনি দণ্ডায়মান? কপিল মুনি ইনি! এই তত্ত্বজ্ঞানের আদিগুরু জগৎপূজ্য মহামুনির পাদপদ্মে ভক্তিগদ্‌গদচিত্তে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করি! গ্রীকদেশীয় Stoic শ্রেণীর তত্ত্বজ্ঞানীরা দুঃখকে মঙ্গলের বেশে সাজাইয়া-দাঁড়করাইবার জন্য কত না আয়াস পাইয়াছিলেন? কপিল মুনি ওরকমের কোনো সাজানো কথার দিক্ দিয়াও যা'ন নাই; তিনি শুধু সাধকগণের হিতার্থে অকৃত্রিম সত্যের উপরে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া অকুতোভয়ে বলিলেন যে, দুঃখ সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য,—ঐকান্তিক দুঃখ নিবৃত্তির উপায়ই জিজ্ঞাসার উপযুক্ত বিষয়। আমরা যদি একালের মহাপণ্ডিতগণের কথার ভেল্কিবাজিতে না ভুলিয়া কপিল মুনির ঐ কৃত্রিমতাশূন্য সত্য-কথাটির ভিতরে স্থিরচিত্তে প্রণিধান করি তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, দুঃখের প্রতীকার সাধনই জীবের মুখ্য সাধন—অধিকন্তু সুখসাধন বলিয়া যে-একটা কথা আমরা কথোপকথনচ্ছলে সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকি তাহা প্রকৃতপক্ষে সাধন বলিতে যাহা আমরা বুঝি—ঠিক্ তাহা নহে। ভূমি চাষ করাই কৃষি-কার্য্যের সাধন; কিন্তু শস্যের উৎপাদনকে স্বতন্ত্ররূপে সাধন বলা অত্যুক্তি বই আর কিছুই নহে। কেননা কৃষিকার্য্য সুনিষ্পন্ন হইলেই শস্যরাজি কোনো সাধনের অপেক্ষা না রাখিয়া আপনা আপনি উৎপন্ন হয়। দুঃখের প্রতীকারই চাষ-কার্য্যের ন্যায় সাধনের মুখ্য অঙ্গ—

সুখোৎপত্তি শস্যোৎপত্তির ন্যায় প্রকৃতিজাত ফল; অথবা যাহা একই কথা—করুণাময় পরমেশ্বরের প্রসাদ। তা ছাড়া, কৃষিকার্য্য শস্যোৎপত্তির একটা সহকারী কারণ বই প্রধান কারণও নহে; বিনা কৃষিকার্য্যেও শস্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় ইহা সকলেরই দেখা কথা—যেমন ঘাসের শস্য; আর সে যে অযত্নসুলভ শস্য, তাহা গো-মহিষদিগের পক্ষে সাক্ষাৎ প্রকৃতি-মাতার স্তন্য দুগ্ধ। একটি অভিনব বালক সুখ যে কাহাকে বলে তাহার কোনো খবরই রাখে না, অথচ তাহার বারো-মেসে সুখ কেমন নির্ম্মল নিষ্কণ্টক এবং স্ফূর্ত্তিযুক্ত। কিন্তু সেই বালকের পায়ে যদি কাঁটা ফোটে, তখন সে তাহার প্রতীকারচেষ্টায় ব্যস্তসমস্ত না হইয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। যখন তাহার ক্ষুধার উদ্রেক হয়—তখন সে অন্নের জন্য লালায়িত হয়। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, দুগ্ধপোষ্য বালকের দুঃখনিবারণও সাধন-সাপেক্ষ। আপনারই বা কি, আর, অন্যেরই বা কি, চাষারই বা কি, আর রাজারই বা কি, পণ্ডিতেরই বা কি, আর মূর্খেরই বা কি, দুঃখ সকলেরই পক্ষে সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য। দুঃখ নিবারিত হইলে সুখ আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে, সুখের জন্য স্বতন্ত্ররূপে সাধন করিবার প্রয়োজন নাই। তা শুধু না—লজ্জাবতী লতার পত্রাবলী যেমন নিকটাগত ব্যক্তির স্পর্শ সহে না, সুখ তেমনি ভোক্তাপুরুষের লক্ষ্য সহে না; সুখের প্রতি লক্ষ্য স্থাপন করিলেই সুখ মাথা হেঁট করিয়া ভূতলে নিপতিত হয়। কর্ম্মশীল চাষাভুষাদের শারীরিক স্বাস্থ্যের একটি প্রধান লক্ষণ এই যে, স্বাস্থ্য বলিয়া যে, পায়ে শিক্‌লি দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার মতো একটা পক্ষী আছে, তাহা তাহারা মূলেই জানে না। ভোগী-শ্রেণীর রাজা রাজড়াদিগের অস্বাস্থ্যের একটি প্রধান লক্ষণ এই যে, ঐ বনের

পাখীটিকে তাঁহারা পিঞ্জরে পুরিয়া তাহাকে ঘড়ি ঘড়ি জারক ঔষধ এবং পুষ্টিকর অন্নপানীয় এত পরিমাণে খাওয়া'ন্ যে, দুই দিনেই তাহার প্রাণবধ হইয়া যায়। এই সকল রাজা রাজড়ারা সুখের সাধনে আপনাদের জীবন উৎসর্গ করিয়া দিয়া তাহার ফল কী পা'ন? ইংরাজেরা যাহাকে বলে Satiety এবং আমরা যাহাকে বলি অতৃপ্তি অরুচি এবং অবসাদ তাহাই তাঁহারা লাভ করেন। এ রোগের এক-মাত্র ঔষধ হচ্চে সুখের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া দুঃখনিবারণের উপায় চেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়া; তাহা হইলে ভোগ এবং কর্ম্ম দুয়ের সামঞ্জস্যের দ্বার দিয়া সুখ অলক্ষিত ভাবে আসিয়া তোমার ঘরের লোক হইয়া দাঁড়াইবে;—তাহার পরিবর্ত্তে তুমি যদি সুখকে জোড়হস্তে সাধ্যসাধনা করিয়া ঘরে আনিতে চেষ্টা কর তবে সুখ তোমার উপরে এমনি রুষ্ট হইবে যে, জন্মেও সে তোমার ঘরের চৌকাট মাড়াইবে না। সুখের উপাসনা এবং সাধ্যসাধনার পরিবর্ত্তে রাজা রাজ্‌ড়ারা যদি নগরপল্লীর পথঘাট পরিষ্কার করাইয়া পুরবাসীদিগের রোগশোকের মূলোচ্ছেদ করেন—পুষ্করিণী খনন করাইয়া পল্লীগ্রামস্থ দীন দুঃখীগণের জলকষ্ট নিবারণ করেন—যথা-যথা স্থানে পান্থশালা নির্ম্মাণ করাইয়া পথিকগণের পথকষ্ট নিবারণ করেন—চিকিৎসালয় নির্ম্মাণ করাইয়া দীন দরিদ্র-গণের রোগ প্রতীকারের পথ উন্মুক্ত করিয়া রাখেন—লোকের অজ্ঞান এবং কুসংস্কার নিবারণের জন্য বিদ্যালয় প্রবর্ত্তিত করেন—মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্র লোকদিগের জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী কর্ম্মালয় উন্মুক্ত করেন—তাহা হইলেই তাঁহাদের রাজভোগ এবং রাজ কার্য্যের মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটিয়া দাঁড়ায়, আর, সেই সামঞ্জস্যের দ্বার দিয়া পরমানন্দ অনাহূত আসিয়া তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিতে পথ পায়; তা বই প্রতিহারী পদাতিক পাঠাইয়া সুখ-বেচারীকে ধরপাকড় করিয়া ঘরে

জানিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু রাজা রাজড়ারা কাঙালের কথায় কর্ণপাত করিবার পাত্র নহেন—সুতরাং দুঃখ তাঁহাদের ললাটে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে। রাজা-রাজড়াদের অপেক্ষা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সজ্জনেরা অনেক পরিমাণে সুখী। মনে কর একটি সামান্য শ্রেণীর গৃহস্থ ব্যক্তি যথানিয়মে কাজ কর্ম্ম করে খায় দায় থাকে। যৎস্বল্প অর্থ যাহা সে উপার্জ্জন করে তাহাতেই তাহার ক্ষুদ্র সংসারের ভরণপোষণ এবং বাসাচ্ছাদনাদি কার্য্য দিব্য নির্বিঘ্নে চলিয়া যায়। একদিকে যেমন অল্পায়াসেই তাহার দুঃখ নিবৃত্তি হয় আর একদিকে তেমনি সে অল্পেতেই সুখী হয়। তাহার সুখভোগ এবং কর্ম্মোদ্যম দুয়ের মধ্যে এইরূপ দিব্য সৌসামঞ্জস্য। সে সুখে আছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু সে যে সুখে আছে একথা অন্যে বলে—সে আপনি তাহা বলে না। সে বলে "আমি অতি দীন দুঃখী—আমাকে প্রত্যহ দশটা থেকে চারিটা পর্য্যন্ত গাধার মত খাটিতে হয়—তা নহিলে আমার সংসার চলে না।" অথচ আবার গ্রীষ্মের ছুটিতে যখন তাহার হাতে কোনো কাজ না থাকে তখন সে গ্রীষ্মতাপে যত না ছটফট্ করুক্—ভোজনান্তে শয্যায় গা ঢালিয়া তা অপেক্ষা দ্বিগুণবেগে এপাশ ওপাশ করিতে থাকে—দিনের মধ্যে হাই তোলে বিশ ত্রিশ বার, আর বলে "ছুটি ফুরাইলে বাঁচি"! সে যে, সুখে আছে, সে কথা তাহার নিজের মনে আমল পায় না এইজন্য—যেহেতু দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা জানা যায় না। ফলে, নিম্নশ্রেণীর লোকের সুখভোগের পরিসর যেমন স্বল্পায়ত, তাহার দুঃখনিবারণোপযোগী কর্ম্মচেষ্টারও পরিসর সেইরূপ স্বল্পায়ত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও—দুঃখ যে, কিরূপ অবশ্য-পরিহার্য্য সামগ্রী তাহা তাহারা যেমন জানে, আর, জানে বলিয়া তাহারা যেমন পরের দুঃখে দুঃখী, রাজারাজড়ারা তাহার সিকির সিকিও নহে।

জনসমাজের মস্তকশ্রেণীর লোকদিগের ভোগের পরিসর যেমন সুবিস্তীর্ণ, তাঁহাদের দুঃখনিবারণক্ষম কর্ম্মচেষ্টার পরিসরও সেইরূপ সুবিস্তীর্ণ। রাজার রাজসংসারও যেমন বৃহৎ, তাঁহার রাজ্যও তেমনি বৃহৎ; এই বৃহৎ সংসার এবং বৃহৎ রাজ্যের দুঃখমোচনের জন্য আক্‌বর সাহের ন্যায় উঠিয়া পাড়িয়া না লাগিলে রাজভোগ এবং রাজকার্য্যের মধ্যে সৌসামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে না; আর সৌসামঞ্জস্য রক্ষিত না হইলে সুখের আগমনদ্বারে কপাট পড়িয়া যায়। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, দুঃখনিবারণোপযোগী কর্ম্মচেষ্টা ব্যতিরেকে প্রকৃত সুখকে নাগাল পাওয়া যায় না। তা ছাড়া এটাও একটা স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিবার বিষয় যে, দুঃখ নিবারণের চেষ্টা না করিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যদি সুখের আরাধনা এবং সাধ্যসাধনা করা যায়, তাহা হইলে সুখ অচিরে দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করে। আমাদের দেশের পুরাতন তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাই বলেন যে দুঃখই—রজোগুণই—কর্ম্ম-চেষ্টার প্রবর্ত্তক; আর, যেমন কাঁটা দিয়া কাঁটা বাহির করা যায়, তেমনি কর্ম্ম-দ্বারাই কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি-লাভ করা যায়। যাঁহারা মনে করেন যে, নৈষ্কর্ম্ম্যই আমাদের দেশের পুরাতন তত্ত্বজ্ঞানীদিগের জীবনের আদর্শ ছিল—দুই ছত্র গীতার পাতা উল্টাইলেই তাঁহাদের সে ভুল জন্মের মতো ঘুচিয়া যাইবে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা একটি গুরুতর কথার পর্য্যালোচনায় এখনো হাত দেওয়া হয় নাই—সে কথা এই যে, কপিল মুনি বলিতে-ছেন—ঐকান্তিক এবং আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি ভিন্ন সামান্য রকমের দুঃখনিবারণ মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে ফলদায়ক নহে। এ কথার নিগূঢ় তাৎপর্য্য কি তাহা আগামীবারে বলিব, আজিকের মতো এ যাহা বলিলাম এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট।

দ্বিতীয় অধিবেশন।

ভূমিকা। (২)

সাংখ্যের গোড়াতেই আছে, দুঃখনিবৃত্তি কি উপায়ে হইতে পারে তাহারই জন্য জিজ্ঞাসা—তাই বিগত অধিবেশনে ঐ কথাটির পর্য্যালোচনা যত পারি সংক্ষেপে সমাধা করিয়া তাহারই উপরে আমার চরম বক্তব্য কথাটির গোড়া ফাঁদিয়াছিলাম। আজ যাহা বলিব তাহাও ভূমিকারই মধ্যে ধর্ত্তব্য।

শ্রোতৃবর্গের জানা উচিত যে, ভূমিকা সমগ্র অট্টালিকা নহে—তাহা ভিত্তিমূল মাত্র। ভিত্তিমূলের দোষগুণবিচারের পদ্ধতি স্বতন্ত্র, আর উপর-তালা'র দোষগুণ-বিচারের পদ্ধতি স্বতন্ত্র। ভিত্তিমূলের দোষগুণ-বিচারস্থলে কেবল একটিমাত্র জিজ্ঞাসা শোভা পায়; তাহা এই যে, ভিত্তিমূল দৃঢ় কি অদৃঢ়; তা বই ভিত্তিমূল সুশ্রী কি বিশ্রী, অথবা বাসের উপযোগী বা অনুপযোগী এরূপ জিজ্ঞাসা শোভা পায় না। কিন্তু, তথাপি, ভিত্তিমূলের দৃঢ়তাসাধন গৃহনির্ম্মাতার পক্ষে অবশ্যকর্ত্তব্য। আমার হাতের এই অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্যটি চুকাইয়া ফেলিয়া মনকে হাল্‌কা করিবার জন্য—দুঃখনিবৃত্তি সম্বন্ধে গতবারে যাহা সংক্ষেপে বলিয়াছিলাম তাহা আর একটু বিস্তার করিয়া বলা আবশ্যক মনে করিতেছি; কেননা তাহা না করিলে সেদিনকার কথাটার প্রকৃত তাৎপর্য্যটি অনেকে অনেক প্রকার ভুল বুঝিবেন।

মনুষ্যের দুঃখ বেশীর ভাগ মানসিক এবং আধ্যাত্মিক। শারীরিক রোগ বরং মনুষ্যের গায়ে সহে, কিন্তু মানসিক শোক হৃদয়ে প্রবেশ করিলে তাহার বিষানল লোককে—বিশেষতঃ অবলা-জাতীয় লোককে—পাগল করিয়া ছাড়ে। একে তো তাহাকেই সামলানো ভার, তাহাতে আবার সে

সঙ্গী যুটাইয়া আনে শারীরিক রোগের দলকে-দল। পাপজনিত আত্মগ্লানি আবার সকলকে জিতিয়াছে। তাহা যে কিরূপ ভয়ানক দুশ্চিকৎস্য অন্তর্দাহ—মহাকবি সেক্সপিয়রের ম্যাক্‌বেথ এবং তাঁহার সহপাপিনী লেডি ম্যাকবেথ তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। আবার, প্রেমপীড়িত হৃদয়ের মর্ম্মাধিষ্ঠিত বিচ্ছেদানলের দহনজ্বালার সহিত মৃত্যুর যে কতটা নিকট সম্বন্ধ—ঐ মহাকবির রোমিও জুলিয়েট তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিতে বাকি রাখে নাই। তা ছাড়া, জনসাধারণের বুদ্ধির অগম্য আর এক প্রকার দুঃখ আছে—যে দুঃখে রাজপুত্র বুদ্ধদেব, মনুষ্যপুত্র ঈশা-মহাপ্রভু, এবং ব্রাহ্মণপুত্র চৈতন্য-মহাপ্রভু গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন। এ দুঃখ মনুষ্যের আত্মার গোড়াঘঁ্যাসা দুঃখ। সহস্রের মধ্যে একআধ জন অসামান্য মহাপুরুরের মনে এ দুঃখ যখন দাবানলের ন্যায় তেজ করিয়া উঠে, তখন আর আর সকল দুঃখকে কবলিত করিয়া তাহার শিখা আকাশাভিমুখে উদ্ধৃত হয়। এই অতলস্পর্শ গভীর দুঃখের প্রেরণায় পৃথিবীতে কার্য্য যাহা প্রবর্ত্তিত হয় তাহা পাপভারাক্রান্ত পৃথিবীর এমুড়া হইতে ওমুড়া পর্য্যন্ত কম্পমান করিয়া বহুকালের সঞ্চিত স্তূপাকার আবর্জ্জনারাশি তাহার গাত্র হইতে দূরে অপসারিত করে। আত্মার এই গোড়াঘঁ্যাসা দুঃখের নিবৃত্তির নামই ঐকান্তিক দুঃখ নিবৃত্তি—কেননা এই দুঃখ নিবারিত হইলেই মনুষ্যের আর কোনো দুঃখ থাকে না।

গতবারে গোড়াতেই আমি সাংখ্যদর্শনের উপক্রমণিকা এবং উপসংহারের মধ্য হইতে তাহার ভিতরের মর্ম্মকথাটি টানিয়া আনিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলাম। কিন্তু কাহাকেই বা আমি বলিতেছি সাংখ্যের উপক্রমণিকা, কাহাকেই বা বলিতেছি সাংখ্যের উপসংহার, সে কথাটি আমার মনের মধ্যে চাপা রহিয়া গিয়াছে; এইখানে তাহা ব্যক্ত করিয়া বলা আবশ্যক।

আমাদের দেশের পণ্ডিতমহলে কাপিল দর্শন নিরীশ্বর সাংখ্য, এবং পাতঞ্জল দর্শন সেশ্বর সাংখ্য বলিয়া, চিরপ্রসিদ্ধ। তা বলিয়া তাহা দুই সাংখ্য নহে—পরন্তু একই সাংখ্যের আগেরটি বীজ এবং শেষেরটি ফল। ভগবদ্গীতায় স্পষ্টই লেখা আছে "সাংখ্য যোগৌ পৃথক্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ" সাংখ্য স্বতন্ত্র এবং যোগ স্বতন্ত্র এ কথা বালকেরাই বলিয়া থাকে, পণ্ডিতেরা তাহা বলেন না। "একং সাংখ্যং চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি" সাংখ্য এবং যোগ এই দুই শাস্ত্রকে যাঁহারা একেরই অঙ্গীভূত করিয়া দেখেন তাঁহারাই যথার্থ দেখেন। ভগবদ্গীতার এই কথাটির মর্ম্ম শিরোধার্য্য করিয়া আমি কাপিল দর্শনকে বলিতেছি সাংখ্যের উপক্রমণিকা বা বীজ; যোগশাস্ত্রকে বলিতেছি সাংখ্যের উপসংহার বা ফল। বীজ হইতে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ফল ফলাইয়া তোলা হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত যেমন ফলার্থী ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা মেটে না, তেমনি নিরীশ্বর সাংখ্য হইতে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সেশ্বর সাংখ্য ফলাইয়া তোলা হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসুব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা মেটে না। ফলেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, আমাদের দেশের সমস্ত স্মৃতিপুরাণ, এবং বিশেষতঃ পাতঞ্জল দর্শন, কপিল মুনির নিরীশ্বর সাংখ্য হইতে সেশ্বর সাংখ্য ফলাইয়া তুলিয়া সাংখ্য দর্শনের সার্থক্যসম্পাদন করিয়াছে।

কপিল মুনির চরম বক্তব্য কথা এই যে, প্রকৃতিই আপনার অধিষ্ঠাতা পুরুষকে অর্থাৎ জীবাত্মাকে মোহে আচ্ছন্ন করিয়া তাহাকে সুখদুঃখাদি গুণ দ্বারা বন্ধন করেন, এবং প্রকৃতিই মোহান্ধকার ক্রমে ক্রমে অপসারণ করিয়া সুখদুঃখাদির হস্ত হইতে জীবকে নিষ্কৃতি প্রদান করেন। প্রকৃতির দুই মূর্ত্তি বিদ্যা এবং অবিদ্যা। প্রকৃতি অবিদ্যা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জীবকে সংসারপাশে বদ্ধ করেন এবং বিদ্যামূর্ত্তি ধারণ করিয়া জীবকে মুক্তি-ধামে পৌঁছাইয়া দ্যান। অতএব মুমুক্ষু-

ব্যক্তির পক্ষে বিদ্যার পথই অবলম্বনীয়; তত্ত্ববিদ্যাই ঐকান্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির একমাত্র উপায়। কিন্তু বিদ্যা পদার্থটা কি? কাপিল সাংখ্যের মতে তাহা আর কিছু না, প্রকৃতিকে আদ্যোপান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানা; আর উহার মতে, ঐপ্রকার বিদ্যার পরিপক্ক অবস্থায় জীবাত্মার বুদ্ধির অভ্যন্তরে যখন এইরূপ বিবেক উৎপন্ন হয় যে, প্রকৃতি স্বতন্ত্র এবং সে আপনি স্বতন্ত্র, তখন তাহারই বলে জীবাত্মা সমস্ত সুখদুঃখাদির বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে। "প্রকৃতির আদ্যোপান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানাই পুরুষার্থসাধনের একমাত্র পন্থা"—কপিল মুনির এই মোট মন্তব্য কথাটি যদি বর্ত্তমান কালের ইউরোপীয় বিদ্বন্মণ্ডলীর কর্ণগোচর হয়, তাহা হইলে তাঁহারা ঐ কথাটিকে ক্রোড়ে-করিয়া নাচাইবেন তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই; কিন্তু উহাতে আমাদের দেশের তত্ত্ব-পন্থীদিগের আকাঙ্ক্ষা মিটিতে পারে না। ঈশোপনিষদে আছে যে, "অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অবিদ্যামুপাসতে,"—যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে তাহারা অন্ধ তিমিরে প্রবেশ করে; আবার, "ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ"—তাহা অপেক্ষা আরো ঘোরতর অন্ধ তিমিরে প্রবেশ করে যাহারা বিদ্যায় রত। প্রকৃত কথা এই যে, নিরীশ্বর সাংখ্যের প্রদর্শিত কঠোর বিদ্যার পথ মুক্তিকামী সাধকদিগের পক্ষে ব্যাঘাত-জনক বই সুবিধাজনক নহে।

সাংখ্যের মতে বিদিতব্য তত্ত্ব সবিস্তরে বলিতে গেলে পঁচিশটি; সংক্ষেপে বলিতে গেলে তিনটি,—(১) ব্যক্ত জগৎ, (২) অব্যক্ত জগৎ এবং (৩) জ্ঞাতা পুরুষ। নিশাবসানে শয্যা হইতে গাত্রোত্তোলন করিবার সময় প্রতিদিনই আমরা ঐ তিনটি তত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ করি; প্রতিদিনই প্রাতঃকালে আমাদের চক্ষের সম্মুখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হইয়া উঠে; আর সেই সঙ্গে কার্য্যরূপী ব্যক্ত জগৎ, কারণরূপী অব্যক্ত

জগৎ এবং দর্শকরূপী আপনি, এই তিনটি মৌলিক তত্ত্ব আমাদের উপলব্ধি-গোচরে প্রকাশ পাইয়া উঠে। ইহা দেখিয়া তত্ত্বজিজ্ঞাসুর মনে সহজেই এইরূপ একটি প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে যে, এই যে প্রভূত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রতিদিনই উলটিয়া-পালটিয়া অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত এবং ব্যক্ত হইতে অব্যক্ত হইতেছে—ইহার প্রকরণ পদ্ধতিইবা কিরূপ, আর, ইহার চরম উদ্দেশ্যই বা কি? প্রকরণ-পদ্ধতি সম্বন্ধে সাংখ্যের মোট সিদ্ধান্ত এই যে, ব্যক্ত হইবার সময় জগৎ সূক্ষ্ম হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া স্থূল হইতে স্থূলে অনুলোমক্রমে অভিব্যক্ত হয়; এবং অব্যক্ত হইবার সময় স্থূল হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মে প্রতিলোম-ক্রমে পর্য্যবসিত হয়। চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সাংখ্যের সিদ্ধান্ত এই যে, প্রকৃতি আপনার অধিষ্ঠাতা জ্ঞাতাপুরুষের ভোগ সাধনের উদ্দেশে অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হ'ন, এবং জ্ঞাতাপুরুষের মোক্ষ-সাধনের উদ্দেশে ব্যক্ত হইতে অব্যক্ত হ'ন।

অতঃপর জিজ্ঞাস্য এই যে, জ্ঞাতা-পুরুষ প্রকৃতির কে যে, জ্ঞাতা-পুরুষের ভোগমোক্ষের উদ্দেশে প্রকৃতিকে রাত্রি দিন অনবরত জগৎকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে? সাংখ্যদর্শনে ইহার উত্তর এইরূপ দেওয়া হইয়াছে যে, দুগ্ধ-পানের জন্য বাছুরকে কাছে দৌড়িয়া আসিতে দেখিলে গাভীর স্তন হইতে যেমন আপনাআপনি দুগ্ধক্ষরণ হইতে থাকে, সেইরূপ অধিষ্ঠাতা পুরুষের ভোগমোক্ষের উদ্দেশে প্রকৃতি স্বভাবতই জগৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। কপিল মুনির এ কথাটা সমীচীন নহে তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। বেদান্তদর্শনে দ্বৈতাদ্বৈতের কথা-প্রসঙ্গে তিন প্রকার ভেদের কথা উল্লিখিত হইয়াছে—(১) বিজাতীয় ভেদ, (২) স্বজাতীয় ভেদ এবং (৩) স্বগত ভেদ। ইহা হইতে আমরা পাইতেছি যে, ঐক্যও তিন প্রকার,—

বিজাতীয় ঐক্য, স্বজাতীয় ঐক্য এবং স্বগত ঐক্য। অচেতন বৃক্ষ এবং সচেতন জীবের মধ্যে প্রাণবত্তাঘটিত ঐক্য যাহা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা বিজাতীয় ঐক্য ; এবৃক্ষ এবং ওবৃক্ষের মধ্যে যেরূপ ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহা স্বজাতীয় ঐক্য ; আর, বৃক্ষ এবং শাখাপত্রের মধ্যে যেরূপ ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহা স্বগত ঐক্য। শেষোক্ত স্বগত ঐক্য সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ ঐক্য তাহাতে আর ভুল নাই। বাছুর যখন গোরুর গর্ভে বিলীন ছিল, তখন উভয়ের মধ্যে স্বগত ঐক্য ছিল আত্যন্তিক ; আর বৎস-প্রসবের পর হইতে সেই স্বগত ঐক্যের টান, সোজা কথায় রক্তের টান, উভয়ের মধ্যে নিরবচ্ছেদে চলিয়া আসিয়াছে ; এই জন্যই বাছুরকে দুগ্ধপানার্থে ছুটিয়া আসিতে দেখিলে গোরুর স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরণ হইতে থাকে। কিন্তু কাপিল সাংখ্যে প্রকৃতি এবং জ্ঞাতাপুরুষের মধ্যে যখন ওরূপ স্বগত ঐক্যের বন্ধন স্বীকৃত হয় নাই, তখন, কেন যে জ্ঞাতাপুরুষের ভোগমোক্ষ সাধনের-জন্য প্রকৃতি হইতে জগৎকার্য্য অজস্রধারে প্রবাহিত হইতে থাকিবে—ইহার কোনো অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কাপিল সাংখ্যের ঐ অঙ্গহীন কথাটির অঙ্গপূরণের জন্য এযাবৎকাল পর্য্যন্ত আমাদের দেশের অপরাপর সমস্ত শাস্ত্রেই প্রকৃতি ঐশীশক্তিরূপে প্রতিপাদিত হইয়া আসিতেছে। কাপিল দর্শনের মত যাহাই হউক্ না কেন, কিন্তু আমাদের দেশের আর-আর সকল শাস্ত্রেরই ভিতরের-কথা এই যে, ঈশ্বর এবং জীবের মধ্যে মর্ম্মান্তিক প্রাণের টান রহিয়াছে, আর তাহারই প্রবর্ত্তনায় জগৎসংসারের কার্য্য চলিতেছে।

দর্শনমহলের বাদবিতণ্ডা হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া আমরা যদি আমাদের প্রাণের টানের মধ্য দিয়া সাংখ্যের ব্যক্ত অব্যক্ত এবং জ্ঞ এই তিনটি মূলতত্ত্বের প্রতি স্থিরচিত্তে প্রণিধান করি, তাহা হইলে মাতৃ-

ক্রোড়স্থিত বালক যেমন মুখে কথা বলিতে না জানুক্ কিন্তু মনে মনে এটা বেস্ জানিতে পারে যে, আমি মাতৃক্রোড়ে রহিয়াছি, তেমনি আমরা নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থানকালে যখন আমাদের আপনা-আপনাকে লইয়া এই পরমাশ্চর্য্য বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আমাদের চক্ষের সম্মুখে অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হয়, তখন আমরা—আমাদের অন্তঃকরণের গোড়াঘেঁ্যাসা অভাবের সহিত একযোগে—পরমাত্মার পিতৃভাব এবং মাতৃভাবের প্রভাব হৃদয়ঙ্গম করি। এবিষয়ে আমি অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া এইটুকু কেবল বলিতে ইচ্ছা করি যে, "আমাদের অভাব যেমন অসীম, সত্যের প্রভাব তেমনি অসীম"—এই সার কথাটি যখন আমাদের জ্ঞানে ধ্রুব সত্যরূপে প্রকাশ পায়, তখন তাহারই আলোকে আমরা পরমাত্মার পরমতত্ত্ব উপলব্ধ করি—তা বই যুক্তিতর্কের বলে নহে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রকৃতির দুই মূর্ত্তি বিদ্যা এবং অবিদ্যা, আর, এখনও বলিতেছি যে, বিদ্যা এবং অবিদ্যা দুইই ঐশী শক্তির শ্বেতনীল রশ্মিদুটা; তাহার মধ্যে অবিদ্যা জীবাত্মার অভাবের পরিচায়ক, বিদ্যা পরমাত্মার প্রভাবের পরিচায়ক। পরমাত্মতত্ত্বের উপলব্ধি বলিতে বুঝায়, আপনার অজ্ঞানময় অভাব এবং পরমাত্মার প্রজ্ঞানময় প্রভাব, এই দুই তত্ত্বের একসঙ্গে উপলব্ধি। ঈশোপনিষদের এই যে একটি বচন যাহা ইতি-পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি—যথা, যাহারা অবিদ্যার উপাসক তাহারা অন্ধতিমিরে প্রবেশ করে, আবার, যাহারা বিদ্যায় রত তাহারা আরো ঘোরতর অন্ধতিমিরে প্রবেশ করে, এই বচনটির পরেই উক্ত হইয়াছে যে, "বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ, অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে" বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়কে যাঁহারা একসঙ্গে জানে উপলব্ধি করেন তাঁহারা অবিদ্যাদ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া

বিদ্যাদ্বারা অমৃত লাভ করেন। পরমাত্মাকে ছাড়িয়া আমরা যে কিরূপ অজ্ঞান শক্তিহীন এবং নিরাশ্রয় এই তত্ত্বটি যখন আমরা নিভৃত নির্জ্জনে বসিয়া মনোমধ্যে উপলব্ধি করি, তখন তাহারই নাম অবিদ্যাকে জ্ঞানে উপলব্ধি করা ; আবার, সেই সঙ্গে যখন আমরা পরমাত্মার প্রজ্ঞানময় আনন্দময় প্রভাব উপলব্ধি করি তখন তাহারই নাম বিদ্যাকে জ্ঞানে উপলব্ধি করা। উপনিষদ্‌কার ঋষি বলিতেছেন যে, অবিদ্যাকে জানিতে পারিলেই, অর্থাৎ আমরা কত যে অজ্ঞান তাহা জানিতে পারিলেই, অবিদ্যাকে অতিক্রম করা হয় ; আর সেই সঙ্গে মৃত্যুকে অতিক্রম করা হয় ; আর, বিদ্যা লাভ করিলেই, অর্থাৎ পরমাত্মা সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ আনন্দময় শান্ত মঙ্গল এবং অদ্বিতীয় এই পরমতত্ত্বের জ্ঞান লাভ করিলেই অমৃত লাভ করা হয়। পরমাত্মাকে ছাড়িয়া আমরা যে কিরূপ অসহায় এই অভাব-বোধটি যখন আমাদের মনে জাগিয়া ওঠে, তখন গাভীর স্তন হইতে যেমন স্নেহামৃত ক্ষরিত হইয়া ক্ষুধাতুর বৎসের অভাব ঘুচাইয়া দ্যায়, সেইরূপ পরমাত্মার প্রেমপূর্ণ প্রভাব হইতে করুণা অবতীর্ণ হইয়া আমাদের দুঃখ ঘুচাইয়া দ্যায়।

কাপিল সাংখ্যের উপদিষ্ট জ্ঞানপথ হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া ক্রমে যোগশাস্ত্রের একটি উচ্চ সাধন-পথে উপনীত হইলাম। কাপিল সাংখ্যের স্থূল মন্তব্য কথা এই যে, প্রকৃতিকে জ্ঞানে আয়ত্ত করিতে হইবে এগ্নি-তীব্র-কঠোর-ভাবে—যে, প্রকৃতি ভয়ে এবং লজ্জায় সাধকের সম্মুখ হইতে সরিয়া পলাইতে পথ পাইবে না। পক্ষান্তরে, যোগের স্থূল মন্তব্য কথা এই যে, মনকে এমন এক স্থানে দৃঢ়রূপে বসাইতে হইবে যেখানে স্থিতি করিলে কোনো দুঃখই সাধককে নাগাল পাইবে না। কিন্তু যোগ-শাস্ত্রের উপদিষ্ট সর্ব্বাপেক্ষা

প্রকৃষ্ট সাধনের পথ হ'চ্চে ঈশ্বর-প্রণিধান। ঈশ্বর-প্রণিধান কাহাকে বলে?—ভোজরাজকৃত পাতঞ্জলভাষ্যে এ-বিষয়টির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এইরূপ:—'প্রণিধানং তত্র ভক্তিবিশেষো বিশিষ্টমুপাসনং সর্ব্বক্রিয়াণামপি তত্রার্পণং"—প্রণিধান কি? না বিশেষ প্রকার ভক্তি, বিশিষ্টরূপে উপাসনা এবং তাঁহাতে সমস্ত কর্ম্মের সমর্পণ। "বিষয়-সুখাদিকং ফলমনিচ্ছন্ সর্ব্বাঃ ক্রিয়া তস্মিন্ পরমগুরৌ অর্পয়তীতি প্রণিধানং"—বিষয়সুখাদি ফল ইচ্ছা না করিয়া সমস্ত কর্ম্ম সেই পরম গুরুর চরণে প্রণিহিত করা হইতেছে, এই অর্থে প্রণিধান। কাপিল দর্শনের সাধনাঙ্গকে মোটামুটি জ্ঞানযোগ বলা যাইতে পারে, পাতঞ্জল দর্শনের নিম্ন সোপানের সাধনাঙ্গকে কর্ম্মযোগ বলা যাইতে পারে, এবং পাতঞ্জল দর্শনের উচ্চ সোপানের সাধনাঙ্গকে ভক্তিযোগ বলা যাইতে পারে। কিন্তু ভগবদ্গীতাতে—জ্ঞানযোগ হইতে কর্ম্মযোগে এবং কর্ম্ম-যোগ হইতে ভক্তিযোগে কেমন করিয়া উত্তীর্ণ হইতে হয় তাহার সর্ব্বাপেক্ষা সুগম পথ যেমন অকৃত্রিম সরল মাধুর্য্যের সহিত বিশদরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, এমন আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

গীতাপাঠ।

তৃতীয় অধিবেশন।

ব্যাখ্যান।

হোমরের ইলিয়াড ওলিম্পস্ হইতে পারে কিন্তু তাহা হিমালয় নহে। কাব্যজগতের হিমালয় একা কেবল মহাভারত। রামায়ণ হিমালয় না হউক্—তাহা বিন্ধ্যাচল তাহাতে আর ভুল নাই। রামায়ণ এবং মহাভারতের মধ্যে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের প্রভেদ। বশিষ্ঠ মুনি বিশ্বামিত্র-রাজার মুখের সামনে তাঁহাকে ধিক্কার দিয়া এই-যে-একটি কথা স্পর্দ্ধার সহিত বলিয়াছিলেন "ধিক্ বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজোবলং বলং"—"ক্ষত্রিয়ের বাহুবল ধিক্ বল—ব্রাহ্মণের তপোবলই বল" এই কথাটিই রামায়ণের মূলমন্ত্র। দশরথ রাজার অযোধ্যাপুরীতে ব্রাহ্মণদিগের বেদাধ্যয়নের নিনাদে বীরপুরুষদিগের ধনুষ্টঙ্কারের নিঃস্বন চাপা পড়িয়া গিয়াছে। রামায়ণের ক্ষত্রিয়-কুলতিলক সবেমাত্র দশরথ এবং জনক; তাহার মধ্যে দশরথ রাজা ব্রাহ্মণদিগের নিকটে জোড়হস্ত—জনকরাজা ব্রাহ্মণেরই সামিল; তা বই, দোঁহার স্বভাব চরিত্রে ক্ষত্রিয়ের কোনো বিশেষ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। মহাভারতে দেখা যায় ঠিক্ তাহার বিপরীত। রামায়ণে বিশ্বামিত্র রাজা জাতিতে ক্ষত্রিয় হইয়াও অনেক তপস্যা করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন;—মহাভারতে দ্রোণাচার্য্য জাতিতে ব্রাহ্মণ হইয়াও শাস্ত্রের পরিবর্ত্তে শস্ত্রকে সার করিয়া কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মের সেনাপত্যে গ্রীবা অবনত করিয়াছিলেন।

অধিক কি আর বলিব—ক্ষত্রিয়বল যে কিরূপ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারী মহাবল—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আগাগোড়া তাহারই জ্বলন্ত কাহিনী।

অর্জ্জুন ছিলেন ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক অবতার; স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের আধিদৈবিক অবতার। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের দুই ভার আপনার হস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন—অর্জ্জুনের রথ চালাইবার ভার এবং অধর্ম্মের প্ররোচনা-বাক্যের বিরুদ্ধে অর্জ্জুনকে ধর্ম্মপথে চালাইবার ভার। শ্রীকৃষ্ণ বামহস্তে অশ্বের রাশ এবং দক্ষিণ হস্তে অর্জ্জুনের মনের রাশ অপ্রমত্তভাবে ধরিয়া থাকিয়া "যতোধর্ম্ম স্ততো-জয়ঃ" এই দৈববাণীটিকে জগজ্জনের সমক্ষে ফলবতী করিয়া তুলি-য়াছেন।

মনুষ্যের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের পৃথক্ তিনটি পথ আছে—জ্ঞানের পথ, কর্ম্মের পথ, এবং ভক্তির পথ; তা ছাড়া, একটি মাঝের পথ আছে যাহা ঐ তিন পথের ত্রিবেণীসঙ্গম। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে শেষোক্ত সঙ্গমতীর্থের পথে চালাইবার অভিপ্রায়ে সাংখ্যশাস্ত্রের প্রদর্শিত জ্ঞানের পথ হইতে যাত্রারম্ভ করিলেন। বলিলাম সাংখ্যশাস্ত্রের প্রদর্শিত জ্ঞানের পথ—কিন্তু তাহার অর্থ এ নহে যে, সাংখ্যদর্শনের মতামত। মানুষের গায়ের উত্তরীয় বস্ত্র যেমন মূলেই মানুষ নহে, তেমনি সাংখ্য-দর্শনের মতামত মূলেই সাংখ্যশাস্ত্রের ভিতরকার কথা নহে। যাহা সাংখ্যশাস্ত্রের ভিতরের কথা তাহা বেদান্তশাস্ত্রেরও ভিতরের কথা। পক্ষান্তরে, সাংখ্যশাস্ত্রের দার্শনিক মতামত এবং বেদান্তশাস্ত্রের দার্শ-নিক মতামত—এ দুয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। সাংখ্যদর্শন এবং বেদান্তদর্শনের মধ্যে যে জায়গাটিতে মতের অনৈক্য সে জায়গাটি বাদ-প্রতিবাদে এরূপ জটিলতাচ্ছন্ন যে, তাহার মধ্যে তোমার আমার ন্যায় সহজ মনুষ্যের দন্তস্ফুট হওয়া ভার; পরন্তু উভয়ের ঐক্যস্থানটিতে

বেদান্ত এবং সাংখ্য যেন ঝিনুকের দুইটি কপাট, আর, সেই দুই কপাটের অন্তরালে অমূল্য তত্ত্বজ্ঞানের মুক্তা সংগোপিত রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বপ্রথমে সাংখ্যশাস্ত্রের সেই সার কথাটিই অর্জ্জুনকে স্মরণ করাইয়া দিলেন।

সাংখ্যদর্শনের এই যে একটি সার-কথা যে "আত্মা অজর অমর এবং অপরিবর্ত্তনীয় ধ্রুব সত্য"—শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বপ্রথমে অর্জ্জুনকে এই কথাটি স্মরণ করাইয়া দিলেন। যদি বল "সাংখ্য ঐরূপই বলে তাহা জানি—কিন্তু সাংখ্যের ও-কথাটার প্রমাণ কি—সেইটিই হ'চ্চে জিজ্ঞাস্য," তবে তাহার উত্তর এই যে, তাহা সাক্ষাৎ জ্ঞানে উপলব্ধি করিবার বস্তু,—প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করিবার বস্তু নহে। প্রমাণ শব্দের মৌলিক অর্থ মাপা। পরিধেয় বস্ত্র ক্রয় করিবার সময় ক্রেতা দোকানের পুঁজি হইতে একখানি পছন্দসই বস্ত্র বাছিয়া লইয়া তাহার এমুড়া হইতে ওমুড়া পর্য্যন্ত এক এক হস্ত-পরিমাণ অংশে-অংশে আপনার দক্ষিণ হস্ত উত্তরোত্তরক্রমে আরোপ করিয়া বলেন যে, বস্ত্রখানি এত হাত লম্বা। তাঁহাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, তোমার দক্ষিণ হস্ত ক-হাত লম্বা; তবে তিনি হাসিয়া বলিবেন "একহাত লম্বা।" তাঁহার এ কথায় সন্তোষ না মানিয়া পার্শ্বস্থিত কোনো তর্কালঙ্কার যদি বলেন যে, "ঐ বস্ত্রখানি ক-হাত লম্বা তাহা যেমন তুমি মাপিয়া দেখিলে, তোমার দক্ষিণ হস্ত যে এক হাত লম্বা তাহা তুমি আমাকে সেইরূপ করিয়া মাপিয়া দেখাও" তবে ক্রেতা তাঁহাকে কি বলিবেন তাহা জানি না; কিন্তু প্রশ্নকর্ত্তার ন্যায় তর্কচূড়ামণিদিগের সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্য যে একটি কথা বলিয়াছেন তাহা আমি অনেকবার অনেক স্থানে উল্লেখ করিয়াছি; সে কথা এই;—

মানং প্রবোধয়ন্তং বোধং যে মানেন বুভুৎসন্তে।
এধোভিরেব দহনং দগ্ধুং বাঞ্ছন্তি তে মহাসুধিয়ঃ॥

প্রমাণ ক্রিয়াতে বল সঞ্চার করিতেছে যে সাক্ষাৎ জ্ঞান সেই সাক্ষাৎ জ্ঞানকে যাঁহারা প্রমাণ দ্বারা আয়ত্ত করিতে ইচ্ছা করেন সেই-সকল মহাপণ্ডিতেরা ইচ্ছা করেন কী? না, ইন্ধন কাষ্ঠে (অর্থাৎ জ্বালানে কাঠে) দাহিকাশক্তি সঞ্চার করে যে, অগ্নি, সেই অগ্নিকে ইন্ধন-কাষ্ঠ দিয়া দহন করিতে।

অতএব গীতাশাস্ত্রে যে সকল সার সার জ্ঞানের কথা উপদিষ্ট হইয়াছে—শ্রোতৃবর্গের উচিত যে, আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত তাঁহারা তাহা শ্রবণ করেন। কেননা শ্রদ্ধাই জ্ঞানের প্রথম সোপান।

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের আরম্ভমুহূর্ত্তে যখন স্বর্গ মর্ত্ত্য অনুনাদিত করিয়া দশ শত বীরের দশ শত শঙ্খ ধ্বনিত হইয়া উঠিল, আর, তাহার পরক্ষণেই ভেরী পণব আনক গোমুখ প্রভৃতি রণবাদ্য সহসা তুমুল শব্দে বাজিয়া উঠিল, তখন কুরুসৈন্য দলে দলে সাজিয়া দাঁড়াইয়াছে দেখিয়া, শস্ত্র চলিতে আরম্ভ হইয়াছে—এমন সময়ে অর্জ্জুন ধনুক বাগাইয়া ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "কাহাদের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে একবার তাহা আমি নিরীক্ষণ করিতে চাই—উভয় সেনার মধ্যস্থলে রথ স্থাপন কর।" অর্জ্জুনের এই কথামতে শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি মহারথীদের সম্মুখ-ভাগে রথ স্থাপন করিয়া বলিলেন "দেখ এই কুরু-সবে একত্রে সমবেত।" অর্জ্জুন কি দেখিলেন? দেখিলেন পিতৃগণ পিতামহগণ আচার্য্যগণ মাতুলগণ ভ্রাতৃগণ পুত্রগণ পৌত্রগণ ভাই-বন্ধু-সুহৃদগণ যুদ্ধার্থে দণ্ডায়মান; দেখিয়া অত্যন্ত কৃপাপরবশ হইয়া বিষণ্ণবদনে বলিলেন "এই সব আত্মীয় স্বজনকে, কৃষ্ণ, যুদ্ধার্থে উপস্থিত দেখিয়া আমার শরীর অবসন্ন হইতেছে, মুখ শুখাইয়া

যাইতেছে, সর্ব্বাঙ্গে কম্প ধরিয়াছে, গাত্র শিহরিয়া উঠিয়াছে, গাণ্ডীব হস্ত হইতে খসিয়া পড়িতেছে, অঙ্গ-দাহ হইতেছে, আমি দাঁড়াইতে পারিতেছি না, আমার মস্তক বিভ্রান্ত হইতেছে; আর দৈব লক্ষণ দেখিতেছি বিপরীত-বিপরীত। আত্মীয় স্বজনকে রণে হত্যা করিয়া মঙ্গল কিছুই দেখিতেছি না। আমি বিজয় চাহি না, কৃষ্ণ, রাজ্য চাহি না, সুখ-সমৃদ্ধি চাহি না। কি হইবে আমার রাজ্যে, কি হইবে ভোগ-বাহুল্যে, কি হইবে বাঁচিয়া থাকিয়া? যাঁহাদের জন্যে আমার রাজ্যের প্রয়োজন, ভোগৈশ্বর্য্যের প্রয়োজন, সুখ-সমৃদ্ধির প্রয়োজন—তাঁহা-রাই—পিতৃপিতামহ আচার্য্য ভাই-বন্ধুরাই—ধন প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থে দণ্ডায়মান, ইঁহাদের হস্তে যদি আমার মৃত্যু হয় সেও ভাল তথাপি ইঁহাদের আমি মৃত্যু কামনা করি না; পৃথিবী কোন্ ছার, ত্রৈলোক্যের রাজ্যের জন্যও ইঁহাদের হত্যাকার্য্যে আমি প্রবৃত্ত হইতে পারি না। ধৃতরাষ্ট্রের বংশ ধ্বংস করিয়া কী আমার লাভ হইবে, জনার্দ্দন! এই সকল আততায়িগণকে হত্যা করিলে লাভের মধ্যে পাপই আমাদিগকে আশ্রয় করিবে। ধৃতরাষ্ট্রের সন্তান সন্ততিগণকে সবান্ধবে হনন করা কোনো ক্রমেই আমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর নহে। আত্মীয়স্বজনকে হত্যা করিয়া কোন্ প্রাণে আমরা সুখী হইব। এরা সবে লোভে হতচেতন হইয়া যদি-বা দেখিতেছে না কিন্তু কুলক্ষয় এবং মিত্রদ্রোহ যে কি ভয়ানক পাপ—আমরা তো তাহা জানি! উঃ কি মহাপাপ করিতে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি! রাজ্যসুখের লোভে পড়িয়া আত্মীয়স্বজনকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছি। অস্ত্র শস্ত্র ফেলিয়া দিয়া এবং প্রতিবিধানের কোনো চেষ্টা না করিয়া কৌরবগণের হস্তে যুদ্ধে নিহত হওয়াই আমার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর।" এই বলিয়া অর্জ্জুন ধনুর্ব্বাণ ফেলিয়া দিয়া শোকের আবেগে বসিয়া পড়িলেন।

অর্জ্জুনকে এইরূপ কৃপাবিষ্ট অশ্রুপূর্ণ-লোচন এবং বিষাদাচ্ছন্ন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "যুদ্ধস্থলে আর্য্যবিগর্হিত স্বর্গের পথরোধকারী এ পাপ কোথা হইতে তোমাতে আসিয়া উপস্থিত হইল? এরূপ হতোদ্যম ভাব কাপুরুষদিগকেই শোভা পায়, তোমাকে শোভা পায় না কৌন্তেয়। ক্ষুদ্র-জনোচিত হৃদয়দৌর্ব্বল্য দূরে নিপেক্ষ করিয়া—ওঠো পরন্তপ!" অর্জ্জুন বলিলেন "ভীষ্ম এবং দ্রোণ উভয়েই আমার পূজার্হ—তাঁহারা যদি-বা আমার প্রতি শস্ত্র নিক্ষেপ করেন কিন্তু আমি তাঁহাদের প্রতি কোন্ প্রাণে শস্ত্র নিক্ষেপ করিব? মহানুভাব গুরুগণকে হত্যা করিয়া রক্তকলুষিত ঐশ্বর্য্য ভোগ করা অপেক্ষা গুরুহত্যা পাপ হইতে নির্লিপ্ত থাকিয়া ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন করা শত গুণ শ্রেয়। এ যুদ্ধে আমার পক্ষে জয় ভাল কি পরাজয় ভাল তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। যাঁহাদিগকে হত্যা করিয়া বাঁচিয়া-সুখ নাই তাঁহারাই যুদ্ধার্থে সম্মুখে দণ্ডায়মান। আমার স্বাভাবিক বলবীর্য্য কৃপাদৌর্ব্বল্যে পর্য্যাকুলিত হইয়াছে। আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, কি আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর তাহা আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলো—আমি তোমার প্রণত শিষ্য আমাকে শিক্ষা প্রদান কর। যে শোক আমার সর্ব্বশরীর শোষণ করিতেছে, তাহার উপশম হইবে কেমন করিয়া তাহা আমি দেখিতে পাইতেছি না। আমি যদি পৃথিবীর অদ্বিতীয় সম্রাট্ হই তাহাতেই বা কি, আর, যদি স্বর্গের ইন্দ্রত্ব লাভ করি তাহাতেই বা কি—এ শোক কিছুতেই শান্তি মানিবার নহে। আমি যুদ্ধ করিব না।" এই বলিয়া অর্জ্জুন বাক্যে ক্ষান্ত হইলেন।

উভয় সেনার মধ্যে অর্জ্জুনকে এইরূপ বিষাদে ম্রিয়মাণ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকে সাংখ্যশাস্ত্রের কয়েকটি সার কথা স্মরণ

করাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন "অশোচ্যদিগের জন্য শোক করিতেছ, অথচ মুখে জ্ঞানবত্তা প্রকাশ করিতেছ ; এটা জেনো স্থির যে, লোকের মরণ-বাঁচনে পণ্ডিতেরা শোক করেন না। শরীরধারীর শরীরে শৈশব যৌবন জরা যেমন অবশ্যম্ভাবী, দেহান্তরপ্রাপ্তিও তেমনি অবশ্যম্ভাবী ; ধীর ব্যক্তি তাহাতে মুহ্যমান হ'ন না। আত্মা কোনো কালে জন্মেনও না—মরেনও না,—শরীর হত হইলে আত্মা হত হ'ন না। শস্ত্র ইঁহাকে ছিন্ন করিতে পারে না, অগ্নি ইঁহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, জল ইঁহাকে ভিজাইয়া নষ্ট করিতে পারে না, বায়ু ইঁহাকে শোষণ করিতে পারে না। ইনি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য, সর্ব্বগত, অচল, সনাতন। ইঁহাকে এইরূপ জানিয়া পণ্ডিতেরা ইঁহার জন্য শোক করেন না। অতএব সুখ এবং দুঃখ, লাভ এবং অলাভ, জয় এবং পরাজয়—দুইই সমান জানিয়া যুদ্ধে কৃতসংকল্প হও, তাহা হইলে পাপ তোমাকে স্পর্শ করিবে না। এ যাহা তোমাকে আমি বলিলাম এ-বুদ্ধি সাংখ্যের মধ্যে পাওয়া যায় ; তা ছাড়া আরো এক প্রকার বুদ্ধি যাহা যোগের মধ্যে পাওয়া যায় তাহাকে আশ্রয় করিয়া তুমি স্বচ্ছন্দে কর্ম্মবন্ধন হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিবে। সে বুদ্ধি কিরূপ তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।"

এখানে এইটি বিশেষরূপে লক্ষ্য করা উচিত যে, বলিতেছেন শ্রীকৃষ্ণ —শুনিতেছেন অর্জ্জুন। শ্রীকৃষ্ণ যদি আর কেহ হইতেন, আর, অর্জ্জুন যদি সামান্য একজন শোকসন্তপ্ত গৃহস্থ ব্যক্তি হইতেন, তাহা হইলে —শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এ পর্য্যন্ত যতগুলি কথা বলিলেন তাহার একটি কথাও যদিচ অসত্য নহে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও—বিদ্যুতের আলোক যেমন একগুণ অন্ধকারকে দশগুণ করিয়া তোলে, তেমনি বক্তার মুখবিনিঃসৃত জ্ঞানের কথা শ্রোতার একগুণ প্রাণের বেদনাকে দশ গুণ করিয়া

তুলিত, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। যে মানুষ স্নেহের পাত্র-টিকে বা প্রাণতুল্য প্রিয় বন্ধুকে জন্মের মতো হারাইয়া জগৎসংসার অন্ধকার দেখিতেছে—তত্ত্বজ্ঞানের কথা তাহার নিকটে নিতান্তই বাজে কথার সামিল। সে বলিবে যে, "আত্মা জন্মমৃত্যুবিহীন নিত্য নির্ব্বি-কার তাহা আমি জানি, কিন্তু তাহাতে আমার কোনো প্রয়োজন নাই—যাহাকে আমি হারাইয়াছি তাহাকেই আমার প্রয়োজন।" ইহার উত্তরে উপদেষ্টা যদি বলেন যে, "অনিত্য বস্তুর উপরে প্রীতি স্থাপন করিলে সকলেরই এইরূপ দশা হয়, তোমার শুধু না"—এ কথার উত্তরে সে ব্যক্তি মুখে না বলুক—মনে মনে নিশ্চয়ই বলিবে যে, "নেই মামা অপেক্ষা কানামামা ভাল; চিরস্থায়ী অন্ধকার অপেক্ষা ক্ষণস্থায়ী আলোক ভাল; অবিনাশী আত্মা হইয়া অনন্তকাল বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা ভোগ করা অপেক্ষা এক মুহূর্ত্ত যদি আমি সেই হাসি মুখখানি আর একবার চক্ষে দেখিতে পাই তবে কি ধন না লাভ করি; সে ধনের তুলনায় স্বর্গই বা কি, আর মোক্ষই বা কি, সবই আমার নিকটে তৃণতুল্য।" এ রোগের ঔষধ যদি কিছু থাকে তবে, সে ঔষধ বিবেক বৈরাগ্য এবং আত্মসংযম। অবিবেকী ব্যক্তি যে ক্ষণিক সুখের তুলনায় আত্মাকে অবিনাশী অন্ধকার মনে করিবে ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। রাম সংস্কৃত ভাষার ক-অক্ষরও জানে না—এরূপ স্থলে শ্যাম যদি তাহাকে সরস সংস্কৃত পদ্য পাঠ করিয়া শুনায়—তবে রাম তো বলি-বেই যে, "আমার কানের কাছে সংস্কিড়িমিড়ি করিও না।" প্রকৃত কথা এই যে আত্মা শুধু যে কেবল আছে মাত্র তাহা নহে, আত্মা জ্ঞান প্রেম এবং আনন্দের খনি। পৃথিবী কত যে যুগযুগান্তর তপস্যা করিয়া আত্মাকে পাইয়াছে, তাহা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের অবিদিত নাই। আত্মা পৃথিবীর অন্ধকারের আলো, মরুভূমির উদ্যান। আত্মাকে

পাইয়া পৃথিবীর শ্রী ফিরিয়া গিয়াছে। সসাগরা পৃথিবীর সমস্ত ধন-রত্ন একদিকে—আর, আত্মা একদিকে—আত্মার তুলনায় সেসব ধন-রত্ন অকিঞ্চিৎকর ছাই ভস্ম। আত্মা যদি কেবল আছে মাত্র হইত তাহা হইলে আত্মাকে জানিবার জন্য কাহারো কোনো মাথাব্যথা হইত না। বেদান্তশাস্ত্র বলেন যে, আত্মা অস্তি ভাতি এবং প্রিয় এই তিন অমূল্য রত্ন একাধারে। অস্তি কিনা আত্মার ধ্রুব-প্রতিষ্ঠা, ভাতি কিনা আত্মার জ্ঞানালোক, প্রিয় কিনা আত্মার প্রেমামৃত। পুষ্করিণীতে পঙ্ক জমিয়া তাহার জল যখন অব্যবহার্য্য হয়, তখন পুষ্করি-ণীকে যেমন ঝালানো আবশ্যক, তেমনি, বিবেক বৈরাগ্য এবং সংযম দ্বারা আত্মার পঙ্কোদ্ধার করা আবশ্যক। তা নহিলে আত্মা সাধকের ভোগে আসিতে পারে না। মোট সংস্কৃত ভাষার মধ্যে যেমন ব্যাকরণ অলঙ্কার কাব্য সাহিত্য সবই অন্তর্ভূত রহিয়াছে, তেমনি সমগ্র আত্মাতে জ্ঞান বীর্য্য প্রেম আনন্দ সবই অন্তর্ভূত রহিয়াছে—এটা খুব সহজেই বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও জানা উচিত যে, সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে সংস্কৃত ব্যাকরণ জ্ঞানে আয়ত্ত করা চাই—কারক বিভক্তি সর্ব্বনাম উপসর্গ প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষার পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিধিমতে পরিচয় লাভ করা চাই; তাহার পরে সেই সকল পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জোড়া দিয়া ব্যাকরণ জ্ঞানকে কিরূপে ভাষার ব্যবহারকার্য্যে পরিণত করিতে হয় তাহা হাতে কলমে করিয়া-শেখা চাই; তা নইলে সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যের রসা-স্বাদনে বিদ্যার্থী ব্যক্তির অধিকার জন্মিতে পারে না। বিদ্যার্থী ব্যক্তি যদি আচার্য্যকে বলেন যে, "একে তো ব্যাকরণ শাস্ত্রে কোনো রসকস নাই, তাহাতে-আবার শব্দের ইট কাট জড়ো করিয়া বাক্যের ভিত গাঁথিয়া তোলা এক প্রকার রাজমজুরের কাজ—তাহাতে আমার মন

যাইতেছে না, আমি কালিদাসের শকুন্তলা নাটক পাঠ করিতে ইচ্ছা করি, তাহাই আমাকে অধ্যয়ন করা'ন" তবে সেটা যেমন বিদ্যার্থী ব্যক্তির দুরাকাঙ্ক্ষা, তেমনি সাধক যদি আচার্য্যকে বলেন যে, "তত্ত্বজ্ঞান অতিশয় নীরস, শমদমাদির সাধন অতিশয় কঠোর ; এ সকলেতে আমার মন যাইতেছে না—যাহাতে আমি আধ্যাত্মিক প্রেমানন্দ হাত বাড়াইয়া পাইতে পারি, সেই বিষয়ে আমাকে সদুপদেশ প্রদান করুন" এটাও উহা অপেক্ষা বেশী বই কম দুরাকাঙ্ক্ষা নহে। পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে সাধনের পাঁচটি সোপান-পংক্তি উত্তরোত্তর বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে এইরূপ :—প্রথম পঁইটা শ্রদ্ধা, দ্বিতীয় পঁইটা বীর্য্য, তৃতীয় পঁইটা স্মৃতি, চতুর্থ পঁইটা সমাধি, পঞ্চম পঁইটা প্রজ্ঞা। গীতার প্রথম উপক্রমেই বিশুদ্ধ জ্ঞানের কথা যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে তাহার-প্রতি-শ্রদ্ধাই সাধনের প্রথম পঁইটা—যদিচ সে কথাটি হোমিওপাথিক বটিকার ন্যায় বিন্দু-পরিমাণ। সে কথা এই যে, আত্মা জন্মমৃত্যুবিহীন নিত্য নির্বিকার। সংক্ষেপে—আত্মার ধ্রুব অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন সাধনের প্রথম পঁইটা। এ বিশ্বাস লোকের মুখে শোনা কথায় বিশ্বাস নহে—পরন্তু আপনার অন্তরতম-প্রদেশের জানা কথায় বিশ্বাস। পরিব্রাজক যেমন এটা নিশ্চয় জানে যে, সে যখন গন্তব্য পথে চলিতেছে তখন আকাশস্থিত চন্দ্র তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে না, সাধকের তেমনি এ-বিষয়ে স্থির-নিশ্চয় হওয়া উচিত যে, তাঁহার শরীর মন এবং বাহিরের বস্তু সকল যখন পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তখন সেই পরিবর্ত্তনের সাক্ষীরূপী আত্মা উহাদের সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইতেছেন না—আত্মা স্থির রহিয়াছেন। এ কথা অন্যের মুখে শোনা কথা নহে—পরন্তু সাধকের আপনার অন্তরের জানা কথা। এই জানা কথাটির উপরে ভরপূর বিশ্বাস স্থাপন করাই সাধনের প্রথম পঁইটা। দ্বিতীয় পঁইটা বীর্য্য, অর্থাৎ জ্ঞানের কথাকে

কার্য্যে ফলাইয়া তুলিতে হইলে যেরূপ বীরত্বের প্রয়োজন হয়, সেইরূপ বীরত্ব। ভাব এই যে, শমদমাদির সাধনে এবং অনাসক্তচিত্তে কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে অপ্রতিহত উদ্যম এবং উৎসাহই সাধনের দ্বিতীয় পঁইটা। তৃতীয় পঁইটা স্মৃতি ; ভাব এই যে, শমদমাদি এবং নিষ্কাম কর্ম্মের সাধন যখন অভ্যাসগতিকে সাধকের স্মরণে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত হইয়া যায়, তখন আত্মাতে এক প্রকার অনুপম আধ্যাত্মিক শক্তি প্রাদুর্ভূত হয় ; এইরূপ আত্মশক্তির প্রাদুর্ভাব সাধনের তৃতীয় পঁইটা। সাধনের চতুর্থ পঁইটা সমাধি অর্থাৎ একাগ্রতা ; ভাব এই যে, সাধকের মনে যখন আত্মশক্তি সুপরিস্ফুট হয়, তখন সাধকের মন লক্ষ্যবিষয়ে অনায়াসে স্থিরীভূত হয়। এইরূপ লক্ষ্যবিষয়ে মনের স্থৈর্য্যই সাধনের চতুর্থ পঁইটা। পঞ্চম পঁইটা প্রজ্ঞা, অর্থাৎ জ্ঞাতব্য বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞান। ভাব এই যে, আতস পাথরের অর্থাৎ magnifying glassএর মধ্য দিয়া সূর্য্যরশ্মিকে কোনো দাহ্য পদার্থের উপরে কেন্দ্রীভূত করিলে সেই দাহ্য পদার্থের ভিতরে যেমন অগ্নি প্রবেশ করিয়া তাহার অন্তরবাহির অগ্নিময় করিয়া তোলে—তেমনি, আত্মশক্তি-সহকারে মন লক্ষ্য বস্তুতে তদ্গতভাবে নিবিষ্ট হইলে সেই লক্ষ্য বস্তুতে জ্ঞানাগ্নি প্রবেশ করিয়া লক্ষ্য বস্তুকে জ্ঞানময় করিয়া তোলে। এইরূপ অবস্থায় সাধকের পরম পরিশুদ্ধ জ্ঞান সকল-বস্তুর ভিতরে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বভূতে পরমাত্মাকে দর্শন করে এবং পরমাত্মাতে সর্ব্বজগৎ দর্শন করে, ইহারই নাম যোগ ; ইহাই সাধনের পঞ্চম পঁইটা ;—সাধক যখন এই পঞ্চম পঁইটাতে উত্তীর্ণ হ'ন তখন তাঁহার মনে আনন্দের ফোয়ারা খুলিয়া যায়। গীতাশাস্ত্রে দুইরূপ আনন্দের উল্লেখ আছে ;—প্রথম, মাঝপথের আনন্দ বা সাধনের আনন্দ ; দ্বিতীয়, গম্যস্থানের আনন্দ বা সিদ্ধি-লাভের আনন্দ। মাঝপথের আনন্দ উল্লিখিত হইয়াছে এইরূপ :—

"রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥
প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে॥"

সাধক রাগদ্বেষ হইতে বিমুক্ত হইয়া আপনাকে আপনার বশে রাখিয়া ইন্দ্রিয়-যোগে বিষয়ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। আত্ম-প্রসাদে সমস্ত দুঃখের অবসান হয়; প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি লক্ষ্য বস্তুতে স্থিরভাবে নিবিষ্ট হয়। ভাব এই যে, বিবেক বৈরাগ্য এবং সংযম দ্বারা চিত্ত পরিশুদ্ধ হইলে আত্মার সহজ আনন্দ আপনা হইতেই পরিস্ফুট হয়। এইরূপ সহজ আনন্দের প্রধান-একটি গুণ এই যে, যাহাতেই যখন মন দেওয়া যায়, তাহাতেই তখন মন বসে। এই গেল সাধকের মাঝপথের আনন্দ। গম্যস্থানের আনন্দ বর্ণিত হইয়াছে এইরূপ:—

সুখমাত্যন্তিকং যৎ তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥
যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥

সেখানে অর্থাৎ যোগের অবস্থায় সাধক বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় আত্যন্তিক সুখ যে কাহাকে বলে তাহা জানিতে পা'ন; আর সেখানে স্থিত হইলে সাধক তত্ত্ব হইতে বিচলিত হ'ন না। সেখানে সাধক যাহা লাভ করেন, তাহা অপেক্ষা অপর কোনো লাভকেই তিনি অধিক মনে করেন না; আর সেখানে স্থিত হইয়া গুরু বিপদেও বিচলিত হ'ন না। আনন্দসম্বন্ধে এ যাহা আমি কথা-প্রসঙ্গে বলিলাম—এটা সাধন-পদ্মানদীর ওপারের কথা; আমরা কিন্তু রহিয়াছি এপারে কারাবদ্ধ; কাজেই, আমাদের পক্ষে ওরূপ উচ্চ আনন্দের কথাবার্ত্তার আন্দো-

লন একপ্রকার "গাছে কাঁটাল—গোঁফে তেল।" এ-রকমের বাক্য-বাণ আমার সহা আছে ঢের; সুতরাং উহা গ্রাহ্যের মধ্যে না আনিয়া আমার যাহা কর্ত্তব্য মনে হইল তাহাই আমি করিলাম;—যাত্রীরা পাছে নৌকাযোগে পদ্মানদী পার হইতে অনিচ্ছুক হ'ন—এই জন্য পদ্মানদীর ওপার যে কিরূপ রমণীয় স্থান তাহা দূরবীণ-যোগে তাঁহদিগকে দেখাইলাম। এখন নৌকা আরোহণ করিবার সময় উপস্থিত; অতএব, যাত্রী ভায়ারা পোঁট্‌লা-পুঁট্‌লি বাঁধিয়া প্রস্তুত হউন্।

চতুর্থ অধিবেশন।

ব্যাখ্যান।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সর্ব্বপ্রথমে সাংখ্যসম্মত তত্ত্বজ্ঞানের সার কথাটি স্মরণ করাইয়া দিলেন ; তাহা এই যে, শরীর কৌমার হইতে যৌবনে, যৌবন হইতে বার্দ্ধক্যে, বার্দ্ধক্য হইতে মৃত্যুতে পদনিক্ষেপ করিতে থাকে—ক্রমাগতই পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে ; কিন্তু সেই পরিবর্ত্তনের সাক্ষী যিনি আত্মা তিনি প্রকৃতির কোনো পরিবর্ত্তনেই পরিবর্ত্তিত হ'ন না। কিন্তু আত্মা স্থির আছেন জানিয়া তুমি নিশ্চেষ্ট-ভাবে বসিয়া থাকিলে চলিবে না ; প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের স্রোতে বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত হইতে না দিয়া তোমাকে করিতে হইবে কর্ম্মের পর্ব্বত-আরোহণ ;— তাহার শিখরে যখন উত্থান করিবে তখন তোমার অন্তর্নিগূঢ় জ্ঞান এবং আনন্দ পরিষ্কাররূপে দীপ্তি পাইবে। তুমি চক্ষুষ্মান্ই হও, আর অন্ধই হও, তোমাকে গন্তব্য পথ অতিবাহন করিতেই হইবে। তুমি যদি চক্ষুষ্মান্ হইয়াও পথ দেখিয়া না চলিয়া ক্রমাগতই খানায় ডোবায় পা-পিছ্লিয়া পড়িয়া যাইতে থাক', তাহা হইলে তোমার চক্ষু থাকা না-থাকা সমান। তুমি যদি ইংরাজি ব্যাকরণশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়াও একটা ইংরাজি কহিতে দশটা ব্যাকরণ ভুল কর তবে সেরূপ পাণ্ডিত্য অপেক্ষা মূর্খত্ব ভাল। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত করিয়াই ক্ষান্ত না হইয়া কর্ম্মের পার্ব্বত-পথের যাত্রীদিগের পক্ষে যাহা একান্ত পক্ষে অবলম্বনীয় এইরূপ একটি আশ্রয়-দণ্ড তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। সে আশ্রয়-দণ্ড হ'চ্চে অবিচলিতভাবে আত্মাতে স্থিতি—যাহার আর এক নাম যোগ। পাতঞ্জল-দর্শনে যোগশব্দের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এইরূপ :—

"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।
তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপে অবস্থানম্।"

যোগ কি? না চিত্তবৃত্তির নিরোধ। তাহাতে ফল হয় কী? না, স্বরূপে অবস্থান, অর্থাৎ আত্মা ঠিক্ আপনি যেরূপ—সেই আত্মরূপে ভর দিয়া দাঁড়ানো। ভাব এই যে, অসংযত মন ক্রমাগতই ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়, একদণ্ডও স্থির থাকে না; জ্ঞানকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে মনকে স্থির করা চাই। কচ্ছপ যেমন আপনার বহির্মুখ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভিতরে টানিয়া লয়, সেইরূপ বহির্মুখী মনোবৃত্তি সকলকে ভিতরে টানিয়া লইয়া আত্মাতে সমাহিত করা চাই। এই জায়গাটিতে গোড়াতেই এই একটি প্রশ্ন আমাদের মনে সহজেই উত্থিত হয় যে, জ্ঞান নানাপ্রকার—যেমন সঙ্গীত-বিজ্ঞান, জ্যোতিষ-বিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান ইত্যাদি। মানিলাম যে, সঙ্গীত-বিজ্ঞানকে কাজে খাটাইতে হইলে গীতের স্বরলহরীর প্রতি মন স্থির করা আবশ্যক; জ্যোতিষ-বিজ্ঞানকে কাজে খাটাইতে হইলে চন্দ্রসূর্য্যগ্রহাদির গতি-বিধির প্রতি মন স্থির করা আবশ্যক; রসায়ন-বিজ্ঞানকে কাজে খাটাইতে হইলে দ্রব্যাদির সংযোগ-বিয়োগ-মূলক রূপান্তর-সংঘটনের প্রতি মন স্থির করা আবশ্যক; এইরূপে বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের চরিতার্থতা সাধন করিতে হইলে বিশেষ বিশেষ বিষয়-ক্ষেত্রে মন স্থির করা আবশ্যক তাহা খুবই সত্য। কিন্তু তুমি বিষয়-বিশেষে মন স্থির করিতে বলিতেছ না—তুমি বলিতেছ আত্মাতে মনস্থির করিতে! হাঁ তাহাই আমি বলিতেছি! কেন বলিতেছি—তাহার বলি-শোনো কারণ:—মনে কর তুমি তানসেনের নিকটে বেহাগ-রাগিণীর গান-একটি শিক্ষা করিতেছ, আর মনে কর যে, সেই গানটির সমের জায়গার সুরটি নিরন্তর তোমার মনঃকর্ণে বাজিতেছে—উহার আর কোনো সুরের

প্রতি তোমার তেমন মন বসিতেছে না ; এরূপ হইলে, বেহাগ রাগিণী গাহিতে শেখা যে, তোমার ভাগ্যে কোনো কালে ঘটিয়া উঠিবে তাহার কোনো সুরাহা দেখিতেছি না। তুমি যদি বেহাগ রাগিণীর গান গাহিবার সামর্থ্য উপার্জ্জন করিতে ইচ্ছা কর, তবে বেহাগ-রাগিণীর গীতের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে বেহাগ-রাগিণীর মুখ্যভাবটি চুনিয়া লইয়া তাহারই প্রতি মনঃসমাধা করা তোমার পক্ষে অতীব কর্ত্তব্য। সা গা মা পা নি এই পাঁচটি সুর যেমন বেহাগ-রাগিণীর অন্তর্ভূত তেমনি সমস্ত বিজ্ঞান মোট-জ্ঞানের অন্তর্ভূত। একদিকে যেমন দীপালোকিত ঘরের মধ্যস্থিত ভিন্ন ভিন্ন স্থানের দ্রব্যাদি দীপনির্গত ভিন্ন ভিন্ন রশ্মিছটার আলোকে প্রকাশিত হয়, এবং আর-একদিকে যেমন দীপশিখার সঙ্গাশ্রিত মোট দীপরশ্মি আপনার আলোকে আপনি প্রকাশিত ; সেইরূপ একদিকে জ্যোতিষাদি ভিন্ন ভিন্ন শাখা-তত্ত্ব ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানের অর্থাৎ ফ্যাক্‌ড়া জ্ঞানের আলোকে প্রকাশিত হয়, আর একদিকে আত্মার সঙ্গাশ্রিত মোট-জ্ঞান আপনাতে আপনি প্রকাশিত। আত্মার সঙ্গাশ্রিত সেই যে জ্ঞান যাহা আপনাতে আপনি প্রকাশিত তাহারই নাম আত্মজ্ঞান—আত্মজ্ঞানই মোট-জ্ঞান। দীপের সমস্ত ফ্যাকড়া রশ্মিজাল যেমন দীপশিখার সঙ্গাশ্রিত মোট-রশ্মির অন্তর্ভূত, তেমনি সমস্ত ফ্যাকড়াজ্ঞান বা বিজ্ঞান আত্মাশ্রিত মোট-জ্ঞানের বা আত্মজ্ঞানের অন্তর্ভূত। উপনিষদে স্পষ্টই লেখা আছে যে,—

"অপরা ঋকবেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি অথ পরা যয়া তদক্ষর-মধিগম্যতে।"

অর্থাৎ অপরাপর বিদ্যা অপরা বিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যাই পরাবিদ্যা। যেমন বেহাগের গীত গাহিবার সময়ে সেই রাগিণীর মুখ্য ভাবটির

মাধুর্য্যরসে নিমগ্ন হইয়া আরোহী এবং অবরোহী পদ্ধতি-অনুসারে স্বরসপ্তক বিচরণ করিতে হয়, তেমনি জ্ঞানের সহিত যোগ রক্ষা করিয়া কর্ত্তব্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইলে আত্মার মুখ্যতম জ্ঞান এবং আনন্দে দৃঢ়রূপে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া অনাসক্তচিত্তে কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করা বিধেয়। কেননা, তাহা হইলেই কর্ম্মধন্দার প্রতিযোগে আত্মার বিশুদ্ধ জ্ঞান, স্বাধীন স্ফূর্ত্তি, এবং সদানন্দ—অনুপম সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া বাহির হইতে পথ পাইবে।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সাংখ্যের উপদেশ দিয়া তাহার পরে যোগের উপদেশ দিতেছেন। তিনি বলিতেছেন; "ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি এক বই দুই নহে কুরুনন্দন, পরন্তু অব্যবসায়ীদিগের বুদ্ধি বহুশাখা এবং অনন্ত।" এই কথাটির একটি উপমা দিতেছি তাহার আলোকে উহার তাৎপর্য্য শ্রোতৃগণের চক্ষে পরিষ্কাররূপে প্রতিভাত হইবে।

মনে কর যে, দেশের রাজা দূত-মুখে তোমার প্রতি এইরূপ আদেশ প্রচার করিলেন যে, ঠিক্ বেলা দশটার সময়ে তুমি রাজপরিষদে উপস্থিত হইতে চাও, এক মুহূর্ত্তও যেন বিলম্ব না হয়; আর, মনে কর, রাজসভায় যাইবার জন্য তুমি সাজিয়া বাহির হইযাছ, ইতিমধ্যে তোমার দুই বয়স্য রাজদর্শনের অভিলাষী হইয়া তোমার সঙ্গে যুটিলেন। মনে কর, রাজবাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণের চরম প্রান্ত হইতে প্রাসাদের তোরণদ্বার-পর্য্যন্ত ডানদিক্ দিয়া তিনটি শানবাঁধা বক্রপথ ঘুরিয়া গিয়াছে, আর, বামদিক্ দিয়া ঐরূপ আর-তিনটি বক্রপথ ঘুরিয়া গিয়াছে। তোমার সঙ্গী-দুজনার মধ্যে ঘোরতর তর্ক বিতর্ক চলিতে আরম্ভ হইল। রাম বাবু বলিলেন, বাম দিকের পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়; শ্যাম বাবু বলিলেন, দক্ষিণ দিকের পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়; এ তর্কের আর কিছুতেই মীমাংসা হইতেছে না; এদিকে সময় বহিয়া

যাইতেছে ; তোমাকে ঠিক দশটার সময়ে রাজপরিষদে উপস্থিত হইতে হইবে ;—তুমি তাই বলিলে, "তোমরা বলিতেছ নানা কথা—ঘড়ি কি বলে দেখি" ; ঘড়ি বলিল, "৯টা বাজিয়া পঞ্চাশ মিনিট্" । তুমি বলিলে "সর্ব্বনাশ !" বলিয়াই তৎক্ষণাৎ তুমি সম্মুখের সীধা রাস্তা দিয়া দ্রুত-বেগে চলিয়া রাজপরিষদে উপস্থিত হইলে ; যেই তুমি রাজার সম্মুখে জোড়করে দণ্ডায়মান হইয়াছ, আর অমনি ঢঙ্ ঢঙ্ শব্দে দশটার ঘণ্টা বাজিতে আরম্ভ হইল। বহিঃপ্রাঙ্গণের চরমপ্রান্ত হইতে প্রাসা-দের তোরণদ্বারে যাইবার বাঁকাপথ ডাইনে বামে তিন তিনটি, কিন্তু সোজাপথ সম্মুখে একটি মাত্র—যদিচ সে পথ কাটিয়া প্রস্তুত করা নাই। কর্ত্তব্যকার্য্যের অলঙ্ঘনীয় অনুরোধে তুমি সেই অপরিচিহ্নিত সোজা পথটি অবলম্বন করিয়া রাজাজ্ঞা পালনে কৃতকার্য্য হইলে ; আর, তোমার সঙ্গী দুজনার তর্কবিতর্কের কিছুতেই মীমাংসা না হওয়াতে, তাহাদের ভাগ্যে রাজদর্শন ঘটিয়া উঠিল না। রাজবাটীতে যাইবার সোজা পথ যেমন এক বই দুই নহে, ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি অর্থাৎ কার্য্য-করী বুদ্ধি তেমনি এক বই দুই নহে ; পক্ষান্তরে, রাজবাটীতে যাইবার বাঁকা পথ যেমন অসংখ্য, অব্যবসায়ীদিগের বুদ্ধি (অর্থাৎ অ-কেজো লোকের বুদ্ধি) তেমনি অসংখ্য এবং তাহার ডালপালা অনেক।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"ফলকামী স্বর্গলোভী মূর্খ পণ্ডিতেরা বেদের দোহাই দিয়া এই যে সকল কথা বলেন যে, "নানাবিধ বহুমূল্য উপ-করণের আয়োজন করিয়া খুব ঘটা করিয়া যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান কর তাহা হইলে পরলোকে তোমার ভোগৈশ্বর্য্যের সীমা-পরিসীমা থাকিবে না"—এই সকল পুষ্পিত বাক্যাবলীর ছটাতে যাহাদের মন অপহৃত হয়, সমাধি-প্রবণ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি তাঁহাদের নিকটে সমাদর প্রাপ্ত হয় না। প্রায়ই দেখা যায় যে, আমাদের দেশের বড় মিয়া ছোট

মিয়া প্রভৃতি ওস্তাদ গায়কেরা রাগরাগিণী ভাঁজিবার সময়ে মুদ্রাদোষ-সহকারে প্রভূতপরিমাণে গিট্‌কিরি জারি করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর বাহবা আকর্ষণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এ বোধ নাই যে, ঐ সকল ওস্তাদিঢঙের গিট্‌কিরি-বাজিতে রাগিণীর মুখ্য ভাব-মাধুর্য্য সাত হাত জলের নীচে চাপা পড়িয়া যায়। যেমন গীতগান-কার্য্য সুচারুরূপে সমাধা করিতে হইলে রাগ রাগিণীতে মন স্থির করা আবশ্যক, তেমনি ধর্ম্মানুমোদিত কর্ত্তব্য কার্য্য সুনির্ব্বাহ করিতে হইলে আত্মাতে মনকে সমাহিত করা আবশ্যক; আর, তাহারই এক-নাম সমাধি এবং আর-এক নাম যোগ। শ্রীকৃষ্ণ তাই অর্জ্জুনকে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিতে ভর করিয়া যোগের পথ অবলম্বন করিতে বলিতেছেন;—বলিতেছেন "বেদশাস্ত্র ত্রৈগুণ্যবিষয়ক—তুমি অর্জ্জুন নিস্ত্রৈগুণ্য হও, নির্দ্বন্দ্ব হও, নিত্যসত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হও, যোগ-ক্ষেমের ভাবনা হইতে বিরত হও—অর্থাৎ কি খা'ব কি পরিব এ সকল বিষয়ে চিন্তা করিও না—আত্মবান্ হও অর্থাৎ তোমার ভিতরে যে, আত্মা জাগিতেছে, কার্য্যে তাহার পরিচয় দাও।" এ জায়গাটির ভাবার্থ ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, ত্রিগুণ পদার্থটা কি—সগুণই বা কাহাকে বলে আর নির্গুণই বা কাহাকে বলে, এ সমস্ত বিষয় ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখা চাই। আগামী বারে এই দুরূহ বিষয়টিতে হাত দেওয়া যাইবে।

পঞ্চম অধিবেশন।

ব্যাখ্যান।

এই যে একটি কথা—যে, প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা, অথচ আত্মা যিনি প্রকৃতির দ্রষ্টা এবং অধিষ্ঠাতা তিনি নির্গুণ, এ কথাটি আমাদের দেশের সকল শাস্ত্রেই—বিশেষত সাংখ্য এবং বেদান্ত শাস্ত্রে—আবহমান কাল হইতে সমস্বরে ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ও-কথাটির অর্থ কি? ত্রিগুণ—পদার্থটা কি? এই প্রশ্নের যথাবৎ মীমাংসা করিতে হইলে সত্ত্বগুণের গোড়ার কাহিনীটি অন্ধকার হইতে আলোকে টানিয়া বাহির করা কর্ত্তব্য। এ কার্য্যটির নিষ্পাদন অতি সহজে হইতে পারে;—হয় না কেবল আমাদের নিজের দোষে। আমরা গোড়ার পঁইটা হইতে যাত্রারম্ভ না করিয়া আগে ভাগেই চরম পঁইটাতে পদনিক্ষেপ করিবার জন্য ব্যস্ত হই, আর সেই জন্য অভীষ্ট ফল-লাভে বঞ্চিত হই। অতএব আমাদের এই কুশিক্ষা-মূলক চাপল্য-দোষটিকে প্রশ্রয় না দিয়া সর্ব্বাগ্রে সত্ত্ব-গুণের গোড়ার কাহিনীটির তথ্যনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যা'ক্।

কবি শব্দ হইতে কবিতা এবং কবিত্ব এই দুইটি শব্দ উৎপত্তিলাভ করিয়াছে—ইহা সকলেরই জানা কথা। এটাও তেমনি জানা উচিত যে, সৎ শব্দ হইতে সত্তা এবং সত্ত্ব এই দুইটি শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে;—দেখা উচিত যে, কবিতা এবং কবিত্বের মধ্যে যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সত্তা এবং সত্ত্বের মধ্যে অবিকল সেইরূপ। কবির কবিতা যখন প্রকাশে বাহির হয়, তখন তাহা-দৃষ্টে আমরা যেমন বুঝিতে পারি যে, কবির ভিতরে কবিত্ব রহিয়াছে, তেমনি যে-কোনো

বস্তুর সত্তা যখনই আমাদের নিকটে প্রকাশ পায়, তখনই আমরা বুঝিতে পারি যে, সে বস্তুর ভিতরে সত্ত্ব রহিয়াছে—সে বস্তু সৎ-পদার্থ। অতএব এটা স্থির যে, কবিতার প্রকাশ যেমন কবিত্ব-গুণের পরিচয়-লক্ষণ, সত্তার প্রকাশ তেমনি সত্ত্বগুণের পরিচয়-লক্ষণ। সত্ত্বগুণের আর একটি পরিচয়-লক্ষণ আছে—সেটি হ'চ্চে সত্তার রসাস্বাদন-জনিত আনন্দ। কবিতার রসাস্বাদনে যখন ভাবুক ব্যক্তির আনন্দ হয়, তখন সেই আনন্দমাত্রটি যেমন কবির অন্তর্নিহিত কবিত্বগুণের পরিচয় প্রদান করে, তেমনি সত্তার রসাস্বাদনে চেতনাবান্ ব্যক্তির যখন আনন্দ হয়, তখন সেই আনন্দ-মাত্রটি সদ্‌বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্ত্বগুণের পরিচয় প্রদান করে।

আমরা প্রতিজনে আমাদের আপনার আপনার ভিতরে মনো-নিবেশ করিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, প্রকাশ-এবং-আনন্দ সত্তা'র সঙ্গের সঙ্গী। "আমি এযাবৎকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তিয়া রহিয়াছি" এই বর্ত্তিয়া থাকা ব্যাপারটি আমি যেমন আমার মধ্যে উপলব্ধি করিতেছি, তুমিও তেমনি তোমার মধ্যে উপলব্ধি করিতেছ। ইহারই নাম আত্মসত্তার প্রকাশ। আবার, "আমি যেমন এযাবৎকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তিয়া রহিয়াছি তেমনি সর্ব্বকালেই যেন বর্ত্তিয়া থাকি" আমাদের আপনার আপনার প্রতি আপনার আপনার এই যে মঙ্গল আশীর্ব্বাদ, এ আশীর্ব্বাদ আমাদের প্রতিজনের আত্মসত্তার উপরে নিরন্তর লাগিয়া রহিয়াছে। আত্মসত্তাতে যদি আমাদের আনন্দ না হইত তবে ঐ শুভ ইচ্ছাটি (অর্থাৎ বর্ত্তিয়া থাকিবার ইচ্ছা) কোনো কালেই আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে স্থান পাইতে পারিত না। এইরূপ আমরা দেখিতেছি যে, আমাদের প্রতিজনের আপনার আপনার মধ্যেই সত্তা'র সঙ্গে সত্তার প্রকাশ এবং সত্তার রসাস্বাদনজনিত আনন্দ

মাথামাখি-ভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে, আর, সেই গতিকে আমরা এটা বেশ্ বুঝিতে পারিতেছি যে, আমাদের ভিতরে সত্ত্ব আছে—আমরা সৎপদার্থ। আমাদের দেশের সকল শাস্ত্রেই তাই এ কথাটি বেদ-বাক্যের ন্যায় মানিয়া লওয়া হইয়াছে যে, প্রকাশ এবং আনন্দই সত্ত্বগুণের পরিচায়ক লক্ষণ। সত্ত্বগুণ কাহাকে বলে তাহা দেখিলাম, এখন রজোগুণ এবং তমোগুণ কাহাকে বলে তাহা দেখা যা'ক্।

নানা কবির কবিতা আছে, কিন্তু তাঁহাদের সকলেরই কবিতা দেশ-কাল-পাত্রে পরিচ্ছিন্ন এই অর্থে ব্যষ্টিকবিতা। পক্ষান্তরে কবিরা যাঁহার খাইয়া মানুষ, তাঁহার কবিতা সর্ব্বদেশের এবং সর্ব্বকালের কবিতা এই অর্থে সমষ্টিকবিতা। কবিরা যাঁহার খাইয়া মানুষ, তিনি কে? তিনি সাধারণ ব্যক্তি নহেন—তিনি প্রকৃতিদেবী স্বয়ং। কাব্যানুরাগী বিদ্বজ্জন-সমাজে এ কথা কাহারো নিকটে অবিদিত নাই যে, কালিদাসের কবিতায় যেমন শেক্সপিয়রীয় কবিত্বগুণের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না, শেক্সপিয়রের কবিতাতেও তেমনি কালিদাসীয় কবিত্বগুণের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না; তেমনি আবার মিল্টনের কবিতাতেও ও-দুই-শ্রেণীর কবিত্বগুণের কোনোটিরই নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবেই হইতেছে যে, প্রকৃতিদেবীর হৃদয় হইতে উচ্ছ্বসিত সমষ্টিকবিতা যেমন পূর্ণমাত্রা কবিত্বের অভিব্যঞ্জক, ব্যষ্টিকবিতা সেরূপ নহে; ব্যষ্টিকবিতা-মাত্রই কবিত্বগুণের দেশ-কাল-পাত্রোচিত খণ্ডাংশেরই অভিব্যঞ্জক। কবিতাসম্বন্ধে এ যেমন আমরা দেখিলাম, সত্তা-সম্বন্ধেও সেইরূপ আমরা দেখিতে পাই যে, এক শাখার পুষ্প যেমন অপর কোনো শাখার পুষ্প নহে, তেমনি তোমার সত্তাও আমার সত্তা নহে, আমার সত্তাও তোমার সত্তা

নহে, এবং তৃতীয় আর যে-কোনো ব্যক্তির নাম করিবে তাহার সত্তাও তোমার বা আমার সত্তা নহে। ব্যষ্টিসত্তা-মাত্রই এইরূপ দেশ কাল পাত্রে পরিচ্ছিন্ন; আর সেই জন্য কোনো ব্যষ্টিসত্তাই পূর্ণমাত্রা সত্ত্বগুণের বা শুদ্ধসত্ত্বের পরিচায়ক নহে; ব্যষ্টিসত্তামাত্রই বাধাক্রান্ত সত্ত্বগুণের পরিচায়ক। পক্ষান্তরে, যেমন সকল শাখার পুষ্পই বৃক্ষের পুষ্প, সুতরাং বৃক্ষের পুষ্পরাজিই সমষ্টি-পুষ্প, আর প্রত্যেক শাখার প্রত্যেক পুষ্প সেই সমষ্টি-পুষ্পের অন্তর্ভূত; তেমনি প্রকৃতির অধীশ্বর যিনি পরমাত্মা তাঁহার সত্তাই সমষ্টিসত্তা এবং আর-আর সকল সত্তাই সেই সমষ্টিসত্তার অন্তর্ভূত; আর, সেই জন্য সমষ্টিসত্তা যেমন অবাধিত সত্ত্বগুণের বা শুদ্ধসত্ত্বের নিধান, ব্যষ্টিসত্তা সেরূপ নহে। ব্যষ্টিসত্তামাত্রই বাধাক্রান্ত সত্ত্বগুণের, অথবা যাহা একই কথা—বাধাক্রান্ত প্রকাশ এবং আনন্দের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র। বলিয়াছি যে, সত্ত্বগুণের পরিচায়ক লক্ষণ দুইটি, একটি হ'চ্চে প্রকাশ এবং আর একটি হ'চ্চে আনন্দ। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রকাশকে বাধা প্রদান করে কে? অবশ্য অচৈতন্য-বা-জড়তা এবং অবসাদ-বা-স্ফূর্ত্তিহীনতা। আনন্দকে বাধা প্রদান করে কে? অবশ্য দুঃখ-বা-পীড়ানুভব এবং অশান্তি-বা-প্রবৃত্তিচাঞ্চল্য। সত্ত্বগুণের এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকে শাস্ত্রীয় ভাষায় যথাক্রমে বলা হইয়া থাকে তমোগুণ এবং রজোগুণ। তমোগুণ যে কি অর্থে তমোগুণ তাহা তমঃ শব্দের গায়ে লেখা রহিয়াছে—তমোগুণ প্রকাশের প্রতিদ্বন্দ্বী এই অর্থেই তমোগুণ। রজোগুণ কি অর্থে রজোগুণ তাহাও রজঃ শব্দের গায়ে লেখা রহিয়াছে। পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে ধোপাদের বংশানুযায়ী কার্য্য কাপড়-কাচা তো ছিলই, তা ছাড়া তাহাদের আর একটি কার্য্য ছিল বস্ত্র রঙানো; এই জন্য সংস্কৃত ভাষায় ধোপা রজক নামে

প্রসিদ্ধ—বস্ত্র রঞ্জন করে অর্থাৎ রঙায় এই অর্থে রজক। রঙসম্বন্ধে জর্ম্মাণদেশীয় মহাকবি গেটের একটি সুপরীক্ষিত সিদ্ধান্ত এই যে, বর্ণক্ষেত্র মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত; সে তিন ভাগ হ'চ্চে—এক-দিকে সাদা, আর একদিকে কালো এবং দুয়ের মধ্যস্থলে রক্ত নীল পীত প্রভৃতি রঞ্জন বা রঙ। তাহার মধ্যে দেখিতে হইবে এই যে, কালো রঙ রঙই নহে—তাহা অন্ধকারেরই আর এক নাম। সাদা রঙ কালো রঙের ঠিক্ উল্টা পিঠ সুতরাং তাহাও প্রকৃত পক্ষে রঙ নহে। সাদা রঙ বিচিত্র বর্ণরাজির লয়স্থান—তাহা শুভ্র আলোক। বর্ণক্ষেত্র যেমন তিন ভাগে বিভক্ত—গুণক্ষেত্রও অবিকল সেইরূপ। গুণ-ক্ষেত্রের এ মুড়ায় রহিয়াছে সত্বগুণের নিরঞ্জন আলোক; ও মুড়ায় রহিয়াছে তমোগুণের অঞ্জন; এবং দুয়ের মধ্যস্থলে রহিয়াছে রজো-গুণের রঞ্জন। অর্থাৎ একদিকে রহিয়াছে সত্বগুণের চেতনজ্যোতি, আর একদিকে রহিয়াছে তমোগুণের জড়তা-অন্ধকার, এবং দুয়ের মধ্যস্থলে রহিয়াছে রাগদ্বেষরূপী রজোগুণের রঞ্জন। তাহার মধ্যে দ্বেষ তমোগুণ-ঘ্যাঁসা রজোগুণ, তাই তাহা অন্ধকার-ঘ্যাঁসা নীল রঙের সহিত উপমেয়; অনুরাগ সত্বগুণ-ঘ্যাঁসা রজোগুণ, তাই তাহা আলো-ঘ্যাঁসা পীতবর্ণের সহিত উপমেয়। রূপকচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে, সদাশিব মহাদেব দ্বেষকে গিলিয়া খাইয়াছেন, তাই তিনি নীলকণ্ঠ; আর, গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের পরিধান বস্ত্রে অনু-রাগের রঙ্-ধরিয়াছে, তাই তিনি পীতাম্বর। রজোগুণের নিজমূর্ত্তি, কিন্তু, রাগ; তার সাক্ষী রজোগুণের যে দুইটি প্রধান অন্তরঙ্গ—কাম আর ক্রোধ—দুইই রাগধর্ম্মী। কাম তো রাগধর্ম্মী বটেই; তা ছাড়া বঙ্গ-ভাষায় ক্রোধের আর এক নাম রাগ। রাগই প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্যের গোড়ার সূত্র। আত্মসত্তা যখন আত্মেতর-সত্তা দ্বারা, অর্থাৎ

পরসত্তা দ্বারা, রঞ্জিত হয়; আর, সেই গতিকে যখন জ্ঞাতা-পুরুষ কামোন্মত্ত বা ক্রোধোন্মত্ত হইয়া পাগলের ন্যায় জ্ঞানশূন্য এবং আত্মবিস্মৃত হইয়া যায়; তখনকার সেই যে প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্যের অবস্থা, তাহারই নাম রাগাতিশয্য। রজোগুণের সাক্ষাৎ নিজমূর্ত্তি এই যে, রাগ, ইহা লাল রঙের সহিত উপমেয়। রক্ত শব্দ, রঞ্জন শব্দ, রাগ শব্দ, রাঙা-শব্দ, রজঃ শব্দ, সবাই এরা একই মূলধাতুর সন্তান সন্ততি তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। যদি মূর্ত্তিমান্ রজোগুণ দেখিতে চাও, তবে একটা স্বচ্ছন্দচারী বৃষের সম্মুখে লাল রঙের নিশান ঝাঁকাইয়া চটপট্ বৃক্ষারোহণ কর, তাহা হইলেই রহস্যটা দেখিতে পাইবে। এ সকল আশপাশের গলিঘুচি ছাড়িয়া এখন প্রকৃত প্রস্তাবের বাঁধা রাস্তায় প্রত্যাবর্ত্তন করা যা'ক্।

একটু-পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি যে, ব্যষ্টিসত্তা-মাত্রই বাধাক্রান্ত সত্ত্বগুণের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র। সত্ত্বগুণের বাধা জন্মায় যে, কে, তাহাও আমরা দেখিয়াছি; দেখিয়াছি যে, যে-দুইটি অবয়ব সত্ত্বগুণের ডান-হাত বাঁ-হাত সেই দুইটি অবয়বের, অর্থাৎ প্রকাশ এবং আনন্দের, প্রথমটি'র (কিনা প্রকাশের) প্রতিদ্বন্দ্বী হ'চ্চে তমোগুণ বা জড়তা এবং অবসাদ; দ্বিতীয়টির (কিনা আনন্দের) প্রতিদ্বন্দ্বী হ'চ্চে রজোগুণ বা দুঃখ এবং অশান্তি। সত্ত্বগুণের সঙ্গে রজস্তমোগুণের এই যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এ তো আছেই, তা ছাড়া রজস্তমোগুণের আপনা-আপনির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বড় যে কম তাহা নহে। রজো-গুণের ক্ষুধাতুর ক্রোধোন্মত্ত কুকুর-দুটার সঙ্গে, অর্থাৎ দুঃখ এবং অশান্তির সঙ্গে, তমোগুণের ভোগতৃপ্ত সুখোপবিষ্ট বিড়াল-দুটার অর্থাৎ অসাড়তা-এবং-জড়তার যে, কিরূপ আদা-কাঁচকলা সম্বন্ধ, তাহা কাহারো অবিদিত নাই। অতএব এটা স্থির যে, ব্যষ্টি-সত্তার অধি-

কার-ক্ষেত্রে ত্রিগুণের তিনটিই অপর-দুইটির প্রতিদ্বন্দী, অথবা যাহা একই কথা—তিনটিই তিনটির প্রতিদ্বন্দী।

অতঃপর দ্রষ্টব্য এই যে, তিন গুণের কোনো-না-কোনোটির সবিশেষ প্রাদুর্ভাব, কোনো-না-কোনোটির প্রসুপ্ত ভাব, কোনো-না-কোনোটির অর্দ্ধস্ফুট মুকুলিত ভাব, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আপাদমস্তক জুড়িয়া সর্ব্বত্রই পরিকীর্ণ রহিয়াছে; সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একটিও এমন কোনো বস্তু খুঁজিয়া পাইতে-পারিবার জো নাই, যাহাতে তিন গুণ ন্যূনাধিক পরিমাণে একত্র যোটবদ্ধ হইয়া অবস্থিতি না করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ত্রিগুণের একটি-না-একটির সাময়িক প্রাদুর্ভাব এবং সেই সঙ্গে অপর দুইটি গুণের কোনোটির-বা অর্দ্ধস্ফুট মুকুলিত ভাব এবং কোনো-টির-বা প্রসুপ্ত ভাব যাহা আমরা প্রতি জনে আপনার আপনার মধ্যে কালসূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে দেখিতে পাই, তাহাই আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এ-মুড়া হইতে ও-মুড়া পর্য্যন্ত আকাশক্ষেত্রে পরিবেশিত রহিয়াছে দেখিতে পাই। প্রাতঃকালে সুখশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবার সময়ে একদিকে যেমন আমরা দেখিতে পাই যে, ইতিপূর্ব্বে তমোগুণের প্রাদুর্ভাববশত আমাদের ভিতরে সত্ত্বগুণের প্রকাশ এবং আনন্দ, আর, সেই সঙ্গে রজোগুণের দুঃখ এবং প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্য স্ফূর্ত্তি পাইতে পথ পায় নাই, আর এক দিকে তেমনি দেখিতে পাই যে, ধাতু প্রস্তর উদ্ভিদাদি জড়বস্তুর মধ্যে তমোগুণের প্রাদুর্ভাববশতঃ সত্ত্বগুণের প্রকাশ এবং আনন্দ, আর সেই সঙ্গে রজোগুণের দুঃখ এবং প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্য স্ফূর্ত্তি পাইতে পথ পায় না। ইহা দৃষ্টে কেহ যদি মনে করেন যে, প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় আমাদের ভিতরে প্রকাশ এবং আনন্দ আর সেই সঙ্গে ন্যূনাধিক পরিমাণে দুঃখ এবং প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্য মূলেই বিদ্যমান ছিল না—প্রসুপ্তভাবেও বিদ্যমান ছিল না, অথবা যদি মনে করেন যে,

ধাতু প্রস্তর উদ্ভিদাদি জড়বস্তুতে প্রকাশ এবং আনন্দ তথৈব দুঃখ এবং প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্য মূলেই বিদ্যমান নাই—বীজভাবেও বিদ্যমান নাই, তবে সেটা তাঁহার বড়ই ভুল। এ তো সোজা কথা যে, আমাদের প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় যদি আমাদের ভিতরে প্রকাশ এবং আনন্দ আর সেই সঙ্গে ন্যূনাধিক পরিমাণে দুঃখ এবং প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্য প্রচ্ছন্ন ভাবে অর্থাৎ ধামাচাপা ভাবে বিদ্যমান না থাকিবে, তবে আমাদের জাগরণ মুহূর্ত্তে ঐ সত্ত্বরজো গুণের ব্যাপারগুলি আমাদের মধ্যে আসিয়া জুটিবে কোথা হইতে? তেমনি আবার জড় পরমাণু-নিচয়ের মধ্যে যদি ঐ সত্ত্বরজো গুণের ব্যাপারগুলি ধামাচাপা না থাকিবে, তবে এককালে তো আমরা মাতৃগর্ভের জরায়ুশয্যায় প্রকৃতপক্ষেই জড়পিণ্ড ছিলাম—মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র ঐ চেতন-ব্যাপারগুলির অস্ফুট আভাস আমাদের এই জড়শরীরে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিল কোথা হইতে? তা ছাড়া, আর একটি কথা আছে সেটাও বিবেচ্য। সে কথা এই যে, গোড়ায় সত্তার প্রকাশ এবং তাহার সঙ্গাশ্রিত আনন্দ না থাকিলে, সেই আনন্দের বাধানুভূতি যাহার আরেক নাম দুঃখ তাহা থাকিতে পারে না; আনন্দের বাধানুভূতি না থাকিলে আনন্দের জন্য একটা আঁকুবাঁকু অর্থাৎ প্রবৃত্তিচাঞ্চল্য থাকিতে পারে না; আনন্দের জন্য একটা আঁকুবাঁকু না থাকিলে আনন্দের পথের বাধা অতিক্রমণের চেষ্টা থাকিতে পারে না; বাধা অতিক্রমণের চেষ্টা না থাকিলে, ক্রিয়া প্রবৃত্ত হইতে পারে না। জড়পরমাণুচয়ের সঙ্গে যে, আকর্ষণ-বিকর্ষণাদি ক্রিয়া নিরন্তর লাগিয়া রহিয়াছে, এটা সকলেরই জানা কথা; কাজেই, এই মাত্র যে-একটি সম্ভাবনীয়তার সোপান-পদ্ধতি দেখাইলাম তাহা হইতে আসিতেছে এই যে, সেই আকর্ষণ-বিকর্ষণাদি ক্রিয়ার মূলে প্রাণ যাহা চায় তাহার

বাধাপনয়নের চেষ্টা রহিয়াছে; সেই বাধাপনয়নের চেষ্টার মূলে প্রাণ যাহা চায় তাহার জন্য একটা আঁকুবাঁকু রহিয়াছে; আনন্দের জন্য এই যে একটা আঁকুবাঁকু তাহার মূলে আনন্দের বাধানুভূতি রহিয়াছে; আনন্দের বাধানুভূতির মূলে সত্তার রসাস্বাদন-জনিত আনন্দ রহিয়াছে এবং সেই আনন্দের মূলে সত্তার প্রকাশ রহিয়াছে। ইহাতে এইরূপ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, জীবের মধ্যেও যেমন, জড় পরমাণুর মধ্যেও তেমনি, উভয়ত্রই তিন-গুণই এক সঙ্গে বিদ্যমান রহিয়াছে; প্রকাশ এবং আনন্দও বিদ্যমান রহিয়াছে, দুঃখ এবং প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্যও বিদ্যমান রহিয়াছে, জড়তা এবং অবসাদও বিদ্যমান রহিয়াছে; প্রভেদ কেবল এই যে, জড়জগতে তমোগুণের আধিপত্য সবচেয়ে বেশী; নিম্নশ্রেণীর জীব জগতে রজোগুণের আধিপত্য সবচেয়ে বেশী; উচ্চশ্রেণীর জীবজগতে অর্থাৎ মনুষ্যসমাজে সত্ত্বগুণের আধিপত্য সবচেয়ে বেশী। এখানে প্রশ্ন-একটি উঠিতে পারে এই যে, জড়বস্তুর মধ্যেও কি সত্ত্বগুণ আছে—প্রকাশ এবং আনন্দ আছে? ইহার উত্তর এই যে, আছে—কিন্তু প্রসুপ্ত ভাবে। ফলে জড়বস্তুর ভিতরে সত্ত্বগুণের বর্ত্তমানতা যতই তর্কের বিষয় হউক না কেন—সে সম্বন্ধে এটা-অন্ততঃ স্থির যে, জড়বস্তুর সত্তা শুধুই কেবল তোমার বা আমার বা অপর কাহারো মনোগত সত্তা নহে—পরন্তু তোমার সত্তা যেমন বাস্তবিক সত্তা, জড়বস্তুর সত্তাও সেইরূপ বাস্তবিক সত্তা। আমি যদি বলি যে তোমার সত্তা তোমার নিজের মধ্যে মূলেই প্রকাশ পায় না, তথৈব জড়বস্তুর সত্তা জড়বস্তুর নিজের মধ্যে মূলেই প্রকাশ পায় না, দুইই কেবল আমার মনের মধ্যে প্রকাশ পায়; তাহা হইলে প্রকারান্তরে বলা হয় এই যে, প্রভূত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে শুদ্ধ কেবল আমার সত্তাই বাস্তবিক সত্তা, তা বই তোমার সত্তা বা আর-

কোনো-কিছুর সত্তা আমার একটা মনগড়া সামগ্রী বই আর কিছুই নহে। এই জন্য তাহা না-বলিয়া আমি বলি-শুধু এই যে, তোমার নিদ্রাবস্থাতে যেমন তমোগুণের প্রাদুর্ভাব বশতঃ তোমার সত্তার প্রকাশ এবং তাহার সঙ্গাশ্রিত আনন্দ তোমার মধ্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যায়, তেমনি তমোগুণের প্রাদুর্ভাব-বশতঃ জড়পরমাণুর সত্তার প্রকাশ এবং তাহার সঙ্গাশ্রিত প্রশান্ত আনন্দ তাহার মধ্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন রহিয়াছে—এই যা কেবল; তা বই, জড়বস্তুর মধ্যে ঐ দুইটি সত্ত্বগুণের ব্যাপার মূলেই যে, বিদ্যমান নাই, তাহা নহে।

মানবসমাজের প্রতিভাশালী আদি গুরুগণের চক্ষুই স্বতন্ত্র। তাহার মর্ম্মভেদী দৃষ্টি একপ্রকার অন্তর্দীপনী আলোকছটা—একপ্রকার X-ray। পুঁথিগত বিদ্যার ব্যবসায়ীরা যাহা চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইলেও দেখিতে পান না—সেই সকল বিশ্বব্যাপী মহাতত্ত্ব অতীব স্বল্প উপলক্ষে প্রতিভাশালী মহাত্মাগণের দিব্যচক্ষুতে প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হয়। তা'র সাক্ষী :—নিউটন একটা বৃন্তচ্যুত আপেল ফলকে ভূতলে পড়িতে দেখিয়া তাহার আলোকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় ভারাকর্ষণের কার্য্যকারিতা প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে পাইয়াছিলেন। গ্যালিলিও তাঁহার দেশের ভজন-মন্দিরের মূর্দ্ধালম্বিত দীপঝাড়ের দোলনের ভাবগতি দেখিয়া তাহার আলোকে যে-একটি বিশ্বব্যাপী তত্ত্ব প্রত্যক্ষবৎ উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহা পণ্ডিত-সমাজে অবিদিত নাই; তাহা এই যে, দোলা-মাত্রেরই পর্য্যাবর্ত্তন সামকালিক। আমাদের দেশের আদিম আচার্য্যেরা তেমনি জীব-প্রকৃতির ত্রিগুণাত্মকতা দেখিয়া তাহার আলোকে সর্ব্বময়ী মহাপ্রকৃতির ত্রিগুণাত্মকতা প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই শেষের বার্ত্তাটির আমি সন্ধান পাইলাম কিরূপে তাহা বলিতেছি—প্রণিধান

কর। সত্ত্ব-শব্দের প্রচলিত অর্থ জীব। তার সাক্ষী :—দেশীয় সাধুভাষায় গর্ভিণী নারীকে বলা হইয়া থাকে অন্তঃসত্ত্বা—অন্তরে সত্ত্ব কিনা-জীব জাগিতেছে এই অর্থে অন্তঃসত্ত্বা। তা' ছাড়া কাব্য পুরাণাদিতে সমুদ্র-বর্ণনার প্রসঙ্গস্থলে ভূয়োভূয় এইরূপ স্বভাবোক্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় যে, সমুদ্র তিমি-মকর প্রভৃতি মহাসত্ত্বগণের বাসস্থান। অতএব প্রচলিত সংস্কৃত ভাষায় সত্ত্ব শব্দের অর্থ যে, জীব, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। এখন কথা হচ্চে এই যে, মনুষ্যই জীবের মধ্যে সেরা-জীব বা আদর্শ-জীব, আর, মনুষ্যের একটি প্রধান জাতি-পরিচায়ক-লক্ষণ হ'চ্চে বুদ্ধিমত্তা। এইজন্য দার্শনিক ভাষায় জীবের পরিবর্ত্তে মনুষ্যজাতি-সুলভ স্থির-বুদ্ধিই বিশেষার্থে সত্ত্ব-নামে সংজ্ঞিত হয়। পাতঞ্জল দর্শনের তৃতীয় পাদের সর্ব্বশেষের সূত্রটির প্রতি যদি দৃষ্টিনিক্ষেপ কর তবে দেখিবে যে, সে সূত্রটি এই :—"সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যং।" ঐ দর্শনের ভানুমতী টীকায় "সত্ত্বশুদ্ধি" এই বচনটির অর্থ ভাঙিয়া বলা হইয়াছে এইরূপ :—"সত্ত্বস্য—বুদ্ধিদ্রব্যস্য শুদ্ধিঃ" সত্ত্বের শুদ্ধি কি না বুদ্ধি-পদার্থের শুদ্ধি। এখন দেখিতে হইবে এই যে জীবের নিশ্চয়াত্মিকা স্থির-বুদ্ধিই বিশুদ্ধ প্রকাশ এবং বিমল আনন্দের নিলয়; জীবের অস্থির মনই দুঃখ এবং প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্যের নিলয়; জীবের স্থূল শরীরই জড়তা এবং অবসাদের নিলয়। এই জন্য বলিতেছি যে, খুব সম্ভব আমাদের দেশের পূর্ব্বতন আচার্য্যেরা জীবের মধ্যে ঐ তিনটি আদর্শভূত সত্ত্বরজস্তমোগুণের ব্যাপার পরম্পরাশ্রিত ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে দেখিয়া তাহারই আলোকে এই মহাতত্ত্বটি প্রত্যক্ষবৎ উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক বস্তুই সত্ত্বরজস্তমোগুণের লীলাক্ষেত্র, এমন কি সত্ত্বরজস্তমোগুণই নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সারসর্ব্বস্ব। তাঁহারা আরো বলেন এই যে

জগতের মধ্যস্থিত প্রত্যেক বস্তুতেই সত্ত্বরজস্তমঃ এই তিন গুণ একত্র যোটবদ্ধ রহিয়াছে; প্রভেদ কেবল এই যে, তিন গুণের যে-গুণটি এক বস্তুতে প্রকট ভাবে ফুটিয়া বাহির হয়, সেই গুণটি আর এক বস্তুতে অর্দ্ধস্ফুট মুকুলিত ভাবে বর্ত্তমান থাকে, এবং তৃতীয় আর-এক বস্তুতে তাহা প্রসুপ্ত ভাবে বা বীজভাবে বর্ত্তমান থাকে। এইরূপে বিশেষ বিশেষ বস্তুতে বিশেষ বিশেষ গুণ বিশেষ বিশেষ মাত্রায় অভিব্যক্ত হয়। এ কথার প্রমাণ আমরা আমাদের আপনাদের মধ্যে অনুসন্ধান করিলেই সহজে পাইতে পারি। আমাদের নিদ্রাবস্থায় যখন আমাদের মনোমধ্যে তমোগুণের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন আমরা জড়পদার্থের—বিশেষতঃ উদ্ভিদ্ পদার্থের—দলভুক্ত হই। তমোগুণের এইরূপ প্রাদুর্ভাবকালেও আমাদের মধ্যে রজোগুণ এবং সত্ত্বগুণের কার্য্য ন্যূনাধিক পরিমাণে তলে তলে চলিতে থাকে, তা বই ও-দুয়ের কোনোটির কার্য্য একেবারেই বন্ধ থাকে না। তা'র সাক্ষীঃ—নিদ্রান্ধকারের মেঘের আড়ালে ঘড়ি ঘড়ি স্বপ্নের ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা রকমের বিদ্যুৎস্ফুরণ হইতে থাকে ইহা সকলেরই জানা কথা; এরূপ প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্য যে রজোগুণের ব্যাপার তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে। তা ছাড়া, নিদ্রান্ধকারের আরো গভীর অন্তস্তরে সত্তার প্রকাশ এবং সেই প্রকাশের সঙ্গাশ্রিত সুনির্ম্মল আনন্দ এই দুই সত্ত্ব-গুণের ব্যাপারও যে তলে তলে জাগিতে থাকে, তাহার প্রমাণ এই যে, কেহ যদি কাহারো সুনিদ্রা বলপূর্ব্বক ভাঙ্গাইয়া দ্যায়, তাহা হইলে নিদ্রোত্থিত ব্যক্তি যেন স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে নাবিল এই ভাবে চমকিয়া উঠিয়া পূর্ব্বানুভূত সুখের বড্ড একটা অভাব অনুভব করে। আমাদের এই স্থূল-শরীরাবচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের নিদ্রা স্বপ্ন এবং জাগরণ দৈনন্দিন ব্যাপার, পরন্তু বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের ঐ তিনটি অবস্থা-পরিণাম

যুগযুগান্তরের ব্যাপার। তাহা হইবারই কথা—কেন না ব্রহ্মার এক দিন আমাদের এক যুগ। তমোগুণের প্রাদুর্ভাবকালে অর্থাৎ নিদ্রাকালে আমরা যেমন কার্য্যত অচেতন হই অর্থাৎ ইংরাজি ভাষায় যাহাকে বলে Practically unconscious সেই ভাবে অচেতন হই; বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের জড়পরমাণু-সকল সেই ভাবে অচেতন; তা বই, এ ভাবে অচেতন নহে যে, তাহাদের মধ্যে চেতন মূলেই বর্ত্তমান নাই—বীজ-ভাবেও বর্ত্তমান নাই। আবার রজোগুণের প্রাদুর্ভাবকালে যখন আমাদের মনোমধ্যে স্বপ্নের আধিপত্য হয়—তা' সে নিদ্রাবস্থার খাঁটি স্বপ্নই হো'ক্, আর, জাগরিতাবস্থার জাগ্রৎস্বপ্নই হো'ক্ তাহাতে বিশেষ কিছু আইসে যায় না, আর সেই স্বপ্নের ঝাপ্‌সা আলোকে আমরা যেমন প্রবৃত্তির ঝোঁকে ইতস্তত নীয়মান হইয়া কার্য্যত মূঢ়জীব বনিয়া যাই—পশ্বাদি জন্তুরা সেই ভাবে মূঢ়জীব। অধুনাতন কালের নব্যতম প্রকৃতিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা পিপীলিকা মধুমক্ষিকা প্রভৃতি মেরুদণ্ডবিহীন Avertibrated জীবদিগের স্বভাব চরিত্র এবং কার্য্যানুষ্ঠান-পদ্ধতি বিধিমতে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, নিশাগ্রস্ত ব্যক্তিরা (অর্থাৎ ইংরাজি ভাষায় যাহাকে বলে Somnambulist সেই শ্রেণীর ব্যক্তিরা) যেমন ঘুমের ঘোরে কেহ বা কলেরিজের কুব্‌লাখানের ন্যায় সুন্দর সুন্দর কবিতা লেখে, কেহ বা গণিতের দুরূহ সমস্যা অবলীলাক্রমে পূরণ করে, কেহ বা সংকটময় দুর্গম পথ অবলীলাক্রমে অতিবাহন করে,মৌমাছি পিপীলিকা প্রভৃতি অমেরুক (avertibrated) শ্রেণীর জীবেরা সেইগোচের এক প্রকার অস্ফুট চেতনের অন্ধকারাচ্ছন্ন আলোকে প্রবৃত্তির ঝোঁকে নীয়মান হইয়া আপনাদের গার্হস্থ্য সামাজিক এবং আর-আর শ্রেণীর নিত্যনৈমিত্তিক অনুষ্ঠেয় কার্য্য সকল যথাবৎ অভ্রান্ত অপ্রমত্ত এবং অবিচলিত ভাবে

নিষ্পাদন করে। ধাতু প্রস্তর উদ্ভিদাদি পদার্থ সকল যেন অচেতন বস্তু—পশ্বাদি জন্তুরা যেন মূঢ় জীব—আমরা কি? "আমরা কি?" এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, আমরা নহি কি? অর্থাৎ আমরা সবই। আমাদের নিদ্রাবস্থায় আমরা উদ্ভিদ্‌পদার্থ, স্বপ্নাবস্থায় প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসমান মূঢ়জীব, জাগরিতাবস্থায় জ্ঞানবান্ মনুষ্য। তবেই হইতেছে যে, আমরা প্রতিজনে এক-একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড আবার বৃহদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের ছাঁচে গঠিত। বৃহদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের সবই ব্রহ্মতালের বা সুদীর্ঘচ্ছন্দের গাথা; ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডের সবই লঘুত্রিপদীচ্ছন্দের পদ্য। আমাদের নিদ্রার কাল এক রাত্রির অধিক নহে, পরন্তু পৃথিবীতে যতকাল পর্য্যন্ত জীবের উন্মেষ হয় নাই ততকাল পর্য্যন্ত পৃথিবী প্রগাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন ছিল; তাহার পরে পৃথিবীর নিশাগ্রস্ত Somnambulic অবস্থায় কীট পতঙ্গাদির নড়ন-চড়ন এবং চলাফেরা আরম্ভ হইল, তাহার পরে পৃথিবীর স্বপ্নাবস্থায় মেরুদণ্ডবিশিষ্ট জীবের উন্মেষ হইতে আরম্ভ হইল, তাহার পরে পৃথিবীর জাগরিতাবস্থায় জ্ঞানবান্ মনুষ্যের আবির্ভাব হইল। আরো এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনুষ্যের জাগরিতা-বস্থায় যেমন তাহার অন্তঃকরণের উপর-স্তরে স্থির বুদ্ধি এবং তাহার সঙ্গাশ্রিত প্রকাশ এবং আনন্দ বিরাজ করে, তেমনি সেই সঙ্গে তাহার অন্তঃকরণের নীচের স্তরে মনের অর্দ্ধস্ফুট চেতনের জাগ্রৎস্বপ্ন এবং তাহার সঙ্গাশ্রিত দুঃখ ও প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্য ন্যূনাধিক পরিমাণে কার্য্য করিতে থাকে; আর, সময়ে সময়ে যখন সেই রজোগুণের ব্যাপারটা প্রবল হইয়া ওঠে তখন তাহা দর্শকের চক্ষে স্পষ্ট ধরা পড়ে। ইহার যদি একটা সুস্পষ্ট নিদর্শন বা নমুনা দেখিতে চাও তবে এল্‌বা-উপদ্বীপে অবস্থিতি-কালে প্রথম নেপোলিয়নের মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। তাঁহার কোনো প্রকার শারীরিক

কষ্ট বা আর্থিক কষ্ট ছিল না অথচ রজোগুণের প্রাদুর্ভাববশত তাঁহার মন নানা প্রকার জাগ্রৎস্বপ্নে, প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্যে এবং দুঃখ যন্ত্রণায়, পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের ন্যায় অষ্টপ্রহর ছট্‌ফট্ করিত, অথচ-আবার তাঁহার অন্তঃকরণের উপর-স্তরে স্থিরবুদ্ধি এবং তাহার সঙ্গাশ্রিত প্রকাশ এবং আনন্দের ন্যূনতা ছিল না। তেমনি আবার মনের অর্দ্ধস্ফুট চেতনের নীচের স্তরে স্থূল শরীরাশ্রিত প্রসুপ্ত চেতনের বা প্রাণের ব্যাপার—অর্থাৎ যেমন অন্ন হইতে রক্তের উৎপাদন—রক্ত হইতে অস্থি-মজ্জা মাংসপেশী প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর চালান্—এইসকল প্রাণের ব্যাপার তমোগুণের অন্ধকারাচ্ছন্ন নাড়ীপথের মধ্য দিয়া চলাফেরা করিতে থাকে; এরূপ নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে চলাফেরা করিতে থাকে যে, তাহার ভিতরে জ্ঞানালোকের প্রবেশের পথ একেবারেই অবরুদ্ধ। এতগুলা কথা যাহা আমি সবিস্তরে ভাঙিয়া বলিলাম তাহা সংক্ষেপে সাঁটেসোঁটে বলা যাইতে পারে এইরূপ ঃ—মনুষ্যের জাগরিতাবস্থায় তাহার অন্তঃকরণের উপর-স্তরে ভিতরের মনুষ্য মাথা উঁচা করিয়া দণ্ডায়মান হয়, তাহার এক ধাপ নীচের স্তরে ভিতরের সিংহব্যাঘ্র ছাগ-মেষাদি বিচরণ করে, এবং তাহার আরো নীচের স্তরে ভিতরের-ধাতু-প্রস্তর-উদ্ভিদাদি জড়বস্তুসকল অন্ধকারে আড্ডা জমায়। মনুষ্যের জাগরিতাবস্থায় এ যেমন দেখা গেল, পৃথিবীর জাগরিতাবস্থাতেও তেমনি উপরের ধাপে সত্ত্বগুণপ্রধান মনুষ্যমণ্ডলীর বুদ্ধির মূলীভূত জাগ্রত চেতন মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়; সত্ত্বগুণ প্রধান মনুষ্য-মণ্ডলীর বুদ্ধির মূলীভূত জাগ্রত চেতনের নীচের ধাপে রজোগুণপ্রধান পশ্বাদির জন্তুদিগের স্বপ্নবৎ অর্দ্ধস্ফুট চেতন স্বকার্য্যে ব্যাপৃত হয়; এবং তাহারও নীচের ধাপে তমোগুণপ্রধান উদ্ভিদ্ এবং ধাতু প্রস্তরাদি জড়বস্তু-সকলের বীজভাবাপন্ন অস্ফুট চেতন

নিরন্তর স্পন্দিত হইতে থাকে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ত্রিগুণের লীলাক্ষেত্র;—ত্রিগুণই নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সারসর্ব্বস্ব।

ত্রিগুণতত্ত্বের সম্বন্ধে এতক্ষণ ধরিয়া এ যাহা আমি বলিলাম এ সকল কথা ব্যষ্টিসত্তার সম্বন্ধেই খাটে—সমষ্টিসত্তার সম্বন্ধে খাটে না। সমষ্টি-সত্তা এবং ব্যষ্টি-সত্তাকে পরস্পরের সহিত তুলনা করিলে প্রথমেই দুয়ের মধ্যেকার একটি মর্ম্মান্তিক প্রভেদ আমাদের চক্ষে পড়ে এই যে, তুমি এবং আমি দুই, এই জন্য তোমাতে আমার সত্তার অভাব আছে, আমাতে তোমার সত্তার অভাব আছে, আর যদি তৃতীয় কোনো ব্যক্তির নাম কর তবে তাহাতে তোমার এবং আমার উভয়েরই সত্তার অভাব আছে। তবেই হইতেছে যে, ব্যষ্টিসত্তা মাত্রেতেই সত্তার সঙ্গে সত্তার বাধা ন্যূনাধিক পরিমাণে জড়িত রহিয়াছে; আর সেই সূত্রে সত্ত্বগুণের সঙ্গে রজোগুণ এবং তমোগুণ ন্যূনাধিক পরিমাণে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে;—সাত্ত্বিক আনন্দ রাজসিক দুঃখ এবং প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্যে ন্যূনাধিক পরিমাণে প্রতিহত হইতেছে; সাত্ত্বিক প্রকাশ তামসিক জড়তা এবং অবসাদে ন্যূনাধিক পরিমাণে ঢাকা পড়িয়া যাইতেছে। কাজেই ব্যষ্টিসত্তা ত্রিগুণাত্মক। পক্ষান্তরে এইরূপ দেখা যায় যে, তোমার বাহিরে যেমন আমি রহিয়াছি, এবং আমার বাহিরে তুমি রহিয়াছ, সমষ্টিসত্তার বাহিরে সেরূপ দ্বিতীয় কোনো কিছুই নাই; কাজেই দাঁড়াইতেছে যে সমষ্টি-সত্তার গাত্রে লেশমাত্রও বাধার আঁচ লাগিতে পারে না; আর তাহা হইতেই আসিতেছে যে, সমষ্টিসত্তার সহিত সাত্ত্বিকপ্রকাশ অর্থাৎ বিশুদ্ধ চেতন জ্যোতি এবং, সাত্ত্বিক আনন্দ, পরিপূর্ণ মাত্রায় ওতপ্রোত। এই জন্য আমাদের দেশের সকল শাস্ত্রেরই সর্ব্ববাদি-

সম্মত সিদ্ধান্ত এই যে পরমাত্মা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। আজ এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট। আমাদের দেশীয় শাস্ত্রের একটি নিগূঢ় রহস্য আজ যাহা আমি সবিস্তরে ব্যাখ্যা করিলাম তাহার সহিত ডারুইনের মতের কিরূপ ঐক্যানৈক্য—আগামীবারে তাহা পর্য্যালোচনা করা যাইবে; এবং তাহার পরে গীতাশাস্ত্রোক্ত নিস্ত্রৈগুণ্য শব্দের প্রকৃত অর্থ এবং তাৎপর্য্য কি তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে।

ষষ্ঠ অধিবেশন।

ব্যাখ্যান।

এখন ডারুইনের সিদ্ধান্তের সহিত আমাদের কথার কিরূপ ঐক্যানৈক্য তাহার পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যা'ক্।

ডারুইনের মোট কথাটা'র ঘাটিস্থান তিনটি ;—তাহার প্রয়াণ-স্থান হ'চ্চে Natural selection অর্থাৎ প্রাকৃতিক পাত্র নির্ব্বাচন ; গম্যস্থান Survival of the fittest যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন ; এবং মাঝ-পথ, Struggle for existence, সত্তা-রক্ষার জন্য ধস্তাধস্তি। প্রকৃতির পাত্র-নির্ব্বাচন-প্রণালী একপ্রকার জল-শোধন প্রণালী। বর্ষাকালের পঙ্কিল গঙ্গাজল ভাল করিয়া ছাঁকিতে হইলে তাহার প্রকৃষ্ট প্রণালী কিরূপ তাহা বোধ করি শ্রোতৃবর্গের মধ্যে অনেকেই জানেন—তাহা এইরূপ :—একটি নিশ্ছিদ্র খালি কলসের উপরে দুইটি তলায়-ঝাঁঝ্‌রি-কাটা কলস উপর্য্যুপরি স্থাপন করা হো'ক ; উপরের কলসটার ছআনা অংশ কয়লার কুচিতে ভরাট্ করা হো'ক্ এবং মাঝের কলসটার ঐ পরিমাণ অংশ বালির গাদায় ভরাট্ করা হো'ক্ ; তাহার পরে উপরের কলসটা শোধিতব্য জলে গলাগলি পূর্ণ করা হো'ক্। তাহা হইলে জলের বারোআনা দূষিত অংশ কয়লার কুচিতে খাইয়া গিয়া যাহা উদ্বৃত্ত হইবে তাহা মাঝের কলসে স্থিতি-লাভ করিবে ; তাহার পরে জলের অবশিষ্ট দূষিতাংশ বালির গাদায় খাইয়া গিয়া যাহা উদ্বৃত্ত হইবে, সেই ঝর্ঝরে পরিষ্কার জল নীচের খালি কলসে স্থিতি লাভ করিবে। এ যেমন দেখা গেল, তেমনি বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর জীবরাজ্যে এইরূপ দেখা যায় যে, সেই সেই

শ্রেণীর জীবের মধ্যে যাহারা অযোগ্য তাহারা চারিদিকের পাঞ্চভৌতিক এবং সজীব শত্রুগণের সহিত সত্তারক্ষার জন্য ধস্তাধস্তি-গতিকে মারা পড়িয়া যায়; এইরূপে অযোগ্য জীবেরা মারা পড়িয়া গিয়া যাহারা উদ্বৃত্ত হয়, তাহারাই প্রথম দফার যোগ্যতম জীব। এই যে প্রথম দফার যোগ্যতম জীব ইহাদের নির্ব্বাচন প্রণালীর নাম দেওয়া যাইতে পারে "বিজাতীয় জীবন-সংগ্রাম"; কেননা প্রথম দফার যোগ্যতম জীবেরা বিজাতীয় জীব-শত্রুর অথবা পাঞ্চভৌতিক শত্রুর হস্ত হইতে অথবা দুয়েরই হস্ত হইতে আপনাদিগকে বাঁচাইয়া আপনাদের যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করে; এইরূপে, বিজাতীয় জীবন-সংগ্রামের পথ দিয়া যোগ্যতম জীবের নির্ব্বাচন-কার্য্য এক দফা হইয়া-চুকিলে দ্বিতীয় দফার যোগ্যতম জীবের নির্ব্বাচন-কার্য্য আরম্ভ হয়। এই দ্বিতীয় দফার যোগ্যতম জীবের নির্ব্বাচন-পণালীর নাম দেওয়া যাইতে পারে সজাতীয় (অর্থাৎ সমজাতীয়) জীবন-সংগ্রাম। যূথস্থ বানরী-বৃন্দের স্বামিত্বের অধিকার-প্রাপ্তির জন্য বীর-বানরদিগের মধ্যে সময়ে সময়ে যে কিরূপ সাঙ্ঘাতিক যুদ্ধ বাধে তাহা কাহারো অবিদিত নাই। এইরূপ স্ত্রীপরিগ্রহের উপলক্ষে সজাতীয় (অর্থাৎ সমজাতীয়) জীবগণের মধ্যে যেরূপ সঙ্গ্রাম বাধে তাহারই আমি নাম দিতেছি "সজাতীয় জীবন-সঙ্গ্রাম।" পূর্ব্বোক্ত বিজাতীয় জীবন-সঙ্গ্রামের উদ্দেশ্য হ'চ্চে জীবের ব্যক্তিগত সত্তা রক্ষা; সজাতীয় জীবন সঙ্গ্রামের উদ্দেশ্য হ'চ্চে জীবের জাতিগত সত্তা রক্ষা। জাতিগত সত্তা-রক্ষা আর কিছু না—পুরুষানুক্রমে যাহাতে যোগ্যতম সন্তানসন্ততির প্রবাহ চলিতে পারে তাহারই গোড়াপত্তন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রথম দফার ঐ যে বিজাতীয় জীবন-সঙ্গ্রাম উহার প্রধান নেতা বা প্রবর্ত্তক কে? আর দ্বিতীয়

দফার এই যে সজাতীয় জীবন-সঙ্গ্রাম ইহারই বা প্রধান নেতা কে? ইহার উত্তরে আমি বলি এই যে, বিজাতীয় সঙ্গ্রামের প্রধান নেতা যে, ক্রোধ এবং, সজাতীয় সঙ্গ্রামের প্রধান নেতা যে, কন্দর্পদেব, ইহা বলা বাহুল্য; কেননা সকলেরই তাহা জানা কথা। এখন বক্তব্য এই যে, মনুষ্যের নীচের ধাপের জীব-রাজ্যে জীবন-সঙ্গ্রাম চালাইবার ঐ যে দুই প্রধান অধিনায়ক—কাম এবং ক্রোধ—ও দুই ধনুর্দ্ধর রজোগুণের ডা'ন হাত বা হাত। এইজন্য ডারুইনের ঐ মোট মন্তব্য কথাটি আমাদের দেশের শাস্ত্রীয় ভাষায় অনুবাদ করিলে ফলে এইরূপ দাঁড়ায় যে, রজোগুণই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সৃষ্টির প্রবর্ত্তক। তা' ছাড়া—পুরাণাদির অনেকানেক স্থানে এইরূপ একটি কথা ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, সংহারকর্ত্তা মহাদেব তমোগুণ মূর্ত্তিমান্, পালনকর্ত্তা বিষ্ণু সত্ত্বগুণ মূর্ত্তিমান্, এবং সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা রজোগুণ মূর্ত্তিমান্। ডারুইনের সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমাদের কোন্‌খানটিতে ঐক্য তাহা সংক্ষেপে দেখাইলাম; কোন্‌খানটিতে অনৈক্য তাহাও সংক্ষেপে দেখাইতেছি প্রণিধান কর।

ডারুইনের এই যে একটি কথা—Struggle for existence, সত্তারক্ষার জন্য ধস্তাধস্তি, এ কথার ভিতরে আর একটি কথা প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। সে কথাটি কিন্তু প্রকৃতির পর্দ্দার আড়ালের কথা, আর সেইজন্য ডারুইন্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য প্রকৃতিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা যে পথের পন্থী, সে পথে ঐ অন্তঃপুরবাসিনী মর্ম্মকথাটি মুখের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া জনতা'র মধ্যে দণ্ডায়মান হইতে নিতান্তই পরাঙ্মুখ। এ বিষয়ে বেশী বাক্যব্যয় করা অনাবশ্যক। যেহেতু হাটের মাঝে ব্রহ্মজ্ঞানের যে কিরূপ দশা হয়, আমাদের দেশের

সাধারণ-শ্রেণীর লোকেরা—বিশেষত প্রাচীন সম্প্রদায়ের লোকেরা তাহা খুবই বোঝেন।

ডারুইনের কোনো শিষ্যানুশিষ্যকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, "তুমি বলিতেছ যে, জীবজগতে সত্তারক্ষার জন্য ধস্তাধস্তি হয় অনবরত,—কেন এরূপ হয়?—উহার ভিতরের কথা কি?" তবে সে প্রশ্নের একটা সদুত্তর প্রদান করা তাঁহার কর্ম্ম নহে—যেহেতু ডারুইন সে বিষয়ে মূলেই কোনো উচ্চবাচ্য করেন নাই। আমরা কিন্তু ত্রিগুণ-তত্ত্বের চাবি দিয়া প্রকৃতির নিভৃত নিকেতনের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া ঐ নিগূঢ় রহস্যটির কতকটা সন্ধান পাইয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে, সমুদ্রের তরঙ্গ-চাপল্যের নীচের স্তরে যেমন গভীর জলের অটল শান্তি চাপা দেওয়া রহিয়াছে, তেমনি সত্তারক্ষার জন্য ধস্তাধস্তির মূলে সত্তার প্রকাশ এবং সত্তার রসাস্বাদনজনিত আনন্দ চাপা দেওয়া রহিয়াছে; তা'র সাক্ষী—"আমি ভূতকাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বর্ত্তিয়া রহিয়াছি" এ বৃত্তান্তট আমার নিকটে অপ্রকাশ নাই; আর, আমার সত্তার এই যে প্রকাশ ইহা আমার আনন্দের বিষয়; তেমনি আবার, ভূতকাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বর্ত্তিয়াথাকা ব্যাপারটি বর্ত্তমান কালে আমার আনন্দের বিষয় বলিয়াই আমি ভবিষ্যৎ কালে বর্ত্তিয়া থাকিতে ইচ্ছা করি। এইরূপ সত্তার প্রকাশ এবং সত্তার রসাস্বাদন-জনিত আনন্দ আমার শুধু এক্লার নহে পরন্তু জীবমাত্রেরই পৈতৃক সম্পত্তি। এটাও আমরা দেখিয়াছি যে, জীবের মধ্যে যেমন সত্তার প্রকাশ এবং তাহার সঙ্গে আনন্দ লাগিয়া রহিয়াছে, তেমনি সেই প্রকাশ এবং আনন্দের বাধাও বিদ্যমান রহিয়াছে। এখন দেখিতে হইবে এই যে, আনন্দের বাধানুভূতি যদিচ আনন্দানুভবের বিপরীত পক্ষ,

তথাপি, আনন্দের বাধানুভূতি অনুভবকর্ত্তার অন্তর্নিগূঢ় বীজভাবাপন্ন আনন্দের পরিচয় প্রদান করিতে ত্রুটি করে না। একজন ক্ষুধার্ত্ত পথিক যতক্ষণ পর্য্যন্ত পান্থশালায় প্রবেশ করিয়া আপনার ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ করিতে না পারে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে প্রকৃতিস্থ হয় না অথবা যাহা একই কথা—ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার শরীরে স্বাস্থ্য থাকে না। তবেই হইতেছে যে, ক্ষুধার জ্বালা শারীরিক স্বাস্থ্যের বিপরীত পক্ষ, এমন কি দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তি ক্ষুধার জ্বালাতেই মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হয়। ক্ষুধার জ্বালা যদিচ এইরূপ স্বাস্থ্যের বিপরীত পক্ষ, তথাপি এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, ক্ষুধার তীব্রতা শারীরিক স্বাস্থ্যের একটি প্রধান পরিচয়-লক্ষণ; পক্ষান্তরে ক্ষুধামান্দ্য মস্ত একটা রোগের লক্ষণ। এই সঙ্গে এটাও দ্রষ্টব্য যে, যে ব্যক্তি ক্ষুধার জ্বালায় অধীর হয়, আপনার শারীরিক স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্যের প্রতি সে ব্যক্তির মূলেই লক্ষ্য থাকে না—পরন্তু কতক্ষণে অন্নব্যঞ্জনাদি তাহার তৃষিত নয়নের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইবে এই ভাবনাটিই তাহার মনোরাজ্যে একাধিপত্য করে। এ যেমন দেখা গেল, তেমনি জীবেরা যখন আপনাদের অন্তর্নিগূঢ় আনন্দের বাধাপনয়ন-চেষ্টায় প্রাণপণে ব্যাপৃত হয়, তখন সেই বাধার অনুভূতিই তাহাদের সংগ্রামকার্য্যের একমাত্র নেতা হয়, তা বই, সেই বাধানুভূতির মূলে যে সত্তাঘটিত আনন্দের আস্বাদ অবিচ্ছেদে লাগিয়া রহিয়াছে তাহার প্রতি তাহাদের মূলেই লক্ষ্য থাকে না। অতঃপর আমি বলিতে চাই এই যে, এক ব্যক্তি সহস্র রোগী হইলেও যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার নাড়ীতে প্রাণ ধুক্ ধুক্ করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার রোগের অন্তস্তলে স্বাস্থ্য কোনো-না-কোনো পরিমাণে বিদ্যমান থাকে তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কেননা স্বাস্থ্যের ঐকান্তিক অভাবের নামই মৃত্যু। কিন্তু এটা

ভুলিলে চলিবে না যে, রোগ-যন্ত্রণার অন্তর্নিগূঢ় স্বাস্থ্যকে তাহার নিভৃত গুহার মধ্য হইতে টানিয়া বাহির করিয়া কাজে খাটানো রোগীর তো অধিকারায়ত্ত নহেই, তা'ছাড়া, তাহা চিকিৎসকেরও অধিকারায়ত্ত নহে। এই জন্য সুচিকিৎসকেরা আপনাদের ব্যবসায়ের লাঘব স্বীকার করিয়া একথা বলিতে একটুকুও সঙ্কুচিত হ'ন না যে, ধরিতে গেলে প্রকৃতিই রোগের প্রতিবিধানকর্ত্রী, তাঁহারা কেবল উপলক্ষ মাত্র। তা বলিয়া চিকিৎসকের সাধু প্রকৃতির পরিচায়ক ঐ সত্য-বচনটিতে মুগ্ধ হইয়া রোগী ব্যক্তি যেন এরূপ মনে না করেন যে, ঔষধ-পথ্যের সেবনে তবে আর প্রয়োজন নাই—রোগ আপনা-আপনিই ভাল হইয়া যাইবে। চিকিৎসকের ঐ সার-কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, সুচিকিৎসার অনুষ্ঠান দ্বারা স্বাস্থ্যের অভিব্যক্তিপথের বাধা অপনয়ন করা খুবই আবশ্যক—বাধা অপনীত হইলে স্বাস্থ্য প্রকৃতির প্রেরণায় আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হইবে—তা বই তাহাকে সাধ্য-সাধনা করিয়া লইয়া আসিতে হইবে না। এই উপমা-টির প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিয়া একটু মনোযোগের সহিত প্রণিধান করিয়া দেখিলেই আমরা বেস্ বুঝিতে পারি যে, সত্তা-রক্ষার জন্য মহা একটা ধস্তাধস্তি ব্যাপার যাহা ডারুইন্ জীবজগতের পুরাতন কাহিনীর অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রদেশ হইতে আলোকে টানিয়া বাহির করিয়াছেন, তাহা কথাটা আর কিছু না—কেবল সত্তার অন্তর্নিগূঢ় প্রকাশ এবং আনন্দের বাধা অপসারণের চেষ্টা মাত্র। যে জীব আপনার সত্তার অন্তর্নিগূঢ় প্রকাশ এবং আনন্দের বাধা-অপসারণে যে পরিমাণে কৃতকার্য্য হয়, সেই জীবের অন্তঃকরণ-ক্ষেত্রে সেই পরিমাণে প্রকাশ এবং আনন্দ আপনা হইতে উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে—তাহার জন্য দ্বিতীয় কোনোপ্রকার ধস্তাধস্তির প্রয়োজন হয় না। এ যাহা বলিলাম এ তো

খুব সোজা কথা ; কিন্তু তাহা সোজা কথা হইলেও তাহার আশুফল-দর্শিতা প্যাঁকচক্রময় বাঁকা কথা অপেক্ষা বেশী বই কম নহে। পৃথিবীপথের যাত্রীদিগকে নদ-নদী-পর্ব্বত প্রভৃতি নানাপ্রকার পথের বাধার পাশ কাটাইয়া অনেকবার অনেক দিকে ঘোরফের করিয়া প্যাঁচাও পথ দিয়া গম্যস্থানে উপনীত হইতে হয়—এ যেমন একদিকে, আর একদিকে তেমনি আকাশপথের যাত্রীরা নবাবিষ্কৃত বিমানে ভর করিয়া সোজা পথ দিয়া অবলীলাক্রমে গম্যস্থানে উপনীত হ'ন। আমরা তেমনি আমাদের ঐ সোজা কথাটিতে ভর করিয়া সোজা পথ দিয়া অতীব একটি গুরুতর সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। সে সিদ্ধান্ত এই যে, রজোগুণপ্রধান নীচের শ্রেণীর জীবেরা যথন সত্তার অন্তর্নিগূঢ় প্রকাশ এবং আনন্দের বাধা অতিক্রমণ করিতে করিতে মনুষ্যত্বের উচ্চ শিখরে আরূঢ় হয়, তথন সাত্ত্বিক প্রকাশ এবং আনন্দ যাহা সর্ব্বপ্রথমে জড়রাজ্যে বীজভাবে অন্তর্নিগূঢ় ছিল এবং তাহার পরে যাহা অর্দ্ধস্ফুট মুকুলিতভাবে জীবরাজ্যের তলে তলে জানান্ দিতেছিল, তাহা প্রকৃতির প্রেরণায় আপনা হইতেই উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে, তা বই, তাহাকে সাধ্যসাধনা করিয়া লইয়া আসিতে হয় না। এই প্রসঙ্গে আমার আর একটি কথা বলিবার আছে—সেটাও বিবেচ্য। সে কথা এই যে, ডারুইন্ কেবল জীবদিগের বহিঃক্ষেত্রের জীবন সংগ্রামের প্রতিই ষোলো আনা মাত্রা দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন ;—ভালই করিয়াছিলেন—কেননা তাঁহার লক্ষ্যসাধনে তিনি ঐরূপ একাগ্রতার সহিত উঠিয়া-পড়িয়া না লাগিলে তাঁহার হাতের কাজ তিনি অমনতর পাকাপোক্ত-রূপে সুনিষ্পন্ন করিতে পারিতেন না। কিন্তু ডারুইনের লক্ষ্য বিষয় হইতে আমাদের লক্ষ্য বিষয় যে অংশে ভিন্ন সে অংশে আমরা আরেক পথের পন্থী—এ পথ হ'চ্চে মনুষ্যের অন্তর্জ্জগতের পর্য্যালোচনা।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ডারুইন্ বহির্জগতের ক্রমবিকাশের মূলে যেরূপ রাজসিক কুরুক্ষেত্রকাণ্ড দেখিতে পাইয়াছিলেন—মনুষ্যের অন্তর্জগতে আমরা অবিকল তাহারই আর এক পৃষ্ঠা দেখিতে পাই-তেছি; প্রভেদ কেবল এই যে, ডারুইনের হস্তের সাধনীযন্ত্র ছিল প্রত্যক্ষ অনুমান এবং বাহ্য পরীক্ষা; আমাদের হস্তের সাধনীযন্ত্র স্বানুভূতি, মহচ্চরিতের আলোচনা এবং আত্মপরীক্ষা। জীবেরা যেমন তাহাদের বহিঃক্ষেত্রের বাধাবিঘ্নের সহিত সঙ্গ্রাম করিয়া উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে হইতে পরিশেষে মনুষ্য-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে; মনুষ্যের অন্তর্জগতে তেমনি রিপুগণের সহিত কঠোর সংগ্রামের পথের মধ্য দিয়াই মনুষ্যত্বের অভিব্যক্তি হয়; আর, অন্তঃকরণে বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক প্রকাশ এবং বিমল আনন্দের ফোয়ারা খুলিয়া যাওয়ার নামই মনুষ্য-ত্বের অভিব্যক্তি। মনুষ্য কিন্তু পশ্বাদি জন্তুদিগের ন্যায় শুধুই কেবল সত্ত্বগুণের বাধামাত্র অনুভব করিয়াই ক্ষান্ত থাকে না, পরন্তু সেই সঙ্গে সত্ত্বগুণের যে দুইটি প্রধান অন্তরঙ্গ প্রকাশ এবং আনন্দ তাহাও অন্তঃকরণে উপলব্ধি করে। মনুষ্য তাহার পশ্চাৎপদের ভর আপনার অন্তর্নিগূঢ় প্রকাশ এবং আনন্দের উপরে স্থাপন করে, এবং অগ্রপদের ভর সেই প্রকাশ এবং আনন্দের বাধানুভূতির উপরে স্থাপন করে—এইরূপে অগ্র-পশ্চাতের মধ্যে যোগ রক্ষা করিয়া রিপুগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। নিপুণ সেনাপতি যেমন পিছনের যে পথ দিয়া নূতন বলের সমাগম হইবে সে পথের আদ্যোপান্তে বিধিমতে পাহারা স্থাপন করিয়া তাহার আটঘাট আগ্‌লিয়া রাখেন—সাধক তেমনি যখন আত্মপ্রভাবের প্রকটন দ্বারা রিপুগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হ'ন, তখন পিছনের যে পথ দিয়া দেবপ্রসাদের সমাগম হইবে সে পথ বিধিমতে আগলিয়া রাখেন—অর্থাৎ রিপুগণের সহিত সংগ্রাম

করিতে গিয়া যাহাতে রিপুগণের কুস্বভাবের ছেঁায়াচে রোগে আক্রান্ত না হ'ন, সে বিষয়ে বিধিমতে সাবধান হ'ন। চৈতন্য মহাপ্রভু যদি জগাই-মাধাইএর উদ্দীপ্ত ক্রোধানলকে ক্রোধ দ্বারা জয় করিতে যাইতেন, তাহা হইলে তিনি দ্বিতীয় জগাই-মাধাই হইতেন—তাহা না করিয়া তিনি প্রেম দ্বারা ক্রোধকে জয় করিলেন। এ তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে যে, অগ্নি দ্বারা অগ্নিকে নির্ব্বাণ করা যায় না—অগ্নিকে নির্ব্বাণ করিতে হইলে জলের প্রয়োজন। এই জন্য রিপুগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার সময় রাজসিক উৎসাহ এবং উদ্যমের সঙ্গে সাত্ত্বিক প্রকাশ এবং আনন্দের যোগ রক্ষা করা নিতান্তই আবশ্যক—আত্মপ্রভাবের সহিত দেবপ্রসাদের যোগ রক্ষা করা নিতান্তই আবশ্যক—তা নহিলে সাধকের জয়লাভের চেষ্টা চরম সাফল্যে পৌঁছিতে পরাভব মানিয়া মাঝপথে গুরুভারে আক্রান্ত হইয়া ভূতলে অবসন্ন হইয়া পড়ে। অন্তর্জগতের রিপুগণের উপরে বিহিত বিধানে জয়লাভ করিলে সাধকের অন্তর্নিগূঢ় প্রকাশ এবং আনন্দের ফোয়ারা কিরূপে আপনা হইতে উন্মুক্ত হইয়া যায় তাহার যদি দৃষ্টান্ত দেখিতে চাও, তবে তাহার দুইটি সেরা দৃষ্টান্ত জগতে সুপ্রসিদ্ধ—তাহা চক্ষু মেলিয়া দেখিলেই দেখিতে পারো। বোধিবৃক্ষের তলে বুদ্ধদেব প্রশান্তভাবে যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া যখন মারের শতসহস্র দলবলের উপরে সংগ্রামে জয়লাভ করিয়াছিলেন তখন তাঁহার অন্তঃকরণে বিশুদ্ধ প্রকাশ এবং বিমল আনন্দের ফোয়ারা কেমন সহজে উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছিল; এবং তাহার আর কতিপয় শতাব্দী পরে ঈশামহাপ্রভু যখন বিজনপ্রান্তরে সয়তানের উপরে জয়লাভ করিয়াছিলেন, তখন ঈশ্বরের প্রসাদ তাঁহার মস্তকের উপরে অবতীর্ণ হইয়া কেমন আশ্চর্য্যভাবে তাঁহার সমস্ত দুঃখ ক্লেশ মুহূর্ত্তের মধ্যে শান্তিসাগরে

ডবাইয়া দিয়াছিল—ইহা পৃথিবীসুদ্ধ লোকের সকলেরই জানা কথা।

ডারুইনের সিদ্ধান্তের সহিত আমাদের মন্তব্য কথার ঐক্য কোন্‌-স্থানটিতে তাহা আমি ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি; জীবজগতে রজোগুণের প্রবর্ত্তিত জীবন সংগ্রাম জীবের ক্রমোন্নতিপথ উন্মুক্ত করিয়া দ্যায়—এ কথাটি ডারুইন্‌ও বলেন, আমরাও বলি; তা ছাড়া আমাদের দেশের সকল শাস্ত্রই একবাক্যে বলে যে, রজোগুণই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সৃষ্টির প্রবর্ত্তক। কিন্তু আমাদের ন্যায় ডারুইন এ কথা বলেন না যে, সত্তারক্ষার জন্য ধস্তাধস্তির মূলে যে বিশুদ্ধ প্রকাশ এবং বিমল আনন্দ অন্তর্নিগূঢ় রহিয়াছে তাহার বাধা অপনীত হইলেই তাহা আপনা হইতে ফুটিয়া বাহির হইয়া মনুষ্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করে; তা ছাড়া, ইহার পরে তাহা যখন আর কতিপয় শতাব্দী ধরিয়া মনুষ্যের অন্তর্নিহিত পাশব প্রকৃতির সহিত ধস্তাধস্তি করিয়া তাহাদের উপরে রীতিমত জয় লাভ করিবে, তখন তাহা আরো জাজ্জ্বল্যতররূপে ফুটিয়া বাহির হইবে—তখন মনুষ্যসমাজে সকলেই সকলের দুঃখমোচনের জন্য আগ্রহান্বিত হইবে; সুবিবাহিত নরনারীরা যথোপযুক্ত বয়সে মনুষ্যের মতো মনুষ্যের বংশ পুরুষানুক্রমে প্রবাহিত করিবে; ডারুইনের মতানুযায়ী ধস্তাধস্তীর পরিবর্ত্তে পৃথিবীস্থ মনুষ্যজাতির আপাদমস্তক জুড়িয়া প্রেম এবং সদ্ভাব বিরাজ করিতে থাকিবে; এক কথায়—মনুষ্য প্রকৃতপক্ষে মনুষ্য হইবে। এইখানটিতে আমাদের মতের সহিত ডারুইনের মতের মিল হয় কি না সন্দেহ—মিল না হইবারই বেশী সম্ভাবনা। আজ আমি যাহা বলিলাম তাহার মূলমন্ত্র হচ্চে উপনিষদের এই বচনটি—"অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে"। সধক অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া বিদ্যাদ্বারা অমৃত লাভ

করেন। ইহার ভাবার্থ এই যে জীব অবিদ্যা দ্বারা অর্থাৎ যেমন ডারুইনের অভিপ্রেত সত্তারক্ষার জন্য ধস্তাধস্তি সেইরূপ ধস্তাধস্তিদ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করেন অর্থাৎ অন্তর্নিগূঢ় সত্ত্বগুণের অভিব্যক্তি পথের বাধা অপসারণ করেন ; আত্মপ্রভাবের বলে বাধা অপসারিত হইলে ঈশ্বর প্রসাদে এক প্রকার দিব্যজ্ঞানগর্ব্ভা বিদ্যা যাহার আরেক নাম বিশুদ্ধ প্রকাশ এবং বিমল আনন্দ তাহা অন্তর হইতে ফুটিয়া বাহির হইয়া জীবকে অমৃতে অভিষিক্ত করে।

পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে ব্যষ্টিসত্তা মাত্রই দেশকালপাত্রে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া তাহা ত্রিগুণাত্মক, আর সমষ্টিসত্তা অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া তাহার অন্তর্ভূত সাত্ত্বিক প্রকাশ এবং আনন্দ রজস্তমোগুণ দ্বারা কলুষিত বা বাধিত হইতে পারে না। তবেই হইতেছে যে সমষ্টিসত্তা শুদ্ধসত্ত্বের কিনা পরম পরিশুদ্ধ জ্ঞান এবং আনন্দের আলয়। আর সেই জন্য পরমাত্মার সচ্চিদানন্দ নাম আমাদের দেশের সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানশাস্ত্রে সমস্বরে উদ্গীত হইয়াছে। ফলে, রজস্তমোগুণ দ্বারা অবাধিত পরমোৎকৃষ্ট সত্ত্বগুণ যে ঈশ্বরের বিশেষত্বের নিদান এ বিষয়ে পাতঞ্জল এবং বেদান্তদর্শনের মত-সাদৃশ্য অতীব সুস্পষ্ট। পাতঞ্জল দর্শনের প্রথম পাদের ৩৪ সূত্রে ঈশ্বর-শব্দের সংজ্ঞা-নির্ব্বাচন করা হইয়াছে এইরূপ :—

"ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।"

ইহার অর্থ এই :—

যিনি ক্লেশ এবং কর্ম্মবিপাকাশয় দ্বারা অসংস্পৃষ্ট সেই বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত পুরুষই ঈশ্বর-শব্দের বাচ্য।

ইহাতে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, ঈশ্বর ব্যতীত আর কোনো পুরুষই নিত্যকাল ক্লেশ এবং কর্ম্মবিপাকাশয় দ্বারা অসংস্পৃষ্ট নহে।

কর্ম্মবিপাকাশয় যে কাহাকে বলে তাহা ভোজরাজকৃত টীকায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে এইরূপ :—

“বিপচ্যন্তে ইতি বিপাকাঃ কর্ম্ম-ফলানি” কর্ম্মফল যথা-কালে পাকিয়া ওঠে এই অর্থে কর্ম্মবিপাক। “আফল বিপাকাৎ চিত্তভূমৌ শেরতে ইত্যাশয়াঃ বাসনাখ্যাঃ সংস্কারাঃ” বাসনাখ্য সংস্কারগুলির যাবৎ পর্য্যন্ত না ফল বিপাক হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত সেগুলি চিত্তভূমিতে শয়ান থাকে (অর্থাৎ প্রসুপ্তভাবে নিলীন থাকে) এই অর্থে আশয়।

ভোজরাজ-কৃত এই পরিষ্কার সূত্র-ব্যাখ্যা হইতে আমরা পাই-তেছি এই যে, কর্ম্মফলের প্রসুপ্ত বীজস্বরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন সংস্কারের নামই কর্ম্মবিপাকাশয়। কথাটা আর কিছু না—আমরা যেরূপ যেরূপ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করি সেই সেই কর্ম্মের সংস্কার আমাদের অজ্ঞাত-সারে আমাদের অন্তঃকরণে বদ্ধমূল হয়, আর, তাহার পরে সেই সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন সংস্কার হইতে সেই সেই কর্ম্মের ফলাফল যথাযথ সময়ে ফুটিয়া বাহির হয়। এই সকল কর্ম্মফলের বীজভূত সংস্কারের নাম বাসনা। এই রকমের যত সব বাসনা আমাদের মনের মধ্যে প্রগাঢ় অন্ধকারে নিলীন রহিয়াছে তাহাদের ভিতরে আমাদের জ্ঞানের দৃষ্টি চলে না বলিয়া তাহারা সবসুদ্ধ ধরিয়া মোটের উপর অদৃষ্ট নামে সংজ্ঞিত হইয়া থাকে। এখন কথা হ'চ্চে এই যে, সেই যে অন্ধকারাচ্ছন্ন বাসনাখ্য সংস্কার-সমষ্টি—কর্ম্মবিপাকাশয়, যাহার আর এক নাম অদৃষ্ট, তাহার ভিতরে মূলেই যখন আমাদের জ্ঞানের দৃষ্টি চলে না, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে, তাহা তমো-গুণেরই আর এক নাম ; তা ছাড়া, ক্লেশ যে রজোগুণের আর এক নাম তাহা পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি। তবেই হইতেছে যে, ক্লেশ এবং কর্ম্মবিপাকাশয় দ্বারা অসংস্পৃষ্ট বলাও যা, আর, রজস্তমোগুণ

দ্বারা অসংস্পৃষ্ট বলাও তা, একই কথা। সূত্রকার কোন্ দুই গুণ ঈশ্বরেতে নাই তাহা ইঙ্গিত মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন—পরন্তু টীকাকার তাহাতে ক্ষান্ত না হইয়া কোন্ গুণ ঈশ্বরেতে সীমা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে তাহা খোলাসা করিয়া ভাঙিয়া বলিতে ত্রুটি করেন নাই। টীকাকার বলিতেছেন :—"যদ্যপি সর্ব্বেষাং আত্মনাং ক্লেশাধি সংস্পর্শো নাস্তি তথাপি চিত্তগত স্তেষাং উপচর্য্যতে। যথা যোদ্ধৃগতৌ জয়পরাজয়ৌ স্বামিনঃ। অস্য তু ত্রিষপি কালেষু তথা-বিধোঽপি ক্লেশাদি-পরামর্শো নাস্তি। অতঃ স বিলক্ষণ এব ভগবান্ ঈশ্বরঃ। তস্য চ তথাবিধং ঐশ্বর্য্যং সত্ত্বোৎকর্ষাৎ।"

ইহার অর্থ এই :—

"জীবাত্মাকে যদি তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে পৃথক্ করিয়া দেখা যায় তবে জীবাত্মাতেও ক্লেশাদির সংস্পর্শ নাই" এ কথা সত্য হইলেও দেখিতে হইবে এই যে, রাজা যেমন তাঁহার সৈন্যবর্গের জয়পরাজয় আপনার গায়ে মাখিয়া ল'ন জীবাত্মা তেমনি তাঁহার অন্তঃকরণের ক্লেশাদি আপনার গায়ে মাখিয়া ল'ন ; ঈশ্বরেতে কিন্তু ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তিন কালের কোনো কালেই সে রকম গায়ে মাখিয়া লওয়া ক্লেশাদিরও সংস্পর্শ নাই—এইজন্য ভগবান ঈশ্বর জীব হইতে ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত। এইরূপ ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কোনো কালেই ক্লেশাদি দ্বারা স্বল্পমাত্রও সংস্পৃষ্ট না হওয়া-ব্যাপারটি সত্ত্বগুণের উৎ-কর্ষের পরিচায়ক। অতএব সত্ত্বগুণের উৎকর্ষই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য। এই কথাটি সুধু যে কেবল পাতঞ্জলদর্শনের কথা তাহা নহে—বেদান্তদর্শনেও ঐ কথা বিধিমতে সমর্থিত হইয়াছে ; প্রভেদ কেবল এই যে, পাতঞ্জলদর্শনের মতে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ ঈশ্বরের ঐশী প্রকৃতি ; বেদান্তদর্শনের মতে উহা ঈশ্বরের মায়া-সংজ্ঞক উপাধি। তার

সাক্ষী, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার প্রণীত সর্ব্ববেদান্ত-সারসংগ্রহ গ্রন্থে ঈশ্বর-শব্দের সংজ্ঞানির্ব্বাচন উপলক্ষে তাঁহার বক্তব্য কথাটি আরম্ভ করিতেছেন এইরূপে :—

"মায়োপহিত চৈতন্যং সাভাসং সত্ত্ব-বৃংহিতং * * * ঈশ ইত্যপি গীয়তে"

ইহার অর্থ এই :—

যে চৈতন্য মায়া উপাধিতে উপহিত, প্রতিবিম্ব-সহ বর্ত্তমান, এবং সত্ত্বগুণ দ্বারা পরিপুষ্ট, তিনি ঈশ নামে অভিহিত হ'ন। "প্রতিবিম্ব সহবর্ত্তমান" এ কথাটির ভাবার্থ এই যে, ঈশ্বর-চৈতন্য মায়া উপাধিতে বা বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে প্রতিবিম্বিত হয়। পাতঞ্জলদর্শনের মতেও সাক্ষী চৈতন্য সত্ত্বগুণপ্রধান বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হ'য়—আর শেষোক্ত দর্শনে ঐরূপ প্রতিবিম্বিত হওনের নাম দেওয়া হইয়াছে চিচ্ছায়াসংক্রান্তি।

পঞ্চদশী নামক বেদান্ত গ্রন্থে মায়াশব্দের সহিত একযোগে ঈশ্বর-শব্দের সংজ্ঞা নির্ব্বাচন করা হইয়াছে এইরূপ :—

"চিদানন্দময় ব্রহ্ম প্রতিবিম্ব সমন্বিতা।
তমোরজঃ সত্ত্বগুণা প্রকৃতি র্দ্বিবিধা চ সা।
সত্ত্বশুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাং মায়াবিদ্যে চ তে মতে॥
মায়াবিম্বো বশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ।
অবিদ্যাবশগস্ত্বন্যঃ * *॥"

ইহার অর্থ এই :—

চিদানন্দ ব্রহ্মের প্রতিবিম্বসমন্বিতা প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী এবং তাহা দুই প্রকার—শুদ্ধসত্ত্বরূপিনী ও মলিনসত্ত্বরূপিনী। শুদ্ধসত্ত্বরূপিনী প্রকৃতির নাম মায়া, আর, মলিনসত্ত্বরূপিনী প্রকৃতির নাম অবিদ্যা।

যিনি সেই শুদ্ধসত্ত্বরূপিনী মায়াকে বশীভূত করিয়া তাহাতে প্রতি-বিম্বিত হ'ন তিনিই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর বলিয়া অবধারিতব্য ; আর, সেই যে মলিন-সত্ত্বরূপিনী প্রকৃতি অবিদ্যা—ঈশ্বর ব্যতীত আর সকলেই সেই অবিদ্যার বশতাপন্ন।"

পাতঞ্জল দর্শনের প্রথম পাদের ৩৪ সূত্রের ভোজরাজকৃত টীকার যতখানি অংশ একটু পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়া দেখানো হইয়াছে, টীকাকার তাহার অব্যবহিত পরেই বলিতেছেন—

"তস্য চ তথাবিধং ঐশ্বর্য্যং অনাদেঃ সত্ত্বোৎকর্ষাৎ ; সত্ত্বোৎকর্ষশ্চ প্রকৃষ্ট জ্ঞানাদেব। ন চানয়োঃ জ্ঞানৈশ্বর্য্যযোঃ ইতরেতরাশ্রয়ত্বং, পরস্পরানপেক্ষত্বাৎ।"

ইহার অর্থ এই :—

"ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যের অর্থাৎ ঈশ্বরত্বের গোড়া'র কথা হ'চ্চে অনাদি সত্ত্বোৎকর্ষ অর্থাৎ সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ, এবং সত্ত্বগুণের উৎকর্ষের গোড়া'র কথা হ'চ্চে প্রকৃষ্ট জ্ঞান। এইরূপে আমরা দুইটি বিষয় পাইতেছি ; একটি বিষয় হ'চ্চে জ্ঞান, আর একটি বিষয় হ'চ্চে ঐশ্বর্য্য বা শক্তিমত্তা। যদিচ ঈশ্বরেতে জ্ঞান এবং ঐশ্বর্য্য দুইই একাধারে বর্ত্তমান, তথাপি ও দুইটি উপাধি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরস্পর-সাপেক্ষ নহে।"

ভোজরাজের এ কথাটির তাৎপর্য্য আমি যতদূর বুঝিতে পারি-তেছি তাহা এই :—

সাধারণ সাংখ্য-দর্শনের মতে দ্রষ্টাপুরুষমাত্রই জ্ঞানস্বরূপ ; তাহার মধ্যে পাতঞ্জল সাংখ্যদর্শনের বিশেষ একটি কথা এই যে, ঈশ্বর যদিচ জীবেরই ন্যায় দ্রষ্টা পুরুষ—কিন্তু তথাপি একটি বিষয়ে কোনো

জীবেরই তাঁহার সহিত তুলনা হয় না; সে বিষয়টি হ'চ্চে—প্রকৃতির বিশুদ্ধ সত্বাংশের সহিত ঈশ্বরের নিত্যসিদ্ধ একাত্মভাব। ইহাতে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে একদিকে দ্রষ্টা পুরুষ স্বয়ং জ্ঞানের নিদান, এবং আর একদিকে প্রকৃতির সারভূত বিশুদ্ধ সত্বাংশ শক্তির বা ঐশ্বর্য্যের নিদান; দুই দিকের এই যে দুই সার বস্তু অর্থাৎ পুরুষের দিকের (বা জ্ঞাতৃপক্ষের) সারবস্তু জ্ঞান এবং প্রকৃতির দিকের (বা জ্ঞেয়-পক্ষের) সারবস্তু বিশুদ্ধ সত্বগুণ—যাহার আর এক নাম মহাশক্তি বা মহৈশ্বর্য্য—এই দুই সারবস্তুর অনাদি একাত্মভাবই পাতঞ্জলদর্শনের মতে ঈশ্বরত্বের নিদান। বেদান্তের কথা আর এক প্রকার। বেদান্ত শাস্ত্রে বলে যে, প্রকৃতি মূলেই ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র কোনো পদার্থ নহে। যাহাই হউক্ না কেন, একটি বিষয়ে বেদান্ত-দর্শনের সহিত পাতঞ্জল-দর্শনের মত-সাদৃশ্য খুবই স্পষ্ট;—সে বিষয়টি এই যে, পাতঞ্জল-দর্শনের মতে দুইটি অনন্যসাধারণ গুণ ঈশ্বরেতে একাধারে বর্ত্তমান—একটি হ'চ্চে অপরিসীম জ্ঞান এবং আরেকটি হ'চ্চে অপরিসীম শক্তি। বেদান্তদর্শনের মতেও তাই; তার সাক্ষী শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন—

"সর্ব্বশক্তি গুণোপেতঃ সর্ব্বজ্ঞানাবভাসকঃ।
স্বতন্ত্রঃ সত্যসংকল্পঃ সত্যকামঃ স ঈশ্বরঃ॥
তস্যৈতস্য মহাবিষ্ণো র্মহাশক্তি র্মহীয়সঃ।
সর্ব্বজ্ঞত্বেশ্বরত্বাদিকারণত্বান্মনীষিণঃ।
কারণং বপুরিত্যাহুঃ সমষ্টিং সত্ত্ববৃংহিতং॥"

ইহার অর্থ এই :—

"যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ স্বতন্ত্র সত্যসংকল্প এবং সত্যকাম তিনিই ঈশ্বর। সেই মহাবিষ্ণু মহীয়ান্ পরমেশ্বরের যে এক মহতীশক্তি

আছে, যাহার আরেক নাম সমষ্টিভূত সত্ত্বগুণ, সেই মহাশক্তি যেহেতু সর্ব্বজ্ঞত্ব এবং ঈশ্বরত্বাদির কারণ এই জন্য মনীষীরা সেই সত্ত্বগুণের সমষ্টিরূপা মহতীশক্তির নাম দিয়াছেন কারণ শরীর।”

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, পাতঞ্জল এবং বেদান্ত উভয় দর্শনেরই মতে মহাশক্তি এবং মহৈশ্বর্য্যের নিদান-ভূত বাধাবিহীন বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ এবং প্রকৃষ্ট জ্ঞান দুইই ঈশ্বরেতে একাধারে বিদ্যমান।

প্রকাশ এবং আনন্দ যে সত্ত্বগুণের ডা'ন হাত বাঁ হাত—এ বিষয়টি আমি পূর্ব্বে বিধিমতে বিবৃত করিয়া বলিয়াছি; কিন্তু সাত্ত্বিক আনন্দের সঙ্গে যে একটি শক্তির ব্যাপার মাখামাখি ভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে সে বিষয়টির সম্বন্ধে আমি এ যাবৎকাল পর্য্যন্ত মূলেই কোনো কথার উচ্চবাচ্য করি নাই। অথচ আমাদের দেশের বেদ পুরাণ প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেরই একটি প্রধান মন্তব্য কথা এই যে, প্রকৃতি-পুরুষের সহযোগ ব্যতিরেকে, অথবা যাহা একই কথা—জ্ঞান এবং শক্তির সহযোগ-ব্যতিরেকে জগৎকার্য্যের প্রবাহ তো চলিতে পারেই না, তা ছাড়া—জগৎ বলিয়া একটা পদার্থ হইতেই পারে না;—এমন কি নব্যতম যুগের পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতেও বিশ্বভুবনে শক্তির বিকাশ এবং জ্ঞানের প্রকাশ জোড়ে মিলিয়া এক সঙ্গে উন্নতিপথে অগ্রসর হয়। এক্ষণে সেই কথাটি (অর্থাৎ সাত্ত্বিক আনন্দের সহিত একটি মৌলিক ধাঁচার শক্তি একত্রে বাস করিতেছে এই কথাটি) শ্রোতৃবর্গের দৃষ্টিক্ষেত্রে আনিয়া দাঁড় করাইবার সময় উপস্থিত, এই জন্য তাহাতেই প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, “আমি ভূতকাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বর্ত্তিয়া আছি” এই বর্ত্তিয়া-থাকা-ব্যাপারটির প্রকাশের সঙ্গে ভবিষ্যতে বর্ত্তিয়া থাকিবার ইচ্ছা নিরবচ্ছেদে লাগিয়া থাকে, আর সেই

সঙ্গে এটাও বলিয়াছি যে, সেই যে ভবিষ্যতে বর্ত্তিয়া থাকিবার ইচ্ছা তাহার গোড়ার কথা হ'চ্চে আত্মসত্তা'র রসাস্বাদনজনিত আনন্দ। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, জ্ঞানবান্ জীবের মর্ম্মাধিষ্ঠিত সেই যে বর্ত্তিয়া থাকিবার ইচ্ছা, সে ইচ্ছাটি কি বামন হইয়া চাঁদে হাত বাড়াইবার ন্যায় কেবল ইচ্ছামাত্রেই পর্য্যবসিত? সত্তার রসবোধ যখন সত্তার প্রকাশের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং সেই রসবোধজনিত আনন্দ হইতে যখন বর্ত্তিয়া থাকিবার ইচ্ছা প্রসূত হইয়াছে, তখন সেই ইচ্ছার মূলে তাহাকে ফলবতী করিতে পারিবার মতো কোনো সহায়-সামর্থ্য কি বিদ্যমান নাই—শক্তি বিদ্যমান নাই? প্রকৃত কথা এই যে, অভীষ্ট সাধনে সাধকের শক্তি আছে কি না তাহা কার্য্যাভিব্যক্তির পূর্ব্বে জানা যাইতে পারে না; কেবল "ফলেন পরিচীয়তে" এই চির-কেলে প্রবাদটিই শক্তি-পরীক্ষার একমাত্র কষ্টিপাথর। বর্ত্তিয়া থাকিবার ইচ্ছা তো জ্ঞানবান্ মনুষ্যমাত্রেরই আছে; কিন্তু ইচ্ছা যেমন আছে, শক্তি তেমন আছে কি না তাহা ফলেন-পরিচীয়তে'র কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিয়া দেখা ভিন্ন, অন্য কোনো উপায়ে জানিতে পারা সম্ভবে না। অতএব পরীক্ষা কী বলে, তাহা দেখা যা'ক্। সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুকেরা মনুষ্য অপেক্ষা শতগুণে বলবান্; তা ছাড়া, তাহারা দুর্ভেদ্য চর্ম্মবর্ম্মে এবং কার্য্য-কুশল দন্ত-নখাস্ত্রে সুসজ্জিত; মনুষ্য তাহাদের তুলনায় নিতান্তই অসম্পূর্ণ জীব; কেননা বর্ত্তিয়া থাকিবার জন্য যে সকল সাধনোপকরণ তাহার পক্ষে আশু-প্রয়োজনীয়, প্রকৃতি-মাতা তাহাকে তাহার শতাংশের একাংশও দ্যা'ন নাই; অথচ ফলে আমরা দেখিতে পাই যে, সেই সহায়সম্পত্তিবিহীন অসম্পূর্ণ জীবের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে পশুরাজ্যের মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত থরহরি কম্পমান। ইহা অপেক্ষা অধিক

প্রমাণ আর কি হইতে পারে যে, বাধাবিঘ্নের প্রতিকূলে বর্ত্তিয়া থাকিবার শক্তি মনুষ্যের ভিতরে যেমন আছে এমন আর কোনো জীবের ভিতরেই নাই। তা ছাড়া, আর একটি কথা আছে—সে কথাটি সবিশেষ দ্রষ্টব্য। সে কথা এই যে, মনুষ্যের বর্ত্তিয়া থাকিবার শক্তি যে, পশ্বাদি জন্তুদিগের ঐরূপ শক্তি অপেক্ষা মাত্রায় শুধু বেশী তাহা নহে, পরন্তু মনুষ্যের আধ্যাত্মিক শক্তির সহিত পশ্বাদি জন্তুদিগের প্রাকৃত শক্তির তুলনাই হয় না। পূর্ব্বে এই যে একটি কথা আমি বলিয়াছি যে, বাধার অনুভূতিই—দুঃখই—কাম-ক্রোধ প্রধান রজোগুণই—জীবজন্তুদিগের জীবন-সংগ্রামের প্রধান সেনাপতি, এ কথা মনুষ্যের পক্ষে খাটে না। মনুষ্যের কার্য্যকলাপ একটু স্থিরচিত্তে প্রণিধান করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, মনুষ্যের জীবনসংগ্রামে রজোগুণ প্রধান কাম ক্রোধাদি সেনাপতি অপেক্ষা অনেক নিম্নপদবীস্থ যোদ্ধা। এই উচ্চ শ্রেণীর জীবনসংগ্রামে সত্তার রসাস্বাদজনিত আনন্দই প্রধান সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত হইবার যোগ্য পাত্র। মনুষ্যের এই বিশেষত্বটি ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখা আবশ্যক; কেননা তাহার উপরে বর্ত্তমান বিষয়টির বিচার-নিষ্পত্তি অনেকটা নির্ভর করে। একটি লোকপ্রসিদ্ধ ইংরাজি প্রবাদ এই যে Necessity is the mother of invention, বাধানুভূতিই কার্য্যকৌশলের জননী। মানিলাম যে, কার্য্যকৌশলের জননী বাধানুভূতি, কিন্তু তাহার জনক কে? ইহার উত্তরে আমি বলি এই যে, তাহার জনক হ'চ্চে সত্তার রসবোধজনিত আনন্দ। যদি প্রমাণ চাও—তবে মনুষ্যের নীচের থাকের জীবজন্তুদিগের স্বভাবচরিত্র এবং আচার-ব্যবহারের প্রতি একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিলেই অনায়াসে তাহা তুমি পাইতে পার। তাহার একটি জাজ্বল্যমান

প্রমাণ তোমাকে আমি দেখাইতেছি—প্রণিধান কর। একটা বলবান্ গরিল্লা যদি কোনো মনুষ্যের হস্তের লগুড় দ্বারা আহত হয়, তবে খুব সম্ভব যে, গরিল্লাটা বাধানুভূতিজনিত ক্রোধের উত্তেজনায় সেই লগুড়টা প্রহারকের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়া তাহা ভাঙিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবে। বাধানুভূতির বিদ্যার দৌড় ঐ পর্য্যন্ত; তা বই, বাধানুভূতি যে, গুরুর আসনে উপবিষ্ট হইয়া গরিল্লাকে গাছের একটা ডাল ভাঙিয়া ভীমের গদার ন্যায় একগাচি আশুফলপ্রদ লগুড় নির্ম্মাণ করিতে শিখাইবে, সে ক্ষমতা তাহার নাই। আদিম মনুষ্যেরাও এক সময়ে নদী কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইলে সাঁতার দিয়া নদী পার হইত। কিন্তু সে প্রকার বাধার অনুভূতি কোনো জন্মেই মনুষ্যকে নৌকা নির্ম্মাণ করিতে শেখায়ও নাই—শেখাইতে পারেও না। মনুষ্যের নৌকা-নির্ম্মাণ-বিদ্যার আদিগুরু তবে কে? মনুষ্য-নাবিকের আদিগুরু যে কে তাহা নৌকার গায়ে স্পষ্টাক্ষরে লেখা রহিয়াছে। নৌকার গঠন দেখিলেই মর্ম্ম-গ্রাহী ভাবুক ব্যক্তির চক্ষে এ কথা ঢাকা থাকে না যে, নৌকা একপ্রকার কাঠের হাঁস। আমি যেন দিব্য চক্ষে দেখিতেছি যে, আদিম মনুষ্য-নাবিককে সর্ব্বপ্রথমে হাল-বর্জ্জিত দু-দেঁড়ে ডিঙিতে ভর করিয়া নদনদী সমুদ্রের কিনারায় ঘোরাফেরা করিতে শিখাইয়াছিল হংসাচার্য্য। তাহার অনেক শতাব্দী পরে মনুষ্য-নাবিককে হালওয়ালা চারদেঁড়ে নৌকায় ভর করিয়া জলপথে ভ্রমণ করিতে শিক্ষা দিয়াছিল মৎস্যাচার্য্য। তাহার কতিপয় শতাব্দী পরে মনুষ্য নাবিককে মাঝসমুদ্র দিয়া পা'লভরে জাহাজ চালাইতে শিক্ষা দিয়াছিল নাবিক-নামক (অর্থাৎ Nautilus নামক) একপ্রকার ভূমধ্যসাগর নিবাসী জলজন্তু। এ তো গেল মনুষ্য-নাবিকের সামান্য শ্রেণীর গুরুপরম্পরা। কিন্তু পিতা গুরুর

গুরু—যেহেতু পিতারাই বালকদিগকে উপযুক্ত গুরুগণের নিকটে প্রেরণ করিয়া তাহাদের জ্ঞানোদ্দীপনের পথ প্রমুক্ত করিয়া দ্যা'ন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে আদিম নাবিকদিগের পিতৃতুল্য গুরুর গুরু কে? ইহার উত্তরে আমি বলি এই যে, আদিম নাবিকদিগের গুরুর গুরু হ'চ্চেন সেই মহাপুরুষ যাঁহাকে আমি বলিতেছি সত্তার রসাস্বাদন-জনিত আনন্দ। আদিম নাবিক যে খুব একজন ভাবুক লোক ছিলেন—কবি ছিলেন—তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে। তিনি যখন ভাবে গদ্‌গদ্ হইয়া, হংস মিথুন বা হংসযূথ কেমন অপূর্ব্ব সুন্দর ঠামে সরোবর-বক্ষে গা ভাসাইয়া জল কাটিয়া চলিতেছে তাহা দেখিতেন, তখন তাঁহার মনে কত না আনন্দ হইত? এইথেকে সুরু করিয়া হংসযূথের অনুপম-ঢঙের সন্তরণলীলা তাঁহার মনকে এরূপ পাইয়া বসিল যে, অবশেষে তিনি তাঁহার অন্তরের ভাবটিকে দারুখণ্ডে মূর্ত্তিমান না করিয়া কিছুতেই ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না। ইতিহাসে তো স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, আর্য্যজাতীয় মনুষ্যমণ্ডলীর আদি-গুরুরা বিশিষ্ট-রকমের কবি ছিলেন, আর সেই সঙ্গে এটাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহাদের শিষ্যানুশিষ্যেরা গুরুপরম্পরাগত কবিত্বরসা-ভিষিক্ত প্রাণঘ্যাঁসা জ্ঞানের পথ ধরিয়া চলিতে চলিতে বহুকালের পরে সাধন-ঘ্যাঁসা বিজ্ঞান পথের সন্ধান পাইয়াছিলেন। তার সাক্ষী—আগে বেদ, পরে বেদান্ত। বেদশাস্ত্র আদিম কবিদিগের অন্তর্নিগূঢ় আনন্দের উচ্ছ্বাস-বাণী বলিয়া আমাদের দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী বেদশাস্ত্রের উপরে অপৌরুষেয়-বিশেষণ আরোপ করিয়া থাকেন। আমি তাই বলিতেছি যে, নৌকানির্ম্মাণ, মন্দিরনির্ম্মাণ, কাব্য-রচনা প্রভৃতি মানবীয় কার্য্য-কৌশলের জননী হইতে পারে—বাধানুভূতি, কিন্তু তাহার জনক আর এক জন। তাহার জনক সেই অটল মহাপুরুষ যাহাকে

আমি বলিতেছি সত্তা'র রসাস্বাদন-জনিত আনন্দ। আমরা এইরূপ ফলেনপরিচীয়তে'র কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া এই শুভ বার্ত্তাটির সন্ধান পাইতেছি যে, সত্ত্বগুণের আনন্দ-অবয়বটির সহিত মনুষ্যের বিশ্ববিজয়ী সাধনী শক্তি মাখামাখিভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। ঐ কষ্টিপাথরের প্রামাণিকতায় ভর করিয়া এতক্ষণের পরে আমরা যে একটি সার সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম তাহা এই যে, জ্ঞানবান্ জীবমাত্রেরই অন্তঃকরণে যেমন বর্ত্তিয়া থাকিবার ইচ্ছা আছে, তেমনি সেই ইচ্ছার সঙ্গে, বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বর্ত্তিয়া থাকিবার শক্তিও তাহার যথেষ্ট পরিমাণে আছে; আর মনুষ্যের সেই যে বিশ্ববিজয়ী শক্তি তাহার গোড়া'র কথা হ'চ্চে সত্তার রসাস্বাদন-জনিত আনন্দ। আগামী বারে সমষ্টিসত্তা এবং ব্যষ্টিসত্তার মধ্যে কিরূপ শক্তিঘটিত সম্বন্ধ তাহার পর্য্যালোচনায় বিবিমতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে—আজ আর পুঁথি বাড়াইব না।

সপ্তম অধিবেশন।

ব্যাখ্যান।

শ্রোতৃবর্গের মনে সহজে এইরূপ একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, গীতাপাঠ উপলক্ষে ত্রিগুণতত্ত্বের এরূপ ব্যাখ্যা-বাহুল্যের প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, গীতাশাস্ত্রের আদ্যোপান্ত জুড়িয়া গুণ শব্দ নানা কথাপ্রসঙ্গে, নানা স্থলে, নানা ছলে, পদে পদে ব্যবহৃত হইয়াছে—ইহা কোনো গীতাপাঠকের চক্ষে ঢাকা থাকিতে পারে না। এইজন্য ত্রিগুণ যে পদার্থটা কি, আর, তাহার ভিতরে আমাদের দেশীয় তত্ত্বজ্ঞানের সার কথাগুলি কেমন আশ্চর্য্যরূপে আগলাইয়া রাখা হইয়াছে, ইহা বিবৃত করিয়া দেখানো গীতাশ্রাবয়িতার পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য বিবেচনায়, আমি এই দুরূহ ব্যাপারটিতে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। আমার স্বপক্ষসমর্থন এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট; এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবে অবতীর্ণ হওয়া যা'ক।

ত্রিগুণের ভিতরের কথার অন্বেষণে বাহির হইয়া আমরা কোন্ পথ দিয়া কোথায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি, তাহা একবার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা যা'ক।

আমরা দেখিয়াছি যে, সত্তা কাহারো একচেটিয়া সম্পত্তি নহে। সত্তা তোমারও আছে, আমারও আছে, পশু-পক্ষীরও আছে, ধাতু-প্রস্তরেরও আছে। সত্তা যখন সকলেরই আছে, তখন তাহা হইতেই আসিতেছে যে, সত্তার প্রকাশও সকলেতেই আছে। কেন না, সত্তার প্রকাশ না হইলে সত্তার কোনো নিদর্শন থাকে না; সত্তার কোনো নিদর্শন না থাকিলে—"সত্তা আছে" এ কথা একেবারেই

নস্যাৎ হইয়া যায়। অতএব যখন তুমিও বলিতেছ, আমিও বলিতেছি এবং সকলেই একবাক্যে বলিতেছে যে, সত্তা সকলেরই আছে, তখন তাহাতেই প্রকারান্তরে বলা হইতেছে যে, সত্তার প্রকাশও সকলেতেই ন্যূনাধিক পরিমাণে আছে; অথবা, যাহা একই কথা—সকলেরই সত্তার সঙ্গে চেতনা ন্যূনাধিক পরিমাণে লাগিয়া রহিয়াছে। তবেই হইতেছে যে, সকলেরই সত্তা আত্মসত্তা। তোমার সত্তাও তোমার আত্মসত্তা, আমার সত্তাও আমার আত্মসত্তা, গোমহিষের সত্তাও গোমহিষের আত্মসত্তা, ধাতুপ্রস্তরের সত্তাও ধাতুপ্রস্তরের আত্মসত্তা। প্রভেদ কেবল এই যে, আত্মসত্তা'র প্রকাশ সত্বপ্রধান মনুষ্যের মধ্যে সুপরিস্ফুট, রজঃপ্রধান মূঢ় জীবদিগের মধ্যে অর্দ্ধস্ফুট বা মুকুলিত, তমঃপ্রধান জড় বস্তুর মধ্যে প্রসুপ্ত বা বীজভাবাপন্ন। আবার মনুষ্যের মধ্যেও আত্মসত্তার প্রকাশ জাগরিতাবস্থায় সুপরিস্ফুট হয়, স্বপ্নাবস্থায় অর্দ্ধস্ফুট বা মুকুলিত ভাব ধারণ করে, প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় সুপ্তিসাগরে নিমগ্ন হয়। এটাও আমরা দেখিয়াছি যে "আমি ভূতকাল হইতে এ যাবৎকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তিয়া আছি" এই বর্ত্তিয়া থাকা ব্যাপারটি যেখানে যখন প্রকাশ পায়, সেইখানেই ভবিষ্যতে বর্ত্তিয়া থাকিবার ইচ্ছা আপনা হইতেই আসিয়া যোটে। তবেই হইতেছে যে, বর্ত্তিয়া থাকিবার ইচ্ছা আত্মসত্তার প্রকাশের সঙ্গের সঙ্গী। ইহা হইতে আমরা পাইতেছি এই যে, আত্মসত্তার প্রকাশ যখন সকলেতেই ন্যূনাধিক পরিমাণে আছে, তখন বর্ত্তিয়া থাকিবার ইচ্ছাও সকলেরই ন্যূনাধিক পরিমাণে আছে। বর্ত্তিয়া থাকিবার ইচ্ছা যখন সকলেরই ন্যূনাধিক পরিমাণে আছে, তখন তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, আত্মসত্তা সকলেরই আনন্দের আস্পদ। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে যে, তত্বজ্ঞানের কথাপ্রসঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি জনক-রাজাকে বলিয়াছিলেন—

"এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।"

ইহার অর্থ :—

ব্রহ্মরসামৃতপানে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির অন্তঃকরণে যেরূপ ভরপুর আনন্দ বিরাজ করে, তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রসাদবিন্দু'র বলে অন্যান্য জীবেরা জীবন ধারণ করে :—ভাব এই যে, স্থির সমুদ্রে যেমন চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পরিষ্কার নিজমূর্ত্তিতে প্রকাশ পায়, সত্ত্বপ্রধান মনুষ্যের শান্ত-সমাহিত চিত্তে তেমনি আত্মসত্তার রসাস্বাদন-জনিত আনন্দ পরিষ্কার নিজমূর্ত্তি ধারণ করে; আবার, তরঙ্গিত নদীস্রোতে চন্দ্রের প্রতিমা যেমন শতধা বিক্ষিপ্ত হইয়া ভাঙা ভাঙা ভাবে প্রকাশ পায়, পশ্বাদি জন্তুদিগের রজঃপ্রধান অন্তঃকরণে তেমনি গোড়ার সেই অখণ্ড আনন্দের আভাস শতধা বিক্ষিপ্ত হইয়া ক্ষণভঙ্গুর বিষয়সুখে পর্য্যবসিত হয়।

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, সত্ত্বগুণের যে দুইটি প্রধান পরিচয়লক্ষণ—প্রকাশ এবং আনন্দ, তাহা কী জ্ঞানবান্ মনুষ্য, কী পশ্বাদি মূঢ় জীব, কী ধাতুপ্রস্তরাদি জড়বস্তু—সকলেরই মধ্যে ন্যূনাধিক মাত্রায় বিদ্যমান আছে।

সত্ত্বগুণের এই যে দুইটি প্রধান পরিচয়লক্ষণ—কিনা সত্তার প্রকাশ এবং সত্তার রসাস্বাদন-জনিত আনন্দ, এ দুইটি ছাড়া সত্ত্বগুণের আর একটি পরিচয়লক্ষণ আছে;—সেটাও দেখা চাই; সেটি হচ্চে সত্তার আত্মসমর্থনী শক্তি। রূপকচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে আনন্দ সত্ত্বগুণের হৃদয়, প্রকাশ সত্ত্বগুণের বাম হস্ত, আত্মসমর্থনী-শক্তি (সংক্ষেপে আত্মশক্তি) সত্ত্বগুণের দক্ষিণ হস্ত। এই স্থানটিতে সত্ত্বগুণের গোড়ার বৃত্তান্তটি আর একবার ভাল করিয়া পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক।

প্রথম দ্রষ্টব্য এই যে, সত্তার প্রকাশেই সত্তার আত্মসমর্থন হয়;

কেন না প্রকাশ ব্যতিরেকে সত্তা সত্তাই হয় না। তবেই হইতেছে যে, সত্তার প্রকাশের মধ্যেই সত্তার আত্মসমর্থনী শক্তি সম্ভুক্ত রহিয়াছে।

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য এই যে, সত্তার প্রকাশের সঙ্গে যে পর্য্যন্ত না সত্তার আত্মসমর্থনী শক্তি একযোগে প্রকাশ পায়, সে পর্য্যন্ত প্রকাশের মাত্রা পূর্ণ হয় না। ফল কথা এই যে, "আমি ভূতকাল হইতে এ যাবৎ কাল পর্য্যন্ত বর্ত্তিয়া আছি" এই বর্ত্তিয়া থাকা ব্যাপারটি যখন দ্রষ্টা পুরুষের জ্ঞানে প্রকাশ পায়, তখন সে-যে প্রকাশ তাহা প্রকাশের নবোন্মেষ মাত্র—অরুণোদয় মাত্র; কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটি বৃত্তান্ত যগন প্রকাশ পায়,—এটাও যখন প্রকাশ পায় যে, যে প্রকারে আত্মশক্তি খাটাইয়া আমি ভূতকালের বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমানে দণ্ডায়মান হইয়াছি, সেই প্রকারে আত্মশক্তি খাটাইয়া ভবিষ্যতে দণ্ডায়মান হইতে পারা আমার অধিকারায়ত্ত; এইরূপে যখন সত্তার সঙ্গে শক্তি একযোগে প্রকাশ পায়, তখন সত্তা এবং শক্তির সেই যে সমবেত প্রকাশ, তাহাতেই প্রকাশের মাত্রা পূরণ হয়, আর, সেই সঙ্গে আনন্দেরও মাত্রা পূরণ হয়। "আনন্দেরও মাত্রা পূরণ হয়" বলিতেছি এই জন্যে, যেহেতু আধ-পেটা অন্নভোজনে যেমন ক্ষুধিত ব্যক্তির উদর পূরণ হয় না, তেমনি "আমি ভূতকাল হইতে এ যাবৎ কাল পর্য্যন্ত বর্ত্তিয়া আছি" এই অর্দ্ধবৃত্তান্তটিতে আনন্দের মাত্রা পূরণ হয় না;—আনন্দের ভিতরের কথা এই যে, আত্মসত্তা যেমন ভূতকাল হইতে এ যাবৎকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তিয়া আছে—ভবিষ্যতেও তেমনি তাহা চিরজীবী হইয়া বর্ত্তিয়া থাকুক্। এইজন্য আত্মসত্তার সঙ্গে যখন ভবিষ্যতে বর্ত্তিয়া থাকিবার যোগ্যতা বা আত্মসমর্থনী শক্তি একযোগে প্রকাশ পায়, তখন আনন্দের অর্দ্ধমাত্রা

পূর্ণমাত্রায় পদনিক্ষেপ করে। এই স্থানটির সহিত ডারুইনের মুখ্য সিদ্ধান্তটি দিব্য সংলগ্ন হয়। সে সিদ্ধান্ত এই যে, জীবজগতে ভূতকালের জীবনসংগ্রামের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান সত্তা যখন যাহা উদ্বৃত্ত হয়, তাহা দীনহীন সত্তা নহে, পরন্তু তাহা যোগ্যতম সত্তা; সত্তার উদ্বর্ত্তন যোগ্যতমেরই উদ্বর্ত্তন Survival of the fittest। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, ডারুইনের মতে সত্তার উদ্বর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মসমর্থনের যোগ্যতার অভ্যুদয় হয়—আত্মসমর্থনী শক্তির অভ্যুদয় হয়। ডারুইনের প্রদর্শিত এই যে এক মহা-নাট্য—কি না সত্তার উদ্বর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মসমর্থনী শক্তির উদ্বোধন—এ নাট্য অভিনীত হয় জীবজগতের সর্ব্বত্রই; কিন্তু পশ্বাদি জন্তুরা এই পরমাশ্চর্য্য নাট্যলীলার রসাস্বাদনে একেবারেই বঞ্চিত—এ নাট্যলীলার দর্শক পৃথিবীস্থ সারারাজ্যের জীবদিগের মধ্যে অ্যাকা কেবল মনুষ্য। কেননা মনুষ্যই সত্ত্বগুণপ্রধান জীব, আর, প্রকাশ সত্ত্বগুণেরই ধর্ম্ম। মনুষ্যের ন্যায় সত্ত্বগুণপ্রধান জীবের অন্তঃকরণেই আত্মসত্তা এবং আত্মসত্তার প্রিয়সখী আত্মসমর্থনী শক্তি উভয়েই পরিষ্কার জ্ঞানালোকে প্রকাশ পায়। পক্ষান্তরে, পশ্বাদি জন্তুদিগের রজঃপ্রধান অন্তঃকরণে আত্মসত্তা এরূপ ঝাপ্‌সা আলোকে প্রকাশ পায় যে, তাহা প্রকাশ না পাওয়ারই মধ্যে। অর্থাৎ মনুষ্যের সজ্ঞান অবস্থার চিৎপ্রকাশ বলিতে যেরূপ চিৎপ্রকাশ বুঝায়, পশ্বাদি জন্তুদিগের অন্তঃকরণস্থিত চিৎপ্রকাশ সেরূপ জাগ্রত ভাবের চিৎপ্রকাশ নহে। ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, কোনোপ্রকার বাধানুভূতির উত্তেজনায় যখন পশ্বাদি জন্তুদিগের অন্তঃকরণে চিদাভাস উদ্দীপ্ত হইয়া তাহাদিগকে কর্ম্মচেষ্টায় প্রবর্ত্তিত করে, তখন উপস্থিত বাধার প্রতি-বিধানকার্য্যেই তাহাদের সমস্ত চিৎপ্রকাশ গ্রস্ত হইয়া যায়; তা বই,

সুখদুঃখের ছায়াবাজির পর্দ্দার ওপিঠে প্রকাশ এবং আনন্দের যে এক বাঁধা রোসনাই রহিয়াছে, তাহা তাহাদের দৃষ্টিক্ষেত্রে ধরা দ্যায় না।

ডারুইনের প্রদর্শিত ঐ যে মহানাট্য উহা বহির্জগতের আম্‌দরবারে অভিনীত হয়, আর সেই জন্য অধুনাতন কালের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা উহার সবিশেষ মর্য্যাদাভিজ্ঞ। তা ছাড়া, আর এক নাট্য যাহা মনুষ্যের অন্তর্জগতের খাস্‌দরবারে অভিনীত হয় তাহা কম মহানাট্য নহে;—আমাদের দেশের পুরাতন তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা এই দ্বিতীয় মহানাট্যের সবিশেষ মর্য্যাদাভিজ্ঞ ছিলেন ইহা বলা বাহুল্য। পূর্ব্বোক্ত মহানাট্যে বাহ্য প্রকৃতির অন্তর্নিগূঢ় সত্ত্বগুণ রজস্তমোগুণের বাধা অতিক্রম করিয়া কিরূপে জড়রাজ্যের বিদেশ হইতে মনুষ্য-রাজ্যের স্বদেশে উপনীত হয়, এই বৃহদ্ব্যাপারটির অভিনয় হয়। শেষোক্ত মহানাট্যে মনুষ্যের অন্তর্নিগূঢ় সত্ত্বগুণ রজস্তমোগুণের বাধা অতিক্রম করিয়া কিরূপে অন্নময় কোষের প্রবাস হইতে আনন্দময় কোষের নিবাসে উপনীত হয়, এই নিগূঢ় রহস্যটির অভিনয় হয়। বর্ত্তমান স্থলে শেষোক্ত মহানাট্যের মর্ম্মস্থানীয় ব্যাপারগুলি পরিষ্কাররূপে বিবৃত করিয়া দেখানোই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য;—তাহারই এক্ষণে চেষ্টা দেখা যাইতেছে।

বলিলাম যে, আত্মসত্তার প্রকাশের সঙ্গে আত্মশক্তির প্রকাশ হইলে—তবেই আনন্দের মাত্রা পূর্ণ হয়। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, সত্তার প্রকাশ হয় জ্ঞানযোগে—শক্তির প্রকাশ হয় কর্ম্মযোগে। আত্মসত্তা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না পরিষ্কার জ্ঞানালোকে অভ্যুত্থান করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যেমন আত্মসত্তার প্রকাশ সম্যক্ পর্য্যাপ্তি লাভ করে না, আত্মশক্তি তেমনি যতক্ষণ না মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠানে উদ্যোগী হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা বিরাট-রাজার অন্তঃপুরচারী বৃহন্নলার ন্যায় অপরিজ্ঞাত থাকে।

পক্ষান্তরে, বৃহন্নলা-সারথী যেমন কুরুসেনা জয় করিয়া—তিনি যে কিরূপ অজেয় সারথী তাহার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তেমনি মনুষ্যের আত্মশক্তি অন্তরের রিপুজয় করিয়া—সে যে কিরূপ অজেয় শক্তি তাহার পরিচয় প্রদান করে। উপস্থিত বাধার প্রতিবিধান-কার্য্য—কি মনুষ্য কি পশ্বাদি জন্তু—সকল জীবকেই বাধ্য হইয়া করিতে হয়; কাজেই সেরূপ কার্য্য জীবের অশক্তিরই পরিজ্ঞাপক। পক্ষান্তরে, মনুষ্য যখন মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া অন্তরতম আনন্দের নিগূঢ় অভিপ্রায় সমর্থন করে, তখন সে-যাহা সে করে তাহা ভিতুর-হইতে করে; তা বই, বাহিরের কোনোকিছু দ্বারা বাধ্য হইয়া করে না। এইরূপ কার্য্যই মনুষ্যের স্বশক্তির পরিচায়ক—আত্মশক্তির পরিচায়ক। দিবালোক অবশ্য সূর্য্য হইতেই আসে, তা বই, তাহা মনুষ্যের আত্মশক্তি হইতে আসে না; কিন্তু তা বলিয়া এটা ভুলিলে চলিবে না যে, গৃহবাসী ব্যক্তি যতক্ষণ পর্য্যন্ত হস্তপদ পরিচালনা করিয়া ঘরের জাল্‌না-দর্‌জা উদ্ঘাটন না করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত দিবালোক তাহার ভোগে আসে না। প্রকৃত কথা এই যে, দুই হাত নহিলে তালি বাজে না;—এটা যেমন সত্য যে, দিবালোক প্রেরণ করা সূর্য্যের কার্য্য, এটাও তেমনি সত্য যে, দিবালোকের বাধা অপসারিত করা গৃহবাসীর কার্য্য।

দিবালোকের প্রেরণকর্ত্তা যেমন সূর্য্য, সত্ত্বগুণের প্রেরণকর্ত্তা তেমনি পরমাত্মা। পার্থিব অগ্নির আলোকের মূলাধার যে সূর্য্যের আলোক ইহা বিজ্ঞানের একটি নবতম সিদ্ধান্ত। কিন্তু সূর্য্যের আলোক যেমন পরম পরিশুদ্ধ আলোক, পার্থিব অগ্নির আলোক সেরূপ নহে; পার্থিব অগ্নির আলোকে ইন্ধনের দোষগুণ কোনো-না-কোনো আকারে দেখা দিতে ছাড়ে না। মনুষ্যের অন্তঃকরণে তেমনি সত্ত্বগুণ

রজস্তমোগুণের বাধায় আক্রান্ত, আর আত্মশক্তির কার্য্য হ'চ্চে সেই সকল বাধা অপসারিত করিয়া দেবপ্রসাদের আগমন-পথ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া। আত্মপ্রভাবের সহিত দেবপ্রসাদের কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সেইটি এখানে বিশেষ মতে প্রণিধান করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। কর্ষিত ক্ষেত্রে বৃষ্টির জল কর্দ্দমাক্ত হইয়া যায়; আর, সেই কর্দ্দমাক্ত ঘোলা জলের গুণে উপ্ত ধান্য-বীজ যথাসময়ে অঙ্কুরিত হয়—ইহা খুবই সত্য; কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও তেমনি সত্য যে, সেই কর্দ্দমাক্ত ঘোলা জলের মধ্য হইতে মেঘনির্ম্মুক্ত বিশুদ্ধ জল কোথাও পলাইয়া যায় না; পলাইয়া যাওয়া দূরে থাকুক্—তাহা সেই কর্দ্দমাক্ত ঘোলাজলের জলত্ব-সাধন কার্য্যে ক্ষণকালের জন্যও ক্ষান্ত থাকে না। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, বৃক্ষের উৎপাদনে ঘোলা-জলের যেরূপ কার্য্যকারিতা—মঙ্গল-কার্য্যের উৎপাদনে আত্মপ্রভাবের সেইরূপ কার্য্যকারিতা; আর, ঘোলাজলের জলত্ব-সাধনে বিশুদ্ধ জলের যেরূপ কার্য্যকারিতা, আত্ম-প্রভাবের সামর্থ্য-সাধনে দেব-প্রসাদের সেইরূপ কার্য্যকারিতা অতীব সুস্পষ্ট। প্রথমে, দেবপ্রসাদে মনুষ্যের অন্তঃকরণে আত্মসত্তা প্রকাশিত হয়। তাহার পরে তাহার সঙ্গে আত্মসত্তার রসাস্বাদনজনিত আনন্দ আসিয়া যোটে। তাহার পরে সেই আনন্দের সঙ্গে আত্মসত্তার প্রকাশকে মোহমেঘ হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া তাহার ঔজ্জ্বল্য সাধন করিবার ইচ্ছা আসিয়া যোটে। তাহার পরে আত্মশক্তি মঙ্গলকার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা আত্মার প্রভাব পরিস্ফুট করিয়া আনন্দের অন্তরের অভিলাষকে পূরণ করে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সত্তার প্রকাশ হয় জ্ঞানযোগে, শক্তির প্রকাশ হয় কর্ম্মযোগে। "কর্ম্মযোগে" অর্থাৎ মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠানে। মঙ্গল-কার্য্যের পথপ্রদর্শক হচ্চে মনুষ্যের অন্তর্নিহিত সাত্ত্বিক আনন্দ।

যে কার্য্য সেই অন্তর্নিহিত বিমল আনন্দের অনুমোদিত, সংক্ষেপে অন্তরাত্মার অনুমোদিত, তাহাই মঙ্গল-কার্য্য—বা আত্মশক্তির কার্য্য; আর, তাহার বিপরীত শ্রেণীর কার্য্যই অমঙ্গল কার্য্য—বা অশক্তির কার্য্য। মহাভারতের বনপর্ব্বের ২০৬ অধ্যায়ে আছে—

"মূঢ়ানাং অবলিপ্তানাং অসারং ভাবিতং ভবেৎ।
দর্শয়ত্যন্তরাত্মা তং দিবারূপমিবাংশুমান্।"

ইহার অর্থ

মূঢ় গর্ব্বিত ব্যক্তিদিগের মনের যত কিছু ভাবনা-চিন্তা সমস্তই অসার; সূর্য্য যেমন দিবসের রূপ প্রদর্শন করে (অর্থাৎ দৃশ্য বিষয় সকল প্রদর্শন করে) অন্তরাত্মা তেমনি তাহাদের সেই সকল ভাবনা-চিন্তার অসারতা প্রদর্শন করে। মনুসংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে আছে

"যৎ কর্ম্ম কুর্ব্বতোঽস্য স্যাৎ পরিতোষোঽন্তরাত্মনঃ।
তৎপ্রযত্নেন কুর্ব্বীত বিপরীতং তু বর্জ্জয়েৎ॥"

ইহার অর্থ :—

যে কর্ম্ম করিলে সাধকের অন্তরাত্মা পরিতুষ্ট হয়, তিনি সেই কর্ম্ম প্রযত্ন সহকারে করিবেন, তদ্বিপরীত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন।

আমাদের দেশের পূর্ব্বতন কালের আচার্য্যেরা স্বভাষী ছিলেন, তাই তাঁহারা বলিয়াছেন—"অন্তরাত্মা মঙ্গল কার্য্যের পথপ্রদর্শক"; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, নব্য আচার্য্যেরা নিতান্তই পরভাষী (অর্থাৎ পরের বুলি বোল্‌নেওয়ালা)। এই জন্য, যদি বলা যায় যে, মঙ্গল-কার্য্যের পথ-প্রদর্শক conscience, তবে শেষোক্ত শ্রেণীর আচার্য্যেরা বলিবেন "খুব ঠিক!" কিন্তু যদি বলা যায় যে, মঙ্গল-কার্য্যের পথ-প্রদর্শক মনুষ্যের অন্তরাত্মা, তবে তাঁহারা হয় তো বলিবেন "অন্তরাত্মা বলিতেছ কাহাকে? আমরা তো জানি conscience শব্দের দেশীয়

প্রতিশব্দ বিবেক।" ইহার উত্তরে আমি বলি এই যে, তাহা তাঁহারা যেমন জানেন, তেমনি এটাও তাঁহাদের জানা উচিত যে, আমাদের দেশের স্বভাষী আচার্য্যগণের অভিধানে বিবেক-শব্দের অর্থ মূলেই conscience নহে। আমাদের দেশের পুরাতন শাস্ত্রকারদিগের মতে ত্রিগুণাত্মক তত্ত্বের সংস্পর্শ হইতে ত্রিগুণাতীত তত্ত্ব বিবিক্ত করিয়া লওয়াই বিবেকের মুখ্যতম কার্য্য। ইহাতে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, বিবেকের লক্ষ্য পাপপুণ্যের অধিকার-বহির্ভূত ত্রিগুণাতীত প্রদেশের প্রতিই নিবিষ্ট থাকে। পক্ষান্তরে conscience-এর লক্ষ্য পুণ্যপাপের অধিকারায়ত্ত প্রদেশের ভিতরেই নিয়ত আবদ্ধ থাকে, তাহার উর্দ্ধে যায় না। দুয়ের মধ্যে যখন এইরূপ মর্ম্মান্তিক প্রভেদ তখন বিবেককে conscience-এর প্রতিশব্দ করিয়া দাঁড় করানোও যা, আর কোনো যোগী মহাপুরুষকে ধরিয়া-বাঁধিয়া ইংরাজ সাজানোও তা—একই কথা। Kant প্রজ্ঞাকে (Reason কে) দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন Practical (অর্থাৎ Ethical) এবং Speculative (অর্থাৎ Theoretical)। এখন দ্রষ্টব্য এই যে পাশ্চাত্য ভাষায় consciousness শব্দ দার্শনিক জ্ঞানের (theoretical reason এর) যে স্থান অধিকার করে, conscience শব্দ ব্যাবহারিক জ্ঞানের (practical reason এর) বা নৈতিক জ্ঞানের (Ethical reason-এর) অবিকল সেই স্থান অধিকার করে। consciousness সাংখ্যের দ্রষ্টা পুরুষের ন্যায় উদাসীন সাক্ষী; তাহার চক্ষে ধর্ম্মও যেমন, অধর্ম্মও তেমনি, দুইই জ্ঞেয় বিষয় মাত্র—তাহার অধিক আর কিছুই নহে। পক্ষান্তরে, conscience পাপ-পুণ্যের সেরূপ উদাসীন সাক্ষী নহে। conscienceএর চক্ষে পুণ্য অনুরাগভাজন; পাপ বিরাগভাজন। Consciousness কেবল মাত্র দ্রষ্টা—তাহা

নিছক জ্ঞান। পরন্তু conscience দ্রষ্টা ভোক্তা এবং নিয়ন্তা তিনই একাধারে; conscience পাপপুণ্যের দ্রষ্টা এই অর্থে সাক্ষী পুরুষ, পাপপুণ্যের ভোক্তা তাই পুণ্যের প্রতি সুপ্রসন্ন এবং পাপের প্রতি অপ্রসন্ন; conscience পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা এবং পাপের শাস্তা এই অর্থে অন্তর্যামী পুরুষ; conscience আত্মপ্রকাশ, আত্মানন্দ, এবং আত্মশক্তি তিনই একাধারে, এই অর্থে অন্তরাত্মা। তাই আমাদের স্বদেশীয় ভাষার অন্তরাত্মা শব্দে conscienceএর মর্ম্মগত ভাবার্থটি যেমন খোলে এমন আর কোনো দেশীয় ভাষার কোনো শব্দে নহে। ইহা সত্ত্বেও আমাদের দেশের নব্য আচার্য্যেরা যে স্বভাষার অকৃত্রিম সৌন্দর্য্যের প্রতি ইচ্ছা করিয়া অন্ধ হইয়া পরভাষিত্ব-ব্রত অবলম্বন করেন, ইহা কম আক্ষেপের বিষয় নহে। আমরা একটু পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আনন্দ সত্ত্বগুণের হৃদয়, প্রকাশ সত্ত্বগুণের বামহস্ত এবং আত্মশক্তি সত্ত্বগুণের দক্ষিণ হস্ত। এখন বলিতে চাই এই যে, সত্ত্বগুণের সেই যে হৃদয়—কি না আত্মসত্তার রসাস্বাদনজনিত আনন্দ, তাহাই অন্তরাত্মার বসতি স্থান। মঙ্গলের অনুষ্ঠানে আত্মশক্তির কিরূপ কার্য্যকারিতা তাহার সন্ধান পাইতে হইলে, এই স্থানটির আদ্যোপান্ত বিশেষমতে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা আবশ্যক। আগামী বারে তাহারই চেষ্টা দেখা যাইবে।

অষ্টম অধিবেশন।

ব্যাখ্যান।

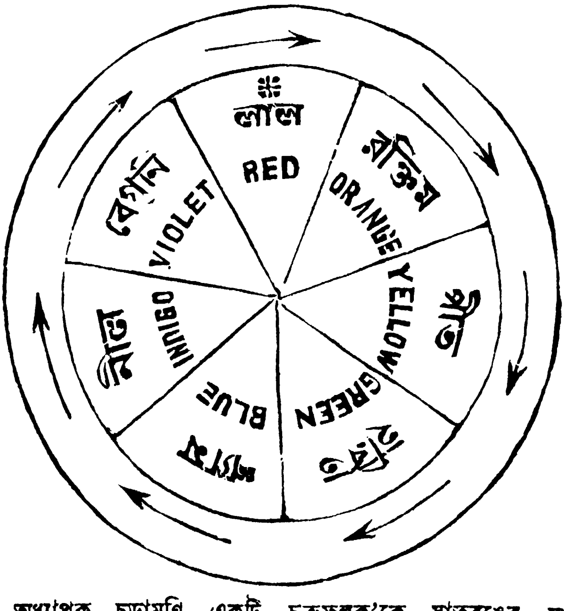
ত্রিগুণতত্ত্বের গোড়ার কথাটির অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইবার প্রথম উপক্রমে সত্ত্বগুণের দুইটি অবয়ব প্রধানতঃ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল—(১) সত্তার প্রকাশ এবং (২) সত্তা'র রসাস্বাদন-জনিত আনন্দ। তাহার পরে সত্ত্বগুণের আর-একটি অবয়ব সহসা আমাদের দৃষ্টিক্ষেত্রে নিপতিত হইল—(৩) সত্তা'র আত্মসমর্থনী শক্তি, সংক্ষেপে—আত্মশক্তি। ঐ তিনটি সত্ত্বাঙ্গের পরস্পরের সহিত পরস্পরের কিরূপ সহযোগিতা-সম্বন্ধ—বিগত প্রবন্ধাংশে আমি তাহার ঈষৎ আভাস মাত্র প্রদর্শন করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলাম;—বলিয়াছিলাম কেবল এইমাত্র যে,

আনন্দ সত্ত্বগুণের হৃদয়;
প্রকাশ সত্ত্বগুণের বামহস্ত;
আত্মশক্তি সত্ত্বগুণের দক্ষিণ হস্ত।

এই স্বল্প ইঙ্গিতটুকুর মধ্যে মনোনিবেশপূর্ব্বক তলাইয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাই যে, আত্মসত্তা'র প্রকাশ ঘটাইয়া তোলা একটা-শুধু মনোবৃত্তির অ্যাক্‌লার কার্য্য নহে;—চলন-কার্য্যের পক্ষে যেমন দুই পদের পরিচালনা সমান-আবশ্যক, সন্তরণ-কার্য্যের পক্ষে যেমন দুই হস্তের পরিচালনা সমান-আবশ্যক, আত্মসত্তার প্রকাশের পক্ষে তেমনি সাক্ষাৎ উপলব্ধি এবং স্মৃতি এই দুই বৃত্তির উভয়েরই পরিচালনা সমান আবশ্যক। আবার, চলন-কালে যেমন দুই পদ স্বভাবতই একযোগে কার্য্য করে, আত্মসত্তার প্রকাশকালে তেমনি সাক্ষাৎ উপলব্ধি এবং স্মৃতি উভয়ে মিলিয়া স্বভাবতই একযোগে কার্য্য করে। ভূতপূর্ব্ব বিষয়ের স্মরণ কিরূপে বর্ত্তমান বিষয়ের সাক্ষাৎ উপলব্ধির সঙ্গে মিশিয়া

সাক্ষাৎ উপলব্ধি হইয়া দাঁড়ায়, তাহার গোটাদুই দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি—প্রণিধান কর।

বিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা যখন সাত রঙ্‌ এক সঙ্গে মিশিয়া কিরূপে সাদা রঙ্‌ হইয়া দাঁড়ায়, তাহা ছাত্রবর্গের প্রত্যক্ষগোচরে আনিতে ইচ্ছা করেন, তখন তাঁহারা তাঁহাদের সেই অভিপ্রেত কার্য্যটি নিষ্পাদন করেন এইরূপ সুকৌশলে :—



অধ্যাপক চূড়ামণি একটি চক্রফলক'কে সাতরঙের সাতটি কেন্দ্রোত্থপুচ্ছাকৃতি খণ্ডে বিভক্ত করিয়া যন্ত্রযোগে দ্রুতবেগে ঘুরাইতে থাকেন, আর, তাহারই গুণে সাতরঙ এক সঙ্গে মিশিয়া ছাত্রবর্গের চক্ষের সম্মুখে সাদা রঙে পরিণত হয় (ক্ষেত্র দেখ)। তারা-চিহ্নিত চূড়াস্থানটিতে প্রথমে ছিল ঘূর্ণায়মান চক্রটা'র বেগ্‌নি খণ্ড, তাহার

পরে আসিল নীলখণ্ড, তাহার পরে শ্যাম খণ্ড, তাহার পরে হরিত খণ্ড, তাহার পরে পীত খণ্ড, তাহার পরে রক্তিম খণ্ড। এইরূপে ঐ তারা-চিহ্নিত চূড়াস্থানটিতে ছয় রঙের ছ'খণ্ড একে একে আসিয়া ওখান হইতে ঘুরিয়া গেল যেম্নি-মাত্র, তৎক্ষণাৎ অম্নি লাল-খণ্ডটি ঐ স্থান অধিকার করিল। তারা-চিহ্নিত চূড়াস্থানে লাল-খণ্ডটি যখন উপস্থিত, তখন দর্শক ঐ স্থানটিতে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতেছে শুদ্ধ কেবল লাল-রঙ, তা ছাড়া আর কোনো রঙ নহে; কিন্তু, হইলে কি হয়—আর-ছয়টা রঙের সব-ক'টাই দর্শকের স্মরণের খিড়কি দ্বার দিয়া সাক্ষাৎ উপলব্ধি-ক্ষেত্রে চুপি চুপি প্রবেশ করিয়া লালরঙের সঙ্গে জোড়া লাগিয়া গেল। লাল, তাই, এক্ষণে আর লাল নাই—লাল এক্ষণে দর্শকের চক্ষে সাদা। চূড়াস্থানের এ যেমন দেখা গেল—সব স্থানেরই ঐ দশা; ঘূর্ণায়মান চক্রফলকটা'র ব্যাপ্তিস্থানের প্রত্যেক বিভাগেই সব-ক'টা রঙ স্মরণ এবং সাক্ষাৎ উপলব্ধির যোগে প্রতিমুহূর্ত্তে একসঙ্গে জড়ো হইয়া সাদা রঙে পরিণত হইতেছে। এরূপ স্থলে স্মরণ স্মরণ-মাত্র হইয়াই ক্ষান্ত থাকে না—স্মরণ সাক্ষাৎ উপলব্ধির পদে আরূঢ় হয়। এটা চাক্ষুষ দৃষ্টান্ত;—ইহারই জুড়ি ধাঁচার আর-একটি দৃষ্টান্ত আছে—সেটা শ্রৌত দৃষ্টান্ত; সেটাও দেখা উচিত। সেটা এই :—

তুমি যখন মুখে উচ্চারণ করিতেছ "শ্রী" এই একটিমাত্র শব্দ, তখন তোমার শ্রবণগোচরে প্রথমে উপস্থিত হইয়াছে শ্, তাহার পরে র্, শেষে উপস্থিত হইল ঈ। ঈ যখন তোমার শ্রবণে উপস্থিত, তখন

[নীলমণি এবং শ্যামচাঁদ দুই নামই শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ-পরিচায়ক; তা'ছাড়া কালিদাস একস্থানে আকাশের বিশেষণ দিয়াছেন অসি-শ্যাম অর্থাৎ তলোয়ারের মতো শ্যামবর্ণ। আকাশের বর্ণ ইংরাজি ভাষায় *blue*। আকাশের বর্ণকে শ্যাম বলাও যাইতে পারে, নীল বলাও যাইতে পারে, কিন্তু *indigo*'কে নীল ভিন্ন শ্যাম বলা যাইতে পারে না।]

শ্ এবং র্ উভয়েই তোমার স্মরণের গিড়্কি-দ্বার দিয়া চুপি চুপি সাক্ষাৎ উপলব্ধি-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ঈ'র সঙ্গে দিব্য অবলীলা-ক্রমে মিশিয়া গিয়াছে; আর সেই গতিকে তুমি ঈ শুনিবামাত্রই তাহার পরিবর্ত্তে "শ্রী" শুনিতেছ। এই দৃষ্টান্তের পরিষ্কার আলোকে এটা এখন বেস্ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, আত্মসত্তার উদ্দ্যোতনে সাক্ষাৎ উপলব্ধিরও যেমন, স্মরণেরও তেমনি, দুয়েরই কার্য্যকারিতা সমান। একটি বিষয় কিন্তু এখনো বুঝিতে বাকি আছে—সেটা হ'চ্চে এই যে, সাক্ষাৎ উপলব্ধির সঙ্গে স্মরণের সংযোগ ঘটে কিরূপে? এ প্রশ্নের সোজা উত্তর এই যে, সংযোগ ঘটে আত্মশক্তির বলে। আত্মসত্তার উদ্দ্যোতনের অর্থই হ'চ্চে আত্মসমর্থন—তাহা আত্মসমর্থনী শক্তিরই কার্য্য। যখন আমরা চলিতে আরম্ভ করি তখন স্বভাবতই আমাদের দুই পা একযোগে কার্য্য করে দেখিয়া আমাদের মনে হইতে পারে যে দুই পা'য়ের চলনের মধ্যে যোগ রক্ষা করিবার জন্য চলনকর্ত্তার কোনো-প্রকার শক্তি খাটাইবার প্রয়োজন হয় না। আমাদের মনে হয় বটে ঐরূপ; কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারি যে, বিনা শক্তিতে কোনো কার্য্যই সম্ভবে না। এমন কি, সমস্ত দিন আমরা যে, ঘাড় উঁচা করিয়া বসি দাঁড়াই এবং চলাফেরা করি, এই সহজ কার্য্যটিতেও আমাদের শক্তি খাটে কম না। তার সাক্ষী—একঘেয়ে পুরাতন কথার অজস্র ধারা শুনিতে শুনিতে সভার মাঝখানে যখন কোনো শ্রোতার নিদ্রাকর্ষণ হয়, তখন তাঁহার গ্রীবোন্নামনী শক্তির উদ্যম শিথিল হওয়া গতিকে তৎক্ষণাৎ তাঁহার ঘাড় ঢলিয়া পড়ে। ইহাতেই অ্যাক-ইঙ্গিতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, সাক্ষাৎ উপলব্ধির সঙ্গে স্মরণ জোড়া দিয়া প্রকাশ ঘটাইয়া তোলা বিনা-শক্তিতে সম্ভাবনীয় নহে;—তাহা আত্মশক্তিরই কার্য্য তাহাতে ভুল নাই।

তবে এটা সত্য যে, প্রথম উদ্যমে আত্মশক্তি দ্রষ্টা পুরুষের চক্ষে আপনাকে ধরা দ্যায় না। প্রথম উদ্যমে, সন্ধিসূত্রে যেমন দ্রবীভূত শর্করা-রাশির মধ্যে ঢাকা থাকিয়া চারিদিক্ হইতে নিঃশব্দে পরমাণু সঙ্গ্রহ করিয়া বিচিত্র স্ফাটিক ব্যূহ (মিছ্‌রি) নির্ম্মাণ করে, আত্মশক্তি তেমনি প্রকৃতি গর্ভে লুকাইয়া থাকিয়া বর্ত্তমানমুখী সাক্ষাৎ উপলব্ধি এবং ভূতমুখী স্মৃতি এই দুই বিভিন্নমুখী মনোবৃত্তিকে এক সূত্রে বাঁধিয়া সেই জোড়া-মনোবৃত্তি'কে আত্মসত্তা'র উদ্দ্যোতন-কার্য্যে সমভাবে নিয়োজিত করে। প্রথম উদ্যমে, এইরূপ, আত্মশক্তি প্রকৃতি-গর্ব্ভে তমসাচ্ছন্ন থাকিয়া ভস্মাচ্ছাদিত অনলের ন্যায় অলক্ষিতভাবে কার্য্য করে। দ্বিতীয় উদ্যমে, আত্মশক্তি আত্মসত্তা'র প্রকাশের সঙ্গে প্রকাশে অভ্যুত্থান করিয়া আত্মসত্তা'র নৈবেদ্যের ডালা হইতে রজস্তমোগুণের আবরণ সরাইয়া ফেলিয়া দ্রষ্টাপুরুষের আনন্দ-বর্দ্ধন করে।

আত্মশক্তির দুই উদ্যমের কথা এ যাহা আমি বলিতেছি—এ কথা আমি কোথা হইতে পাইলাম? বেদ হইতে—না কোরাণ হইতে—না বাইবেল্ হইতে? তাহা যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে তাহার উত্তরে আমি বলি এই যে, আদিম শাস্ত্র বেদও নহে, কোরাণও নহে, বাইবেলও নহে।

আদিম শাস্ত্র আবার কোন শাস্ত্র?
তাহা জানো না?—
সে যে মহাশাস্ত্র!
তাহার নাম বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

এ শাস্ত্রের মূল গ্রন্থ দুই অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে আত্মশক্তির প্রথম উদ্যমের পুরাণ-কাহিনী যথাবিহিত স্পষ্টাক্ষরে আনুপূর্ব্বিক লেখা রহিয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আত্মশক্তির দ্বিতীয় উদ্যমের অভিনব

কাহিনী সেইরূপই স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হইয়া মানবমণ্ডলীর বংশপরম্পরার মুদ্রাযন্ত্র হইতে খণ্ডে খণ্ডে বাহির হইয়া মান্ধাতার আমল হইতে নিরবচ্ছেদে চলিয়া আসিয়াছে এবং আরো যে কত যুগযুগান্তর চলিবে তাহা কে বলিতে পারে? এই দুই অধ্যায়ের ব্যাখ্যাকার্য্য আমাদের দেশের পুরাকালের তত্ত্বজ্ঞ আচার্য্যেরা সাধ্যমতে এক দফা করিয়া চুকিয়াছেন; এখন আবার—পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা সেই পুরাতন, অথচ নিত্য-নূতন, শাস্ত্রের ব্যাখ্যা-কার্য্যের অনুষ্ঠানে কোমর বাঁধিয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। জীবদিগের অজ্ঞাতসারে ভস্মাচ্ছাদিত অনলের ন্যায় তলে তলে কার্য্য করিয়া—জীবেরা যাহাতে যথাকালে মনুষ্যত্বের ব্রহ্মডাঙায় তমোগুণের মৃত্তিকার উপরে দুই পায়ের ভর দিয়া এবং সত্ত্বগুণের মুক্ত আকাশে মাথা উঁচা করিয়া গৌরবের সহিত দাঁড়াইতে পারে তাহার প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া—আত্মশক্তি কিরূপ সুকৌশলে রজোগুণের শাণিত অস্ত্র দিয়া রজস্তমোগুণের বাধা অল্পে অল্পে অপসারণ করে—কাঁটা দিয়া কাঁটা উন্মোচন করে, আত্মশক্তির এই প্রথম উদ্যমের ব্যাপারটি প্রথম অধ্যায় আমাদিগকে শিক্ষা দ্যায়; আর মনুষ্যের জ্ঞানগোচরে আত্মশক্তি কিরূপে রজস্তমোগুণের বাধা অতিক্রম করিয়া তাহার অন্তঃকরণে সাত্ত্বিক প্রকাশ এবং আনন্দের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দ্যায়—আত্মশক্তির এই দ্বিতীয় উদ্যমের ব্যাপারটি দ্বিতীয় অধ্যায় আমাদিগকে শিক্ষা দ্যায়। দুই অধ্যায় এক সঙ্গে মিলিয়া সমস্বরে এই একটি নিগূঢ় রহস্যের সন্ধান আমাদের নিকটে জ্ঞাপন করিতেছে যে, প্রথম উদ্যমে, জীবের আত্মশক্তি পরমাত্মার হস্তে বিধৃত থাকে; দ্বিতীয় উদ্যমে তাহা জীবাত্মার হস্তে বিধিমতে সমর্পিত হয়। এই কথাটির মর্ম্মের ভিতরে একটু মনোনিবেশপূর্ব্বক তলাইয়া দেখা আবশ্যক। অতএব তাহাতেই এক্ষণে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

একটু পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, আত্মসত্তার প্রকাশ-সংঘটনে সাক্ষাৎ উপলব্ধি এবং স্মরণ দুয়েরই কার্য্যকারিতা সমান; এটাও দেখিয়াছি যে, স্মরণ সাক্ষাৎ উপলব্ধির সঙ্গে মিশিয়া সাক্ষাৎ উপলব্ধিরই সামিল হইয়া যায়, আর, তাহা যখন হয় তখন সাক্ষাৎ উপলব্ধি এবং স্মরণের মধ্যে, মূলেই কোনো প্রভেদ থাকে না। আমরা যখন সঙ্গীত শ্রবণ করি, তখন শ্রূয়মাণ গীতের নানা স্বরাঙ্গ এক-এক মুহূর্ত্তে এক-একটি করিয়া আমাদের কর্ণে উপস্থিত হয়, আর যে-সুরটি যে-মুহূর্ত্তে আমাদের কর্ণে উপস্থিত হয় সেই-সুরটিই কেবল আমরা সেই মুহূর্ত্তে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপলব্ধি করি। কিন্তু হইলে কি হয়—সাক্ষাৎ উপলব্ধির যে-একটি কনিষ্ঠা ভগ্নী আছে—যাহার নাম স্মৃতি—সাক্ষাৎ উপলব্ধির সেই সহবৃত্তিটি ভূতকাল হইতে নানা সুর যোটপাট করিয়া আনিয়া সমস্ত দলবল সমভিব্যাহারে সাক্ষাৎ উপলব্ধির কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া তাহার সঙ্গে মিশিয়া একীভূত হইয়া যায়, আর, সেই গতিকে, প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা গানই শ্রবণ করি, তা বই কোনো মুহূর্ত্তে আমরা যূথভ্রষ্ট একটিমাত্র সুর শ্রবণ করি না। সঙ্গীতশ্রবণের ব্যাপারটি আদ্যোপান্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাই এই :—

গায়কচূড়ামণি আত্মশক্তির প্রভাবে শ্রোতার সাক্ষাৎ উপলব্ধি এবং স্মরণের উপরে একযোগে কার্য্য করিয়া শ্রোতার জ্ঞানগোচরে বিশেষ কোনো একটি রাগের বা রাগিণীর রূপ প্রকাশ করেন, আর, সেই প্রকাশের মধ্য দিয়াই শ্রোতা গীয়মান স্বরলহরীর মাধুর্য্যরস আস্বাদন করিয়া আনন্দ লাভ করেন। প্রথম উদ্যমে শ্রোতা অজ্ঞাত-সারে আত্মশক্তি খাটাইয়া স্মরণ এবং সাক্ষাৎ উপলব্ধির যোগে গায়কের কণ্ঠনিঃসৃত গানটি মুগ্ধভাবে শ্রবণ করেন; দ্বিতীয় উদ্যমে,

সজ্ঞানভাবে অর্থাৎ বুদ্ধিপূর্ব্বক আত্মশক্তি খাটাইয়া সেই গানটির সাধ্যানুসারে পুনরাবৃত্তি করেন। পুনরাবৃত্তি করেন কেন? না যেহেতু সে গানটি তাঁহার বড্ড ভাল লাগিয়াছে—গানের রসাস্বাদন-জনিত আনন্দই পুনরাবৃত্তি-কার্য্যটির প্রবর্ত্তক এবং নিয়ামক। আনন্দকে পুনরাবৃত্তি-কার্য্যের নিয়ামক বলিতেছি এই জন্য—যেহেতু পুনরাবৃত্তি কার্য্যের কোনোস্থান যদি খাপছাড়া হয়, তবে সাধকের তৎক্ষণাৎ আনন্দের ব্যাঘাত হয়, আর তাহাতেই সাধক বুঝিতে পারেন যে, "এ জায়্গাটা ঠিক হইতেছে না"। সাধক যখন বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার পুনরাবৃত্তি-কার্য্যটি ঠিক্‌মাফিক হইতেছে না, তখন তিনি গায়কের নিকটে গমন করিয়া সাধের গানটি পুনঃ পুনঃ শ্রবণ মনন এবং নিদিধ্যাসন করেন; এইরূপ করিতে করিতে ক্রমে যখন তাঁহার অন্তরের আনন্দের সহিত পুনরাবৃত্তি-কার্য্যটির সুর মিলিয়া যায়, তখন তিনি আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করেন। বলিলাম "শ্রবণ মনন এবং নিদিধ্যাসন";—এরূপ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, প্রকাশ-সংঘটনের পক্ষে সাক্ষাৎ উপলব্ধি এবং স্মরণ দুইই যেহেতু সমান আবশ্যক, এই জন্য সঙ্গীতশিক্ষার পক্ষে শ্রবণ এবং মনন দুইই সমান আবশ্যক; আবার আত্মশক্তি খাটাইয়া সাক্ষাৎ উপলব্ধির সহিত স্মরণের যোগ বন্ধন করা যেহেতু প্রকাশ-সংঘটনের পক্ষে আবশ্যক—এই জন্য নিদিধ্যাসন দ্বারা শ্রবণ এবং মননকে একসূত্রে বাঁধিয়া একীভূত করা সঙ্গীতশিক্ষার পক্ষে আবশ্যক। গানের সম্বন্ধে এতগুলা কথা এ যাহা বলিলাম—এ সমস্তই কেবল একটা উপলক্ষমাত্র তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে। প্রকৃত কথা যাহা ব্যক্তব্য তাহা এই:—

এটা আমরা এখন বেস্ বুঝিতে পারিয়াছি যে, আত্মশক্তির কার্য্য-

কারিতায় সাক্ষাৎ উপলব্ধি এবং স্মরণ একসঙ্গে মিশিয়া একীভূত হইলে তবেই দ্রষ্টা পুরুষের অন্তঃকরণের বর্ত্তমান ক্ষেত্রে চিৎপ্রকাশের অভ্যুদয় হয়। এই সঙ্গে এটাও কিন্তু বোঝা উচিত যে, সাক্ষাৎ উপলব্ধিই মূল—স্মরণ তাহার একপ্রকার লেজুড়। রূপকচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে, সাক্ষাৎ উপলব্ধি ধ্বনি—স্মরণ প্রতিধ্বনি। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, দ্রষ্টা পুরুষের অন্তঃকরণে আদিম সাক্ষাৎ উপলব্ধি কোথা হইতে আইসে? এটা যখন স্থির যে, তাহা দ্রষ্টা পুরুষের নিজের শক্তি হইতে আসে না, তখন তাহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পরমাত্মার ঐশী শক্তিই তাহার একমাত্র প্রেরয়িতা। যদি সূর্য্য হইতে আলোক না আসিত তবে জীব-চক্ষু চক্ষুই হইত না ইহা বলা বাহুল্য। কালিদাস যদি বলেন যে, "আমি শুদ্ধ কেবল আত্মশক্তির বলে ঋতুসংহার রচনা করিয়াছি" তবে মোটামুটি-ভাবে তাঁহার মুখে সে কথা শোভা পাইতে পারে—ইহা খুবই সত্য; কিন্তু তাঁহার ঐ কথাটির ভিতরে একটু মনোনিবেশ-পূর্ব্বক তলাইয়া দেখিলে দর্শকের চক্ষে উহার অপ্রামাণিকতা ঢাকা থাকিতে পারে না। এ তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে যে, নানা ঋতুর নানা সৌন্দর্য্য যাহা তিনি পূর্ব্বে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার স্মরণে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল; তাহার পরে তিনি আত্মশক্তির বলে সেই স্মরণায়ত্ত ব্যাপারগুলির মধ্যে যথাভিরুচি যোগাযোগ ঘটাইয়া ঋতু-সংহার গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। কালিদাসের কবিতার গোড়ার সেই সাক্ষাৎ উপলব্ধির ব্যাপারটি যদি গণনার মধ্য হইতে সরাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহার এ কথা খুবই ঠিক যে, তিনি কেবল মাত্র আত্মশক্তির বলে ঋতুসংহার রচনা করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহার ও-কথাটি সত্য হইতে পারে না এই জন্য—যেহেতু গোড়া'র

সেই সাক্ষাৎ উপলব্ধির উপরে তাঁহার নিজের হস্ত যৎকিঞ্চিৎ যাহা ছিল তাহা না থাকারই মধ্যে। "তাঁহার নিজের হস্ত মূলেই ছিল না" না বলিয়া—বলিলাম "তাঁহার নিজের হস্ত যৎকিঞ্চিৎ যাহা ছিল তাহা না থাকারই মধ্যে" এরূপ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, বর্ত্তমান দৃষ্টান্তস্থলে যাহাকে বলা হইতেছে গোড়া'র সাক্ষাৎ উপলব্ধি তাহা অপেক্ষাকৃত গোড়া'র সাক্ষাৎ উপলব্ধি হইলেও তাহা আদিম সাক্ষাৎ উপলব্ধি নহে—অর্থাৎ সর্ব্বপ্রথমের সাক্ষাৎ উপলব্ধি নহে। আদিম সাক্ষাৎ উপলব্ধির সংঘটনকর্ত্তা স্বয়ং পরমাত্মা ভিন্ন আর কেহই হইতে পারে না। ফলে—সাক্ষাৎ উপলব্ধি যেহেতু স্মরণের গোড়া'র প্রতিষ্ঠাভূমি, কাজেই আদিম সাক্ষাৎ উপলব্ধির সংঘটনে স্মরণের কোনো প্রকার কার্য্যকারিতা থাকিতে পারে না। একটি সদ্যোজাত শিশুর সাক্ষাৎ উপলব্ধি-ক্ষেত্রে দিবালোক কিছুকাল ধরিয়া কার্য্য করিলে, তবে তাহা তাহার স্মরণে মুদ্রিত হয়; স্মরণে মুদ্রিত হইলে, আত্মশক্তি তলে তলে কার্য্য করিয়া স্মরণ এবং সাক্ষাৎ উপলব্ধির যোগে শিশুর জ্ঞানগোচরে দৃশ্যবস্তুসকলের নৈবেদ্যের ডালা অনাবৃত করে। সদ্যোজাত শিশুর স্মরণে দিবালোক রীতিমত মুদ্রিত হওয়া যেহেতু সময়সাপেক্ষ, এই জন্য সদ্যোজাত শিশু প্রথমে যখন আলোক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপলব্ধি করে, তখন তাহার সহিত স্মরণ মিশ্রিত থাকে না বলিয়া তাহা তাহার জ্ঞানের আয়ত্তের মধ্যে আসে না; আর, তাহা যখন তাহার জ্ঞানের আয়ত্তাধীন নহে, তখন তাহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে গোড়া'র সেই সাক্ষাৎ উপলব্ধির সংঘটনে তাহার নিজের কোনো হস্ত ছিল না। অতএব এটা স্থির যে আদিম সাক্ষাৎ উপলব্ধি পরমাত্মার ঐশীশক্তির বলেই মনুষ্যের অন্তঃকরণে জাগিয়া ওঠে। মনে কর একজন সঙ্গীতের ওস্তাদ সঙ্গীতরসে এমনি

মাতোয়ারা যে, লোকে তাহার নাম দিয়াছে গীতানন্দ সরস্বতী; এখন দ্রষ্টব্য এই যে, গীতানন্দ সরস্বতী যেমন আপনার গীতানন্দ শ্রোতৃবর্গের অন্তঃকরণে জাগাইয়া তুলিবার জন্য তাঁহাদের কর্ণে গীতসুধা বর্ষণ করেন—আনন্দস্বরূপ পরমাত্মা তেমনি আপনার আনন্দ জীবাত্মার অন্তঃকরণে জাগাইয়া তুলিবার জন্য সাত্বিক প্রকাশ প্রেরণ করেন। উপনিষদে তাই উক্ত হইয়াছে "রসো বৈ সঃ" রস তিনি নিশ্চয়ই। "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি" রস'কেই লাভ করিয়া জীব আনন্দিত হয়। "এষ হ্যেবানন্দয়তি"; পরমাত্মাই আনন্দ জাগাইয়া তোলেন। এ কথাগুলি কবির কল্পনামাত্র নহে—উহা ধ্রুব সত্য। সত্ত্বগুণপ্রধান জীবের অন্তঃকরণে (অর্থাৎ মনুষ্যের অন্তঃকরণে) ঐশী শক্তির বলে সাত্বিক প্রকাশ যাহা উদ্বোধিত হয়, তাহা বাস্তবিকই আনন্দের মূল-উৎস। তার সাক্ষী—কি মনুষ্য কি পশ্বাদি জন্তু সকল-জীবেরই ক্ষুধা-তৃষ্ণার সময়ে অন্নপানে আনন্দ হয়, কিন্তু জীব-রাজ্যে অ্যাকা কেবল মনুষ্যেরই সাত্বিক প্রকাশে বা জ্ঞানে আনন্দ হয়। কচি বালক কেমন অবলীলাক্রমে মাতৃভাষা শিখিয়া ফ্যালে ইহা সকলের দ্যাখ্যা কথা। দুই এক বৎসরের বালক মাতৃমুখোচ্চারিত কথা শুধু-কেবল কানে শুনিয়াই ক্ষান্ত থাকে না—পরন্তু তাহার ভাবের ভিতরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে। ক্ষুধাকালে মাতার স্তন্য-দুগ্ধ পান করিয়া সে যেমন আনন্দ লাভ করে—মাতৃবাক্যের ভাবসুধা পান করিয়া সে সেইরূপই বা ততোধিক আনন্দ লাভ করে। পরমাত্মার ঐশী শক্তি হইতে যেমন সূর্য্যালোক আসিয়া নির্জীব জগৎকে সজীব করিয়া তোলে—অন্ধ জগৎকে চক্ষুষ্মান্ করিয়া তোলে—অচেতন জগৎকে সচেতন করিয়া তোলে, তেমনি, সেই সঙ্গে সাত্বিক প্রকাশ (অর্থাৎ গোড়া'র সাক্ষাৎ উপলব্ধি)

অবতীর্ণ হইয়া আবালবৃদ্ধ মনুষ্যের অন্তঃকরণে বিমল আনন্দের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দ্যায়। ঈশ্বর-প্রেরিত সত্ত্বগুণ শুধু যে কেবল জ্ঞান এবং আনন্দের গোড়া'র সূত্র তাহা নহে—তাহা ধর্ম্মেরও গোড়ার সূত্র। কচি বালকেরা তাহাদের মাতাপিতা ভ্রাতাভগ্নী এবং পার্শ্ববর্ত্তী আর আর লোকের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আপনার সত্তার নবোদিত প্রকাশের সঙ্গে সুর মিলাইয়া তাঁহাদের সবাইকার সত্তার রসাস্বাদন করে, আর তাহাতেই তাহাদের আনন্দ হয়; তার সাক্ষী তাহারা ধাত্রীর বা মাতাপিতার বা ভ্রাতাভগ্নীর আদর-বাণী শুনিলে কেমন সুমধুর হাস্য করে তাহা কাহারো অবিদিত নাই। তাহাদের অকৃত্রিম সরল হৃদয়ের নিকটে সকলেই আত্মতুল্য—অথচ তাহারা গীতাশাস্ত্রের বা বাইবেলের এক ছত্রও পাঠ করে নাই। এই-রূপ সমদর্শিতা এবং সমব্যথিতাই ধর্ম্মের গোড়া'র কথা। এখন দেখিতে হইবে এই যে, গীতানন্দ সরস্বতীর কণ্ঠ-নিঃসৃত গান যেমন নিখুঁত, শিক্ষার্থী সাধকের কণ্ঠ-নিঃসৃত গান সেরূপ নিখুঁত হওয়া দূরে থাকুক, তাহা নানাপ্রকার বাধায় জড়িত। শিক্ষার্থী সাধককে কিছুদিন ধরিয়া গান সাধিতে হইবে—তাল মান সুর ঠিক মতে হৃদয়-ঙ্গম করিয়া তাহা কণ্ঠ দিয়া বাহির করিতে হইবে—এইরূপ আর আর নানাবিধ কার্য্য হাতে-কলমে করিতে হইবে যাহা সহজে হইবার নহে। শিক্ষার্থী ব্যক্তি সঙ্গীতবিদ্যার তীর্থযাত্রী;—কাজেই, গন্তব্য পথের বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে গম্যস্থানে উপনীত হইতে হইবে।

পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, পরমাত্মা সমষ্টি সৎ সুতরাং তাঁহার সত্তা সত্ত্বগুণের নিদান, আর তাঁহার শক্তিরূপী সেই আদিম এবং সনাতন সত্ত্বগুণ রজস্তমোগুণের বাধায় জড়িত নহে বলিয়া আমাদের দেশের প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞানশাস্ত্রে তাহা শুদ্ধ সত্ত্ব বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

পক্ষান্তরে ব্যষ্টিসত্তামাত্রই ত্রিগুণাত্মক; অথবা যাহা একই কথা—ব্যষ্টিসত্তার অন্তর্নিগূঢ় সত্বগুণ রজস্তমোগুণের বাধায় জড়িত। এই জন্য প্রথম উদ্যমে সাধক সহজভাবে আত্মশক্তি খাটাইয়া পরমাত্মার হস্ত হইতে যাহা প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হন, দ্বিতীয় উদ্যমে পরমাত্মার প্রসাদ-লব্ধ সেই সত্বগুণের আশপাশের বাধা আত্মপ্রভাবের বলে অতিক্রম করিয়া তাহার আগমনের পথ পরিষ্কার করা তাঁহার পক্ষে আবশ্যক হয়। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, আত্মশক্তির প্রথম উদ্যমের ফল সেই যে অযাচিত সাত্বিক আনন্দ যাহা পরমাত্মার প্রসাদে শিশুর অন্তঃকরণেও যেমন, আর সরল হৃদয় সাধু-যুবার অন্তঃকরণেও তেমনি, টাট্‌কা-টাট্‌কি আকাশ হইতে নিপতিত হয়, তাহাই সাধকের আত্মশক্তির দ্বিতীয় উদ্যমের গোড়া'র নিয়ামক। পরমাত্মার প্রসাদ-লব্ধ গোড়া'র সেই সাত্বিক আনন্দই সাধককে মঙ্গলের পথ প্রদর্শন করে। সে আনন্দ বিষয়সুখের ন্যায় মোহাচ্ছন্ন আনন্দ নহে—পরন্তু তাহা জ্ঞানগর্ভ সুবিমল আনন্দ; আর, সেইজন্য উপনিষদে তাহা প্রজ্ঞানঘন বলিয়া উক্ত হইয়াছে;—উক্ত হইয়াছে

"প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো আনন্দভুক চেতোমুখঃ"

আনন্দময়-কোশস্থ জীব প্রজ্ঞানঘন আনন্দভুক্ চেতোমুখ।

এই সাত্বিক আনন্দের সঙ্গে যাহার সুর মেলে তাহাই মঙ্গল কার্য্য, আর, তাহার সঙ্গে যাহার সুর মেলে না তাহাই অমঙ্গল কার্য্য। দেব-প্রসাদলব্ধ সাত্বিক আনন্দই সাধকের আত্মপ্রসাদের মূল-উৎস, আর, তাহারই আর এক নাম অন্তরাত্মা। পাশ্চাত্য শাস্ত্রেও বলে conscience is the voice of God অন্তরাত্মার বাণী ঈশ্বরেরই বাণী। এ বিষয়টি আর একটু বিশদরূপে বিবৃত করিয়া বলা আবশ্যক। আগামী বারে তাহার চেষ্টা দেখা যাইবে।

নবম অধিবেশন।

ব্যাখ্যান।

এখন আমরা এটা বেস্ বুঝিতে পারিয়াছি যে, প্রথম উদ্যমে মনুষ্যের আত্মশক্তি ঐশীশক্তির গর্ভে লুকাইয়া থাকিয়া অলক্ষিতভাবে তাহার অন্তঃকরণে সত্ত্বগুণ (অর্থাৎ সত্তার প্রকাশ এবং সত্তার রসাস্বাদন-জনিত আনন্দ) জাগাইয়া তোলে, এবং দ্বিতীয় উদ্যমে সত্তার প্রকাশের সঙ্গে প্রকাশে গাত্রোত্থান করিয়া জাগ্রৎভাবে রজস্তমোমূলক বাধার অপনয়নকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; আর তাহাতে যে পরিমাণে কৃতকার্য্য হয়, সেই পরিমাণে তাহার সম্মুখে সত্ত্বগুণের বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়, অথবা, যাহা একই কথা—দেবপ্রসাদের আগমন-দ্বার উন্মুক্ত হয়। দ্বিতীয় উদ্যমে আত্মশক্তি তিন তিন ধাপে পদনিক্ষেপ করিয়া সাধন-সোপানে অগ্রসর হয়। প্রথম ধাপ হ'চ্চে সংকল্প-বন্ধন, দ্বিতীয় ধাপ মনোযোগ, তৃতীয় ধাপ উদ্যম বা অধ্যবসায়। উদ্যম কি? না কর্ত্তব্য কর্ম্মে যত্নের যোগ বা প্রাণের যোগ। এইজন্য উদ্যম এবং অধ্যবসায়কে (অর্থাৎ কোমর বাঁধিয়া লাগাকে) বলা যাইতে পারে প্রাণযোগ বা কর্ম্মযোগ। মনোযোগ কি? না জ্ঞেয় বিষয়ে জ্ঞানের যোগ। এইজন্য মনোযোগকে বলা যাইতে পারে জ্ঞানযোগ। সংকল্পবন্ধন কি? না লক্ষ্য বিষয়েতে প্রীতি ভক্তি এবং নিষ্ঠার যোগ। যদি একজন টোলের ভট্টাচার্য্য এবং মারোআরি বণিক্ উভয়েই একহাজার টাকার পুঁজির উপরে ভর করিয়া একই সময়ে বস্ত্রের দোকান খোলেন, তবে খুব সম্ভব যে, বছর-খানেকের মধ্যেই মারোআরি বণিকের একহাজার টাকা দুহাজার হইয়া উঠিবে; পক্ষান্তরে, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের একহাজার টাকা অ্যাকের পিঠে দুইটি

মাত্র শূন্যে পর্য্যবসিত হইবে। এইরূপ এক যাত্রায় পৃথক্ ফলের কারণ যে কি তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। ভট্টাচার্য্যের মনের ষোলোআনা টান সরস্বতীর প্রতি—কেবল পেটের দায়ে তিনি লক্ষ্মীর সেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন; পক্ষান্তরে, মারোআরি বণিকের মনের ষোলোআনা টান লক্ষ্মীর প্রতি; আর, সেই জন্য তিনি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে লক্ষ্মীর সেবায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। দোঁহার মধ্যে কে সাঁচা সোনা কে ঝুঁটা সোনা, দেবী কি আর তাহা বোঝেন না? খুবই যে তিনি তাহা বোঝেন তাহা ফলেন পরিচীয়তে। লক্ষ্যসাধনে যাঁহার সংকল্পবন্ধন সত্যসত্যই হয়, তাঁহার সেই সংকল্পের বন্ধন-সূত্র হ'চ্চে লক্ষ্য বিষয়ের প্রতি মনের টান বা প্রীতি-ভক্তি। এমন কি—যদি ভোজন-কার্য্যও অভক্তির সহিত অনুষ্ঠান করা যায়, তবে উদরে যে দেবতা-এক আছেন তিনি নিবেদিত অন্ন কণ্ঠনলীর দ্বার দিয়া দূরে বিসর্জ্জন করেন। লক্ষ্য সাধনের গোড়ার কথা যখন সংকল্প-বন্ধন; সংকল্প-বন্ধনের গোড়ার কথা যখন লক্ষ্য বিষয়েতে প্রীতি-ভক্তি বা অনুরাগ; আর, অনুরাগের গোড়ার কথা যখন লক্ষ্য-বিষয়েতে আনন্দের আস্বাদপ্রাপ্তি; তখন তাহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ঈশ্বরের প্রসাদ-লব্ধ গোড়ার সাত্ত্বিক আনন্দই মনুষ্যের মঙ্গল-কার্য্যের মূল প্রবর্ত্তক। আত্মশক্তির কার্য্যই হ'চ্চে সেই গোড়ার সাত্ত্বিক আনন্দকে রজস্তমোগুণ দ্বারা অভিভূত হইতে না দেওয়া। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, রজস্তমোগুণ কোথা হইতে আসে? ইহার উত্তর এই যে, সবই যেখান হইতে আসে, রজস্তমোগুণও সেইখান হইতে আসে; ঐশীশক্তি হইতে আসে। বেদান্তের মতে ঐশীশক্তি দুই প্রকার—আবরণ-শক্তি এবং বিক্ষেপ-শক্তি। আবরণ-শক্তি সত্যকে ঢাকিয়া রাখে, এবং বিক্ষেপ-শক্তি প্রকৃত

সত্যের পরিবর্ত্তে নানা প্রকার কৃত্রিম সত্যের অবতারণা করে। বেদান্তের আবরণ-শক্তি এবং সাংখ্যের তমোগুণ, তথৈব, বেদান্তের বিক্ষেপ-শক্তি এবং সাংখ্যের রজোগুণ, নামেই কেবল বিভিন্ন—ফলে একই। আবরণ-শক্তি এবং বিক্ষেপ শক্তি কিরূপে একযোগে কার্য্য করে, তাহার একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি—প্রণিধান কর।

এক্ষণকার কালের এই যে একটি সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য—যে, পৃথিবী ঘুরিতেছে, এ সত্যটি পূর্ব্বতন কালে ভাস্করাচার্য্যের ন্যায় দুই এক জন প্রতিভাশালী মহাত্মা ব্যতীত অপরাপর জ্যোতির্বিদ্‌গণের নিকটে অপ্রকাশ ছিল। সত্যের এইরূপ অপ্রকাশের নাম আবরণ। আবার, ঐ সকল সাধারণ-শ্রেণীর জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতেরা "পৃথিবী ঘুরিতেছে" এটা যেমন জানিতেন না, তেমনি, তাঁহারা জানিতেন এই যে, সূর্য্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। "পৃথিবী ঘুরিতেছে" এই সত্যটি ঢাকিয়া রাখা আবরণ-শক্তির কার্য্য; আর, প্রকৃত সত্যের পরিবর্ত্তে "সূর্য্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে" এই অসত্যটিকে সত্যরূপে দাঁড় করানো বিক্ষেপ-শক্তির কার্য্য। আর একটি দৃষ্টান্ত এই:—

নিদ্রাকালে বাহিরের কোনো কিছুই আমরা দেখিতে পাই না, শুনিতে পাই না। বাহিরের বাড়ি ঘর ঘট পট প্রভৃতি সমস্ত বস্তুই আমাদের জ্ঞানে অপ্রকাশ থাকে। যখন কিন্তু নিদ্রার তিমিরাবরণের আশপাশের ফাঁকের মধ্য দিয়া একটু আধ্‌টু চেতনার স্ফুলিঙ্গ চাগাড় দিয়া ওঠে, তখন, "আমি বাহিরের কোনো বস্তুই দেখিতেছি না—শুনিতেছি না" এই সত্যকথাটিকে সে কিছুতেই মনে স্থান দিতে চাহে না; তাহার পরিবর্ত্তে সে "এটা দেখিতেছি—ওটা দেখিতেছি—সেটা দেখিতেছি" এইরূপ করিয়া নানাপ্রকার কৃত্রিম বাড়ি ঘর, লোক জন জীবজন্তু দিয়া আপনার অজ্ঞানের খাঁক্তি পূরণ করিতে থাকে—দুধের

সাধ ঘোলে মিটাইতে থাকে। নিদ্রাকালে "আমি কিছুই দেখিতেছি না—শুনিতেছি না" এইরূপ যে অজ্ঞান ইহাই আবরণ-শক্তির প্রভাবের পরিচায়ক; আর, তৎকালে "আমি এটা দেখিতেছি—ওটা দেখিতেছি—সেটা দেখিতেছি" এইরূপ যে কৃত্রিম ধাঁচার জ্ঞান ইহাই বিক্ষেপ-শক্তির প্রভাবের পরিচায়ক। ফল কথা এই যে জীবের জ্ঞান সীমাবদ্ধ বলিয়া একদিকে যেমন তাহার নিকটে প্রকৃত সত্য অন্ধকারে আবৃত থাকে, আর একদিকে সেই অল্পজ্ঞ জীব "এটা জানিতেছি—ওটা জানিতেছি—সেটা জানিতেছি" এইরূপ করিয়া নানা প্রকার ভুল জ্ঞান দিয়া আপনার অজ্ঞানের খাঁক্তি পূরণ করিবার জন্য ব্যস্ত সমস্ত হয়। পূর্ব্বোক্ত প্রকার না-জানা ব্যাপারটি আবরণ-শক্তির প্রভাবের পরিচায়ক, শেষোক্ত প্রকার অসত্যকে সত্য করিয়া সাজানো ব্যাপারটি বিক্ষেপ-শক্তির প্রভাবের পরিচায়ক। আবরণ-শক্তি এবং বিক্ষেপ-শক্তি দ্বারা জ্ঞানের এই যে সীমাবন্ধন—সর্ব্বাঙ্গীন প্রকৃত সত্যকে ঢাকা দিয়া রাখিয়া তাহার পরিবর্ত্তে খণ্ড খণ্ড এক-এক-দিক্‌ঘ্যাঁসা এক এক ভাবের কৃত্রিম সত্য দিয়া কথঞ্চিৎ প্রকারে জ্ঞানের ক্ষোভ নিবারণ—এইরূপ যে সীমাবন্ধন, ইহাই জীবসৃষ্টির গোড়ার কথা। কেননা, জীব যদি অল্পজ্ঞ না হয়, তবে জীব জীবই হয় না।

পূর্ব্বে আমি বারম্বার বলিয়াছি এবং এখনো বলিতেছি যে, সমষ্টি-সত্তার বাহিরে দ্বিতীয় কোনো সত্তা হইতেই পারে না, সুতরাং পরমাত্মার সত্তা মূলেই রজস্তমোগুণদ্বারা বাধাক্রান্ত নহে। তিনি স্বপ্রকাশ এবং পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপ। তাঁহার প্রকাশেরও প্রতিঘাত নাই—আনন্দেরও প্রতিঘাত নাই। সুতরাং আপনার প্রকাশ এবং আনন্দের বাধা অপসারণ করিবার জন্য শক্তি খাটাইবার কোনো প্রয়োজনই তাঁহার নাই। তাঁহার অপরাজিত মহতী শক্তি এই যে

প্রভৃত জগৎকার্য্যে নিরবচ্ছেদে খাটিতেছে—খাটিতেছে তবে তাহা কিসের জন্য? ইহার একমাত্র উত্তর যাহা সম্ভবে তাহা এই যে, জীবাত্মাকে পরমাত্মার আনন্দের ভাগী করিবার জন্য। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, জীবাত্মা তো সেদিনকার জীব; তাহার জন্য অনাদি ঐশী-শক্তি অবিশ্রাম জগৎকার্য্যে ব্যাপৃত হইবে—ইহা কি সম্ভবে? ইহার উত্তর এই যে, জীবাত্মা পরমাত্মার পর নহে; জীবাত্মা পরমাত্মার আপনারই জীবাত্মা। একদিকে জীব যেমন ঈশ্বরেরই জীব, আর একদিকে ঈশ্বর তেমনি জীবেরই ঈশ্বর। যদি জীব একেবারেই না থাকে তবে জগদীশ্বর কাহার ঈশ্বর? জগদ্‌গুরু কাহার গুরু? জগৎপিতা কাহার পিতা? আমাদের দেশের পুরাতন তত্ত্বজ্ঞানশাস্ত্রের অভিপ্রায় মতে, জীবেশ্বরের মধ্যে সম্বন্ধ শুধু যে কেবল আজিকের সম্বন্ধ তাহা নহে; তাহা অনাদিকালের সম্বন্ধ। আর, সেই জন্য বেদান্তাদি শাস্ত্রে জীবেশ্বরের বিভিন্ন ভাবের বিভিন্ন নাম-গুলি এপিঠ-ওপিঠভাবে একসঙ্গে জোড়া লাগানো আছে, তার সাক্ষী নর-নারায়ণ, বিশ্ব-বৈশ্বানর, তৈজস-হিরণ্যগর্ভ, প্রাজ্ঞ-ঈশ্বর ইত্যাদি। ফলকথা এই যে, আকাশেরও যেমন, কালেরও তেমনি, সত্তারও তেমনি, দুই পিঠ। এক পিঠে সবই ভিন্ন ভিন্ন, এবং আর এক পিঠে সবই অ্যাকে সমাহিত। আকাশের এপিঠে—এক জায়গায় জল এক জায়গায় স্থল, এক জায়গায় বায়ুমণ্ডল, এক জায়গায় ঈথর্ নামক জ্যোতিষ পদার্থ; পক্ষান্তরে, আকাশের ওপিঠে কোনোপ্রকার ঢিবিঢাবা নাই; আকাশের ওপিঠ সুমার্জ্জিত পেশল, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, এবং আগাগোড়া লপেট্; তাহা একেবারেই অখণ্ড; আকাশের ওপিঠে সমস্ত আকাশ অ্যাক আকাশ। কালসূত্রের তেমনি এপিঠে মোটা মোটা ছেদগ্রন্থি রহিয়াছে। তা'র সাক্ষী:—আমাদের দেশে প্রথমে ছিল স্বরাজ্য;

তাহার পরে আসিল মুসলমান রাজ্য ; তাহার পরে আসিল এক্ষণকার ইংরাজ্য। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের ভাবগতি কত না বিভিন্ন। বেদের আমলে আমাদের দেশ ঋষিপ্রধান ছিল ; মনুর আমলে ব্রাহ্মণপ্রধান ছিল ; ব্যাসের আমলে ক্ষত্রিয়প্রধান ছিল ; শ্রীমন্ত সদাগরদিগের প্রাদুর্ভাবকালে বৈশ্যপ্রধান ছিল ; এবং সম্প্রতি শূদ্র-প্রধান বা দাসত্বপ্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পক্ষান্তরে কালসূত্রের ওপিঠে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানের মধ্যে মূলেই ব্যবধান নাই। কালের ওপিঠে সমস্ত কাল অ্যাক চির বর্ত্তমানকাল। ভূত বিষয়ের স্মরণ এবং বর্ত্তমানের সাক্ষাৎ উপলব্ধি একযোগে মিলিয়া কিরূপে একীভূত হইয়া যায়, তাহা বিগত প্রবন্ধাংশে দেখান হইয়াছে। কালের ওপিঠে তেমনি ভূত ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান একযোগে মিলিয়া চিরবর্ত্তমানে কেন্দ্রীভূত। পাশ্চাত্য দেশের অগস্ত্য ঋষি (St Augustine) তাই কালের ওপিঠের নাম দিয়াছিলেন Eternal Now। তেমনি আবার দেশকালের এপিঠে আত্মসত্তা ভিন্ন ভিন্ন শরীরে, তথৈব, একই শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় এবং ভিন্ন ভিন্ন গুণবৈচিত্র্যে ভিন্ন ভিন্ন ; পক্ষান্তরে দেশকালের ওপিঠে সমস্ত গুণবৈচিত্র্য গুণসাম্যে কেন্দ্রীভূত—সকল সত্তাই এক অপরিচ্ছিন্ন অখণ্ড সত্তা। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, সমুদ্রের তরঙ্গিত উপরিস্তর এবং নিস্তরঙ্গ গভীর অন্তস্তর এই দুই পিঠ এক সঙ্গে ধরিয়া যেমন এক সমুদ্র, দেশকাল এবং সত্তার দুই পিঠ এক সঙ্গে ধরিয়া তেমনি এক সত্য। সত্যের দুই পিঠের মধ্যে প্রতিযোগিতাও যেমন, সামঞ্জস্যও তেমনি, দুইই সমান বলবৎ:—প্রতিযোগিতা ছায়াতপের ন্যায় প্রকাশের অপরিহার্য্য অঙ্গ, সামঞ্জস্য দৈহিক ধাতুসাম্য এবং মানসিক গুণসাম্যের ন্যায়, এক কথায়—স্বাস্থ্যের ন্যায়, আনন্দের অপরিহার্য্য অঙ্গ। নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের

সমস্ত বিভাগেই সাধারণতঃ এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, এপিঠ সমস্ত বৈচিত্র্য-সমভিব্যাহারে একবার ওপিঠে বিলীন হইতেছে—যেমন নিদ্রাবস্থায়; আবার, যথাসময়ে সমস্ত বৈচিত্র্য-সমভিব্যাহারে এপিঠে আবির্ভূত হইতেছে—যেমন জাগরিতাবস্থায়। দুই পিঠের মধ্যে এইরূপ শক্তির ক্রীড়া অনবরত চলিতেছে, আর তাহাতেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সজীব রহিয়াছে। এই যে এক মহাশক্তি নিখিল দিগ্‌-দিগন্তর এবং যুগযুগান্তর জুড়িয়া অনবরত কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে ঃ—দিন হইতে রাত্রিতে, রাত্রি হইতে দিনে; শুক্লপক্ষ হইতে কৃষ্ণপক্ষে, কৃষ্ণপক্ষ হইতে শুক্লপক্ষে; উত্তরায়ণ হইতে দক্ষিণায়নে, দক্ষিণায়ন হইতে উত্তরায়ণে, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় অনবরত দোলায়মান হইতেছে—এ মহাশক্তির সমস্ত উদ্যমই ব্যর্থ হইয়া যায়, যদি জীব-গণের আনন্দ-সম্পাদন উহার উদ্দেশ্য না হয়। উপনিষদে তাই আছে—"কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ, যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ" "এষহ্যেবানন্দয়াতি" ইহার অর্থ এই যে, কে বা শরীর-চেষ্টা করিত কে বা জীবিত থাকিত—আকাশে যদি এই আনন্দ না থাকিত অর্থাৎ আনন্দস্বরূপ পরমাত্মা না থাকিতেন, ইনিই জীবগণকে আনন্দায়মান করেন। জলস্থলআকাশ বিচিত্র জীবজন্তু এবং ওষধিবনস্পতির মধ্যস্থলে—সত্তার প্রকাশ এবং সত্তার রসানুভূতি-জনিত আনন্দ লইয়া পৃথিবীবক্ষে মনুষ্য জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে তো আর ভুল নাই! কে তাহাকে জাগাইয়া তুলিল—কেনই বা জাগাইয়া তুলিল? ইহার উত্তর উপনিষদে দেওয়া হইয়াছে এই-রূপ স্পষ্টাক্ষরে ঃ—"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" "আন-ন্দেন জাতানি জীবন্তি" "আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।" ইহার অর্থ এই যে, আনন্দ হইতে নিশ্চয়ই ভূতগণ জন্মিতেছে, আনন্দের গুণেই

বাঁচিয়া থাকিতেছে, এবং আনন্দে গিয়াই সমাহিত হইতেছে। উপনিষদে আরো আছে এই যে, "রসো বৈ সঃ" ইহার অর্থ এই যে, তিনি রসই; "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি" রস পাইয়াই জীব আনন্দিত হয়। অপরিচ্ছিন্ন সমষ্টি-সত্তা নীরস সত্তা নহে—তাহা ভরপূর আনন্দময় আত্মসত্তা, তাহা রসের অগাধ নিধি। চারিটি বিষয় এখানে পরে পরে দ্রষ্টব্য :—

প্রথম দ্রষ্টব্য এই যে, সমষ্টি সত্তার সেই যে সাক্ষাৎ উপলব্ধি যাহা সমস্ত জ্ঞানের মূলাধার, সেই চিরবর্ত্তমান সাক্ষাৎ উপলব্ধিতে অখণ্ড সত্তার রসানুভূতি এবং তজ্জনিত পরিপূর্ণ আনন্দ প্রেমসূত্রে বাঁধা রহিয়াছে।

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য এই যে, নিখিল জগতের সমষ্টিসত্তার আপনার সেই যে সাক্ষাৎ উপলব্ধি এবং তজ্জনিত পরিপূর্ণ আনন্দ, তাহাই প্রতি মনুষ্যের অন্তঃকরণের গোড়াঘ্যাঁসা আত্মসত্তার সাক্ষাৎ উপলব্ধি এবং তজ্জনিত আনন্দ।

তৃতীয় দ্রষ্টব্য এই যে, মনুষ্যের অন্তরতম সেই যে সাক্ষাৎ উপলব্ধি এবং আনন্দ, আর, তাহার ভিতরে প্রথম-উদ্যমের আত্মশক্তি যাহা চাপা দেওয়া রহিয়াছে—তিনই যিনি একাধারে, তিনিই মনুষ্যের অন্তরাত্মা বা অন্তর্যামী সাক্ষিপুরুষ।

চতুর্থ দ্রষ্টব্য এই যে, মনুষ্যের অন্তরাত্মাই মনুষ্যের অন্তরস্থিত পরমাত্মা; আর, সেই অন্তরাত্মার কথা শুনিয়া কার্য্য করার নামই পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত হইয়া কার্য্য করা।

এই রকমের জ্যোতিষ্মান্ প্রাণবান্ এবং সারবান্ কার্য্যের সাধন-পথে সাধক বাধাবিঘ্নের ভিড় ঠেলিয়া প্রাণপণ যত্নে অগ্রসর হইতে থাকিলে, কাচপোকার সংস্পর্শে আর্সুলা যেমন কাচপোকার স্বভাব

প্রাপ্ত হয়, সাধক তেমনি পরমাত্মার প্রসাদামৃতের সংস্পর্শগুণে জাগ্রত জ্ঞানময় প্রেমময় এবং তেজোময় আত্মা হইয়া ওঠেন; আর, তখন, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যেরূপ হইতে বলিতেছেন—সাধক সেইরূপ নিস্ত্রৈগুণ্য পদবীতে আরূঢ় হ'ন। নিস্ত্রৈগুণ্য ভাব যে কিরূপ ভাব—স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে আমরা তাহার কতকটা আভাস পাইতে পারি এইরূপ:—

পরমাত্মার অনিরুদ্ধ এবং অপরিচ্ছিন্ন সত্তা রজস্তমোগুণদ্বারা একটুও বাধা-যুক্ত নহে। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্—অথচ আপনার কোনোপ্রকার বাধা-বিঘ্ন অপনয়ন করিবার উদ্দেশে শক্তি খাটাইবার স্বল্পমাত্রও তাঁহার প্রয়োজন নাই। তিনি স্বরূপে অবিচলিত রহিয়াছেন; আর, তাঁহার প্রভাব-স্বরূপা মহতী শক্তির প্রবর্ত্তনায় প্রতিমুহূর্ত্তে নিখিল জগতের প্রভূত কার্য্যকলাপ যথাবিহিতরূপে নির্ব্বাহিত হইয়া যাইতেছে। আমরা আমাদের আপনাদের কার্য্য-প্রণালীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই এইরূপ যে, আমরা যখন শুদ্ধ কেবল স্বার্থসাধনের উদ্দেশে কার্য্য করি, তখন আমাদের হাতের কার্য্য ভাল হয় না এইজন্য—যেহেতু আমাদের মন ক্রিয়মাণ কার্য্যের ফলাফল-চিন্তার দোলায় ক্রমাগতই দোদুল্যমান হইতে থাকে, আর সেই গতিকে সংকল্পিত কার্য্যটি পথের মাঝখানে খেই হারাইয়া ভণ্ডুল হইয়া যায়। পক্ষান্তরে, সাধু মহাপুরুষেরা যখন জগতের মঙ্গলকে আপনার মঙ্গল এবং আপনার প্রকৃত মঙ্গলকে জগতের মঙ্গল জানিয়া আত্মপরনির্ব্বিশেষে লোকহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত হন তখন তাঁহার কার্য্যের প্রণালীপদ্ধতি স্বতন্ত্র। পদ্মপত্র যেমন তরঙ্গদোলায় সহস্র দোদুল্যমান হইলেও জলে একটুও লিপ্ত হয় না, সাধু মহাপুরুষেরা তেমনি সহস্র কর্ম্মধন্ধায় ব্যাপৃত হইলেও কর্ম্মের ফলাফল-

চিন্তায় বিভ্রান্ত হ'ন না; কেননা, সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বমঙ্গলালয় পরমাত্মার প্রতি তাঁহাদের বিশ্বাস অটল; আর, সেইজন্য তাঁহারই পদতলে তাঁহারা আপনাদের করণীয় ক্রিয়মাণ এবং কৃত সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত। বলিলাম যে, "সাধু মহাপুরুষেরা যখন লোকহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত হ'ন"—কিন্তু লোকহিতকর কার্য্য বলে কাহাকে? কেহ যদি মনে করেন যে লোকহিতকর কার্য্য রাজার কার্য্য, তা বই, তাহা চাসার কার্য্য নহে, তবে সেটা তাঁহার বড়ই ভুল। পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিয়া সেখান হইতে যদি নগরগ্রামের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, তবে রাজার প্রাসাদ এবং চাসার কুটীরের মধ্যে বড়ছোটোর প্রভেদ যতকিছু আছে সমস্তই দর্শকের দৃষ্টিক্ষেত্র হইতে অন্তর্ধান করে;—তেমনি এখন আমি যে জায়গার কথা বলিতেছি, সে জায়গায় দাঁড়াইয়া দেখিলে রাজার বিস্তীর্ণ রাজ্য এবং চাসার চাসের ভূমিটুকুর মধ্যে বড়ছোটোর প্রভেদ যাহা আছে তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। রাজা যেমন আপনার রাজ্যটুকুর সীমার মধ্যেই রাজা, তা বই, তাহার সীমার বাহিরে তিনি রাজা নহেন, চাসাও তেমনি আপনার ক্ষুদ্র কৃষিক্ষেত্রটুকুর সীমার মধ্যে একপ্রকার ছোটোখাটো রাজা;—যদিচ তাহার সীমার বাহিরে সে চাসা বই আর কিছুই নহে। চাসা যদি আপনার মুষ্টিমেয় রাজ্যটুকুর রাজকার্য্য যথাবিহিতরূপে সুনির্ব্বাহ করে, আর, রাজা যদি আসমুদ্র পৃথিবীর রাজকার্য্য মূঢ়ের ন্যায় দিগ্‌বিদিক্‌শূন্যভাবে নির্ব্বাহ করেন, তবে চাসাই আপনার ক্ষুদ্র রাজ্যটুকুর প্রকৃত রাজা—রাজা কেবল নামেই রাজা। রাজাই হো'ন্ আর চাসাই হো'ন্ যিনি যে অবস্থায় থাকুন না কেন, সেই অবস্থাই তাঁহার ঈশ্বর-দত্ত রাজ্য। তিনি যদি ঈশ্বরের মঙ্গলইচ্ছার উপরে বিশ্বস্তচিত্তে নির্ভর

করিয়া সেই অবস্থার রাজা হ'ন—তিনি যদি কাহারো প্রতি অন্যায় ব্যবহার না করিয়া কাহারো মনে আঘাত না দিয়া, বৈধ প্রণালীতে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া পরিবার প্রতিপালন করেন, অন্তরের সহিত আত্মীয়স্বজন এবং পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণের মঙ্গল কামনা করেন এবং সাধ্যমতে তাহাদের উপকার সাধন করে, তবে তাহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট লোকহিতকর কার্য্য। ফল কথা এই যে, কার্য্যাড়ম্বর স্বতন্ত্র এবং কার্য্য স্বতন্ত্র। কেমন ব্যস্ততাবিহীন প্রশান্তভাবে সূর্য্য চন্দ্র উদয়াস্তগিরির শিখর আরোহণ করে! অরণ্যের বনস্পতি কেমন নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া সন্ধ্যা না হইতে হইতেই পক্ষিগণকে আপনার সুনিভৃত শাখাপ্রশাখা এবং কোটরের মধ্যে আশ্রয় প্রদান করিয়া মাতার ন্যায় তাহাদিগকে কুশলে রক্ষা করে! তাহার পরে সন্ধ্যা দেখা দিবামাত্র আকাশের দীপমালা কেমন ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন করিতে থাকে! তাহার পরে সর্ব্বসন্তাপহারিণী রাত্রি কেমন অলক্ষিতভাবে আগমন করিয়া বিনা কোনো কথাবার্ত্তায় লোকের অসাক্ষাতে আপনার নিত্যকৃত্য মঙ্গলকার্য্যের ব্রত উদযাপন করেন! প্রকৃতিমাতার সকল কার্য্যই সৌন্দর্য্যময়; তাঁহার কোনো কার্য্যই বেতালা বা বেসুরা নহে। তাঁহার ত্রিগুণাত্মক কার্য্যের ভিতরে নিস্ত্রৈগুণ্যভাব যাহা চাপা দেওয়া রহিয়াছে, তাহা অপর-সাধারণের দৃষ্টির অবিষয় হইলেও ভাবুক কবিগণের অন্তর্দৃষ্টি এড়াইতে পারে না। এ যাহা বলিলাম, এইটিই হ'চ্চে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ভিতরের কথা। যে সাধক পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত হইয়া কায়মনোবাক্যে মঙ্গলকার্য্যের অনুষ্ঠানে যত্নবান্ হ'ন, তাঁহার কার্য্যের মধ্য হইতেও ঐরূপ আড়ম্বর-শূন্য প্রশান্ত নিস্ত্রৈগুণ্য ভাব সূক্ষ্মরূপে ফুটিয়া বাহির হয়—যাঁহার চক্ষু আছে তিনিই তাহা দেখিতে পান, দেখিতে পাইয়া তাহার সৌন্দর্য্যে

মোহিত হ'ন। সাধক প্রথম উদ্যমেই কিছু আর নিস্ত্রৈগুণ্য পদবীতে আরূঢ় হ'ন না—তাঁহাকে পূর্ব্বের পূর্ব্বের সোপান মাড়াইয়া পরের পরের সোপানে পদনিক্ষেপ করিতে হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রতিযোগিতা প্রকাশের সঙ্গের সঙ্গী, এবং সামঞ্জস্য আনন্দের সঙ্গের সঙ্গী; কিন্তু আগে প্রকাশ—পরে আনন্দ। প্রতিযোগিতা প্রকাশের প্রদীপ উস্কাইয়া দ্যায়, সামঞ্জস্য আনন্দের দ্বার উদ্ঘাটন করে। প্রকাশের পথ পরিষ্কার করিবার জন্য সাধককে প্রথমে আত্মশক্তি খাটাইয়া রজস্তমোগুণের বাধা অতিক্রম করিতে হয়; পরমাত্মাকে সহায় করিয়া অর্জ্জুনের ন্যায় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে মাতিতে হয়। খাঁটি সোনাকে ব্যবহারকার্য্যে খাটাইতে হইলে তাহার সঙ্গে যেমন কতক পরিমাণে তাঁবা মেশানো আবশ্যক হয়, তেমনি সত্ত্বগুণপ্রধান আত্মশক্তিকে রিপুসংগ্রামে কার্য্যক্ষম করিবার জন্য তাহার সঙ্গে কতক পরিমাণে রজোগুণের তীব্রতা এবং কঠোরতা মেশানো প্রথম প্রথম সাধকের পক্ষে আবশ্যক হয়; কাঁটা দিয়া কাঁটা খোঁচাইয়া বাহির করা আবশ্যক হয়। কেননা, মনুষ্যের আত্মশক্তি যদিচ সত্ত্বগুণপ্রধান, কিন্তু তথাপি তাহা ত্রিগুণাত্মক, তা বই, তাহা বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ নহে। বেদান্তশাস্ত্র এবং যোগশাস্ত্র উভয়েই এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, একমাত্র ঐশীশক্তিই কেবল পরম পরিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ—অর্থাৎ মূলেই তাহা রজস্তমোগুণদ্বারা বাধাগ্রস্ত নহে। প্রথম সোপানে সাধক রিপুগণের উপরে জয়লাভ করিয়া দ্বিতীয় সোপানে যখন বিশেষমতে পরমাত্মার ভাবের ভাবুক হ'ন, আর, সেই সময়ে যখন পরমাত্মার প্রসাদামৃত অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার সমস্ত বাধাবিঘ্ন এবং জ্বালাযন্ত্রণা ঘুচাইয়া দ্যায়, তখনই তিনি নিস্ত্রৈগুণ্য পদবীতে আরূঢ় হ'ন। কথাটা যাহা বলিলে শ্রোতৃবর্গ সহজেই বুঝিতে পারিবেন তাহা এই:—একজন

ওস্তাদ গায়কের যতক্ষণ না শ্রোতা যোটে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি আপনিই আপনার শ্রোতা; কিন্তু শ্রোতৃমণ্ডলীর উপস্থিতি ব্যতিরেকে তাঁহার গান কণ্ঠ হইতে বাহির হইতে চাহে না। বিজন উপদ্বীপবাসী রবিন্‌সন্ ক্রুসো যদি শেক্সপিয়রের ন্যায় হ্যাম্‌লেট্ ম্যাগ্‌বেথ প্রভৃতি মহানাট্যের রচনাকার্য্যে পারদর্শী হইতেন, তবে শ্রোতার অভাবে তিনি দুঃখে মারা যাইতেন তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। আবার শ্রোতৃমণ্ডলী যদি গানের ভাবগ্রাহী হ'ন, অর্থাৎ সমজ্‌দার হ'ন, তবে তো কথাই নাই; তাহা হইলে গায়কের হৃদয়ের কপাট উদ্ঘাটিত হইয়া গিয়া তাঁহার মধুর কণ্ঠ হইতে অমৃতের ধারা উৎসারিত হইতে থাকে। কিন্তু সমজ্‌দার বলে কাহাকে? শেক্সপিয়রের সমজ্‌দার হইতে হইলে কতক পরিমাণে শেক্সপিয়র হওয়া চাই; কালিদাসের সমজদার হইতে হইলে কতক পরিমাণে কালিদাস হওয়া চাই; তা বই সমজদার হওয়া কাষ্ঠপাষাণের কর্ম্ম নহে। তবেই হইতেছে যে ওস্তাদ গায়ক অ্যাকলাই যে কেবল গায়ক তাহা নহে; তাঁহার রসগ্রাহী শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁহারই দ্বিতীয় তিনি। রাজা যেমন সমস্ত প্রজাবর্গ লইয়া রাজা; ওস্তাদ গায়ক তেমনি সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলী লইয়া ওস্তাদ গায়ক। গায়কের কণ্ঠকুহর এবং কর্ণকুহর যেমন পরস্পরের সহিত যোগসূত্রে বাঁধা, গায়কের হৃদয় এবং শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয় তেমনি-তর'ই যোগসূত্রে বাঁধা। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও শ্রোতাদিগের মধ্যে এক ব্যক্তিও এরূপ নহেন যিনি সহস্র চেষ্টা করিলেও ওস্তাদ গায়কের মতো ইচ্ছামাত্রে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সুমধুর গীত কণ্ঠ হইতে নিঃসারণ করিতে পারেন। তবে যদি তাঁহাদের মধ্যে গান শিখিবার জন্য যাঁহার আগ্রহ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী তিনি কিছুকাল ধরিয়া গলা সাধেন এবং তাহার পরে গায়কের সঙ্গে একযোগে সমস্বরে গান করেন, তাহা হইলে

গায়কের গুণে তাঁহার কণ্ঠের গীত ক্রমে গায়কের মতো সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া ওঠা অসম্ভব নহে। পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত হইয়া কার্য্য করিলে সাধকের আত্মশক্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে কাঁটাখোঁচা অপনীত হইয়া গিয়া কেমন তিনি আড়ম্বরশূন্য সহজশোভনভাবে জ্ঞানের সহিত প্রেমের সহিত এবং নিষ্ঠার সহিত অন্তরাত্মার প্রদর্শিত পথে চলিয়া আনন্দনিকেতনের দ্বার সম্মুখে উন্মুক্ত দেখিতে পান, উপরি-উক্ত উপমাটির আলোকে আমরা তাহা কতকটা বুঝিতে পারিতে পারি।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে মহা একটা সংকটাপন্ন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ করিতেছেন; তাহা যেমন-তেমন সংকটাপন্ন কার্য্য নহে—তাহা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ! অথচ বলিতেছেন "নিস্ত্রৈগুণ্য হও" অর্থাৎ "অন্তরস্থিত সত্ত্বগুণকে রজোস্তমোগুণদ্বারা বাধাক্রান্ত হইতে দিও না, কোনো কিছু দ্বারা বিচলিত হইও না—অব্যাকুলিত এবং অনাসক্ত চিত্তে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম-সাধনে প্রবৃত্ত হও।" ব্যাপারটি অত্যন্ত দুরূহ। সামান্য লোক নহেন—অর্জ্জুন! ঐ দুরূহ ব্যাপারটির উপদেশ শুনিয়া তাঁহাকেও সাত পাঁচ ভাবিতে হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখিলেন যে, অর্জ্জুনের মন কিছুতেই প্রবোধ মানিতেছে না—শেষে তখন তিনি সার কথাটি অর্জ্জুনকে শুনাইলেন; সে কথা এই যে, আমাকে তুমি কায়মনোবাক্যে আশ্রয় কর—আমাতে কর্ম্ম সমর্পণ কর, তাহা হইলে তুমি সহজে সিদ্ধিলাভে কৃতকার্য্য হইবে। কিন্তু এ কথাটি তিনি সকলের শেষে অর্জ্জুনের নিকটে খুলিয়াছিলেন। আপাততঃ এখন তিনি অর্জ্জুনকে কঠোর কর্ম্মযোগের উপদেশ দিতেছেন। নিস্ত্রৈগুণ্য যে কাহাকে বলে তাহা বুঝাইতে গিয়া এতটা সময় যাহা ক্ষেপিত হইল—আশা করি তাহা নিষ্ফল হয় নাই। নিস্ত্রৈগুণ্য-ভাব সংক্ষেপে এইরূপ:—পরমাত্মার সত্তা রজস্তমোগুণদ্বারা বাধাক্রান্ত নহে; পরন্তু

জীবাত্মার সত্তা রজস্তমোগুণে জড়িত। তবেই হইতেছে যে নিস্ত্রৈগুণ্য ভাব পরমাত্মারই স্বরূপ-ভাব, তা বই, তাহা জীবাত্মার স্বভাবসিদ্ধ ভাব নহে। কাজেই শুদ্ধ কেবল আত্মপ্রভাবের বলে জীবাত্মা নিস্ত্রৈগুণ্য পদবীতে আরূঢ় হইতে পারেন না। তবে কি? না সাধক অকৃত্রিম প্রীতিভক্তির সহিত পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত হইয়া কার্য্য করিতে করিতে ক্রমে যখন তাঁহাতে পরমাত্মার গুণ ধরে, তখন পরমাত্মা যেমন স্বরূপে অবিচলিত থাকিয়া নিখিল জগতের মঙ্গলের জন্য যথাযথমাত্রা শক্তি প্রেরণা করিতে ক্ষান্ত থাকেন না, ভক্ত সাধক তেমনি জল-নির্লিপ্ত জলজ পত্রের ন্যায় কর্ম্মের ফলাফলে নির্লিপ্ত থাকিয়া যথাবিহিত কর্ত্তব্য-সাধনে যত্নের ত্রুটি করেন না। স্পর্শমণির প্রভাবগুণে লৌহ যেমন স্বর্ণ হয়, পরমাত্মার প্রভাবগুণে তেমনি ত্রিগুণাত্মক সাধক নিস্ত্রৈগুণ্য পদবীতে আরূঢ় হ'ন।

দশম অধিবেশন।

ব্যাখ্যান।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—

"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।"

"বেদে ক্রিয়াকর্ম্মের বিধান-ব্যবস্থা যত কিছু আছে সবই ত্রৈগুণ্যবিষয়ক; তুমি অর্জ্জুন নিস্ত্রৈগুণ্য হও।" এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ উহার সঙ্গে আর চারিটি বচন যোজনা করিয়া উহার ভাবার্থ ফুটাইয়া দিতেছেন; —বলিতেছেন—(১) "নির্দ্বন্দ হও" (২) নিত্যসত্ত্বস্থ হও" (৩) "বিষয়ঘটিত লাভালাভ মনে স্থান দিও না" (৪) "আত্মবান্ হও।" সমগ্র শ্লোকটি এই :—

"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥"

মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ নির্দ্বন্দ-শব্দের অর্থ ভাঙিয়া দিতেছেন এইরূপ :—

"সুখদুঃখ মান-অপমান রাগদ্বেষ শীতোষ্ণ প্রভৃতি দুই দুই প্রতিদ্বন্দী পক্ষের সংস্রব হইতে বিনির্ম্মুক্ত—এই অর্থে নির্দ্বন্দ।" কথাটা ঠিক্। কিন্তু ঐ কথাটুকুর অস্ফুট আলোকে নিস্ত্রৈগুণ্য এবং নির্দ্বন্দের মধ্যে বন্ধনের আঁট যে কিরূপ তাহার সন্ধান পাওয়া কঠিন। তাহার সন্ধান পাইতে হইলে বর্ত্তমান গীতাপাঠ প্রবন্ধে পূর্ব্বের একটি প্রপাঠে সত্ত্বরজস্তমোগুণের পরস্পর প্রতিদ্বন্দিতার কথা যাহা বলা হইয়াছে, সেই কথাটির প্রতি আবার একবার মনঃসমাধান করা আবশ্যক। কথাটি সংক্ষেপে এই :—

সত্ত্বগুণের প্রধান যে-দুইটি অঙ্গ—প্রকাশ এবং আনন্দ, দোঁহারই সঙ্গে দোঁহার দুই প্রতিদ্বন্দ্বী লাগিয়া আছে। প্রকাশের প্রতিদ্বন্দ্বী কে? না অন্ধতা এবং জড়তা, এক কথায়—তমোগুণ। আনন্দের প্রতিদ্বন্দ্বী কে? না দুঃখ এবং অশান্তি, এক কথায়—রজোগুণ। সত্ত্বগুণের সঙ্গে রজস্তমোগুণের উভয়েরই একে-তো এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা, তাহাতে আবার রজস্তমোগুণের আপনা-আপনির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বড় যে কম তাহা নহে। তার সাক্ষী—একদিকে রজোগুণের প্রকৃতি-সিদ্ধ দুঃখযন্ত্রণার ছট্‌ফটানি এবং উচ্ছৃঙ্খলতার মাতামাতি, আরেক দিকে তমোগুণের প্রকৃতিসিদ্ধ অপ্রকাশের অন্ধকার এবং জড়তার নাগপাশ, দুয়ের মধ্যে যে কিরূপ সর্প-নকুলের সম্বন্ধ তাহা কাহারো চক্ষে ঢাকা থাকিতে পারে না। অতএব এটা স্থির যে, দ্বন্দ্বাদ্বন্দ্বি ত্রৈগুণ্যের সঙ্গের সঙ্গী, আর, তাহা হইতেই আসিতেছে যে, নির্দ্বন্দ্বভাব নিস্ত্রৈগুণ্যের সঙ্গের সঙ্গী।

এখানে একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, নির্গুণভাব স্বতন্ত্র এবং নিস্ত্রৈগুণ্যভাব স্বতন্ত্র। শূন্য (০) এবং এক (১), এ দুয়ের মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ; নির্গুণ এবং নিস্ত্রৈগুণ্যের মধ্যে সেইরূপ সম্বন্ধ। নির্গুণ হওয়া কাহাকে বলে? না একেবারেই গুণবর্জ্জিত হওয়া। নিস্ত্রৈগুণ্য হওয়া কাহাকে বলে? না তিন গুণের দ্বন্দ্বাদ্বন্দ্বির প্রতিকূলে আত্মশক্তি খাটাইয়া দ্বন্দ্ব-বিনির্ম্মুক্ত একটিমাত্র গুণের সূর্য্যালোকে প্রভাতের পদ্মের ন্যায় মাথা তুলিয়া এবং হৃদয় খুলিয়া উঠিয়া-দাঁড়ানো। সে গুণ কি? না রজস্তমোগুণ দ্বারা অবাধিত পরম পরিশুদ্ধ ঐশ্বরিক সত্ত্বগুণ। (১) রজোগুণ, (২) তমোগুণ, (৩) সত্ত্বগুণ, (৪) মলিন সত্ত্ব বা মিশ্র সত্ত্ব, (৫) শুদ্ধসত্ত্ব, এই পাঁচের কাহার কিরূপ পরিচয়-লক্ষণ—শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের প্রণীত

বিবেকচূড়ামণি গ্রন্থে তাহা পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে এইরূপ :—

(১) রজোগুণের পরিচয়-লক্ষণ।

বিক্ষেপশক্তী রজসঃ ক্রিয়াত্মিকা
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী।
রাগাদয়োঽস্যাঃ প্রভবন্তি নিত্যং
দুঃখাদয়ো যে মনসো বিকারাঃ॥
কামঃ ক্রোধো লোভদম্ভাঽভ্যসূয়াঽ-
হঙ্কারের্ষ্যা-মৎসরাদ্যাশ্চ ঘোরাঃ।
ধর্ম্মা এতে রাজসাঃ; পুম্প্রবৃত্তিঃ
যস্মাদেষা তদ্রজো বন্ধহেতুঃ॥

ইহার অর্থ এই :—

রজোগুণের বিক্ষেপশক্তি ক্রিয়াত্মিকা। * তাহা হইতেই আদি-হীনা প্রবৃত্তি-ধারা অজস্র প্রবাহিত হইতেছে। তাহা হইতেই রাগাদি এবং দুঃখাদি মনোবিকার সকল নিত্যনিয়ত উৎপন্ন হইতেছে। কাম, ক্রোধ, লোভ, দম্ভ, অসূয়া (Jealousy), পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি ঘোরা বৃত্তি যত কিছু আছে সমস্তই রজোগুণের ধর্ম্ম। যাহার উত্তে-জনায় পুরুষের মনে এই সব প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া ওঠে তাহাই রজোগুণ, আর তাহাই বন্ধনের হেতু।

(২) তমোগুণের পরিচয় লক্ষণ।

অজ্ঞানমালস্য-জড়ত্ব-নিদ্রা-
প্রমাদ-মূঢ়ত্ব-মুখাস্তমোগুণাঃ।

---

* কার্য্যপ্রবর্ত্তনী শক্তিমাত্রই ক্রিয়াত্মিকা। যন্ত্রবিজ্ঞানের (Mechanics-এর) পারিভাষায় তাই Force=acceleration ক্রিয়া।

এতৈঃ প্রযুক্তো ন হি বেত্তি কিঞ্চিৎ
নিদ্রালুবৎ স্তম্ভবদেব তিষ্ঠতি ॥

অজ্ঞান, আলস্য, জড়ত্ব, নিদ্রা, প্রমাদ, মূঢ়ত্ব, এই গুলি প্রধানতঃ তমোগুণের পরিচয়-লক্ষণ। এই সকলের বশতাপন্ন হইয়া তামসিক লোকেরা জানে না কিছুই—কেবল হাই তুলিয়া ঝিমাইয়া এবং স্তম্ভের ন্যায় হইয়া কালাতিপাত করে।

(৩) সত্ত্বগুণের লক্ষণ।

সত্ত্বং বিশুদ্ধংজলবৎ তথাঽপি
তাভ্যাং মিলিত্বা সরণায় কল্পতে।
যত্রাত্মবিম্বঃ প্রতিবিম্বিতঃ সন্
প্রকাশয়ত্যর্ক ইবাখিলং জড়ম্ ॥

ইহার অর্থ :—

সত্ত্বগুণ জলের ন্যায় বিশুদ্ধ ; আর তাহাতে আত্ম-চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হইয়া নিখিল জড়বস্তু প্রকাশ করে। কিন্তু তথাপি তাহা অপর দুইটির সহিত জড়িত হইয়া সংসারগতির অনুপন্থী হয়।

ইহার টীকা।

আমাদের দেশের পুরাতন তত্ত্বজ্ঞানীদিগের এই যে একটি অন্তর্দৃষ্টির দেখা কথা—কিনা আত্মচৈতন্য সত্ত্বগুণে প্রতিবিম্বিত হয়, ইহা শুনিয়া শিক্ষিতম্মন্য নব্য পণ্ডিতগণের হাস্যোদ্রেক হইতে পারে ;—তা' হো'ক্! কিন্তু তাঁহারা যাহাকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রতিভাশালী মহাত্মাদিগের একজন প্রধান শিরোভূষণ বলিয়া মান্য করেন, তিনি কি বলিয়াছেন তাহা যদি মুহূর্ত্তেক ধৈর্য্য ধরিয়া শোনেন, তাহা হইলে

তাঁহাদের হাস্যবদন তৎক্ষণাৎ গম্ভীরভাব ধারণ করিবে তাহা বেস্ বুঝিতে পারা যাইতেছে। অতএব শুনুন কাণ্ট্ কি বলিতেছেন :—

It may seem difficult to understand how I can say : I, as an intelligence and thinking subject (অর্থাৎ I, as চিন্ময়জ্ঞাতা পুরুষ বা চিদাত্মা), know myself as an object thought like other phenomena, not as I am (স্বরূপতঃ) but only as I appear to myself (প্রতিবিম্ববৎ) * * * But that this must really be so can be clearly shown by the fact that we cannot represent to ourselves time in any other way than under the image of a line which we draw.

ইহার অর্থ এই :—

আপাততঃ এটা একটা কঠিন সমস্যা বলিয়া মনে হইতে পারে যে, চিন্ময় জ্ঞাতাপুরুষের পক্ষে আপনার নিকটে আপনি ঘটপটাদি বা সুখদুঃখাদি প্রতিভাসগুলার ন্যায় জ্ঞেয় বিষয়রূপে প্রতিভাত হওয়া কি প্রকারে সম্ভবে? যাহা বাস্তবিক আমি না, তাহা আমি বলিয়া প্রতীয়মান হওয়া কিরূপে সম্ভবে? কিন্তু বুঝিয়া দেখিলে তাহার মধ্যে কাঠিন্য কিছুই নাই; কেননা তাহা হইবারই কথা। এটা যেমন আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে, মনে মনেই হো'ক, আর হাতে কলমেই হো'ক—একটা রেখা টানিয়া সেই দৃশ্য রেখাটিকে অদৃশ্য কালাংশের স্থলাভিষিক্ত করা ব্যতিরেকে অন্য কোনো উপায়ে কাল-নিরূপণ করা কাহারো সাধ্য-সুলভ নহে,* এটাও তেমনি আমরা

* মনঃকল্পিত রেখা'কেও দৃশ্য রেখা বলা উচিত এই জন্য—যেহেতু ক্রোধ কল্পনা করিবার সময়ে আমরা যেমন অদৃশ্য ক্রোধ কল্পনা করি, রেখা কল্পনা করিবার

সহজে বুঝিতে পারি যে, মস্তিষ্কের অন্তর্নিহিত চিদাভাসকে চিদাত্মার স্থলাভিষিক্ত করা ব্যতিরেকে, অন্য কোনো উপায়ে আত্মনিরূপণ করা কাহারো সাধ্য-সুলভ নহে।

কাণ্টের এই কথাটির টীকা।

মনে কর আমি বৌ-ভাতের নিমন্ত্রণ রক্ষা-উপলক্ষে মধ্যাহ্নকালে গৃহ হইতে বাহির হইয়া আমার একটি আত্মীয় লোকের বাটীতে গিয়াছিলাম। ভোজনান্তে ঘণ্টা-খানেক বিশ্রামের পরে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলাম যে, আমার বসিবার ঘরে আমার বাল্য-কালের কাব্যানুরাগী বন্ধু দেবদত্ত চৌকিহ্যালান্ দিয়া বসিয়া মেঘদূত পাঠ করিতেছেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি এখানে কতক্ষণ?" তিনি "বলিতেছি" বলিয়া টিক্ করিয়া ঘড়ির ডালা উদ্ঘাটন করিয়া বলিলেন "আমি যখন তোমার এই ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তখন ঘণ্টার কাঁটা এবং মিনিটের কাঁটা গায়ে গায়ে লিপ্ত হইয়া বারোটায় ঠেকিয়াছে দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল—ঘড়িটি-আমার পরম নিষ্ঠাবান্! কেমন দেখ তদ্গতচিত্তে ইষ্টমন্ত্র জপিতে জপিতে জোড়হস্তে মধ্যাহ্ন-দেবকে প্রণাম করিতেছে! এখন এ-যাহা দেখিতেছি তাহাতে মনে হইতেছে—ঘড়িটি শেরা কাজের লোক! এই দেখ মিনিটের কাঁটার নিশান গাড়িয়াছে, আর ঘণ্টার কাঁটার মানদণ্ড দিয়া যে দিকটা আমার ডাহিন্ দিক্ সেইদিকের ভূমি মাপিতেছে। অতএব এটা অকাট্য বেদবাক্য যে, আমি ডাহা তিন ঘণ্টা কাল তোমার অপেক্ষায় বসিয়া আছি।" এখন

সময়ে সেরূপ অদৃশ্য রেখা কল্পনা করি না—দৃশ্য রেখাই কল্পনা করি; কেননা "রেখা" বলিলেই বুঝায় যে, তাহা দ্রষ্টা পুরুষের চক্ষুর সম্মুখে দৃশ্যমান।

জিজ্ঞাস্য এই যে, ঘটিকা-চক্রের চতুর্থাংশ কি সত্যসত্যই তিনঘণ্টা কাল? কখনই না। তবে কি? না তাহা অদৃশ্য তিনঘণ্টা কালের দৃশ্য প্রতিরূপ, আর, প্রতিরূপেরই নাম প্রতিবিম্ব। এখন বলিবা-মাত্রেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, অদৃশ্য কালাংশ যেমন ঘটিকা-চক্রে দৃশ্য রেখারূপে প্রতিবিম্বিত হয়, চিন্ময় জ্ঞাতা পুরুষ তেমনি মস্তিষ্কের সত্বাংশে চিদাভাসরূপে প্রতিবিম্বিত হ'ন। টীকা এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট, এখন প্রকৃত প্রস্তাবে অবতীর্ণ হওয়া যা'ক্।

(৪) মিশ্র সত্ত্বের পরিচয়-লক্ষণ।

মিশ্রস্য সত্বস্য ভবন্তি ধর্ম্মাঃ
স্বমানিতাদ্যা নিয়মা যমাদ্যাঃ।
শ্রদ্ধাচ ভক্তিশ্চ মুমুক্ষুতা চ
দৈবী চ সম্পত্তিরসন্নিবৃত্তিঃ॥

ইহার অর্থ এই :—

মিশ্রসত্ত্বের ধর্ম্ম এই গুলি :—স্বমানিতা (অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাভিমানিতা) যমনিয়মাদি যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান, শ্রদ্ধা, ভক্তি, মুক্তিকামনা, দৈবী সম্পত্তি অর্থাৎ শমদমাদি সাধনসম্পত্তি, অসদাচরণ হইতে নিবৃত্তি। (অর্থাৎ মিশ্রসত্ত্বের লক্ষণ = সাধনাবস্থার লক্ষণ)।

(৫) শুদ্ধসত্ত্বের লক্ষণ।

বিশুদ্ধসত্বস্য গুণাঃ প্রসাদঃ
স্বাত্মানুভূতিঃ পরমা প্রশান্তিঃ।
তৃপ্তিঃ প্রহর্ষঃ পরমাত্মনিষ্ঠা
যয়া সদানন্দরসং সমৃচ্ছতি॥

ইহার অর্থ এই :—

বিশুদ্ধ সত্ত্বের পরিচয়-লক্ষণ এই গুলি :—আত্মানুভূতি, পরমাপ্রশান্তি,

তৃপ্তি, প্রহর্ষ, আর, সেই প্রগাঢ় পরমাত্মনিষ্ঠা যাহাতে করিয়া সদানন্দ-রসের সম্ভোগ হয়।

(অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বের লক্ষণ = সিদ্ধাবস্থার লক্ষণ।)

এস্থানটিতে শঙ্করাচার্য্য পরমাত্মার সংস্পর্শগুণে শুদ্ধসত্ত্বের যে সকল লক্ষণ সিদ্ধপুরুষের অন্তরে বাহিরে ফুটিয়া বাহির হয় তাহাই নির্দ্দেশ করিলেন। স্থানান্তরে তিনি এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে, শুদ্ধসত্ত্ব অর্থাৎ সর্ব্বজগতের সারভূত সমষ্টিসত্তা বা সমষ্টিসত্ত্ব যাহা রজস্তমোগুণদ্বারা অবাধিত তাহা পরমাত্মারই উপাধি, তা' বই তাহা জীবাত্মার উপাধি নহে ;—রজস্তমোগুণদ্বারা কলুষিত মলিনসত্ত্বই—মিশ্রসত্ত্বই—জীবাত্মার উপাধি। শুদ্ধসত্ত্ব এবং মিশ্রসত্ত্ব সম্বন্ধে শঙ্করা-চার্য্যের প্রকৃত মন্তব্য কথাটি তলাইয়া বুঝিতে হইলে তাহার সহজ উপায় হ'চ্চে—বর্ত্তমান গীতাপাঠ প্রবন্ধের পূর্ব্বের একটি প্রপাঠে সত্তাঘটিত সমষ্টি-ব্যষ্টির সম্বন্ধে গোটাদুই কথা আমি যাহা বলিয়াছি তাহার প্রতি, আবার একবার মনোযোগের সহিত প্রণিধান করা। ঐ স্থানটিতে প্রথমে আমি বলিয়াছি—

"সমষ্টিসত্তা এবং ব্যষ্টিসত্তা'কে পরস্পরের সহিত মিলাইয়া দেখিলে প্রথমেই দুয়ের মধ্যেকার একটি মর্ম্মান্তিক প্রভেদ আমাদের চক্ষে পড়ে এই যে, কোনো দুই ব্যক্তি যেহেতু এক নহে, এইজন্য আমাতে তোমার সত্তার অভাব আছে, তোমাতে আমার সত্তার অভাব আছে ; আর, যদি তৃতীয় কোনো ব্যক্তির নাম হয় দেবদত্ত, তবে দেবদত্তে তোমার এবং আমার উভয়েরই সত্তার অভাব আছে। তবেই হই-তেছে যে, ব্যষ্টিসত্তা-মাত্রেতেই সত্তার সঙ্গে সত্তার বাধা নূন্যাধিক পরিমাণে লাগিয়া রহিয়াছে ; সাত্ত্বিক আনন্দ রাজসিক দুঃখ এবং অশান্তি দ্বারা ন্যূনাধিক পরিমাণে প্রতিহত হইতেছে ; সাত্ত্বিক প্রকাশ

তামসিক জড়তা এবং অবসাদে ন্যূনাধিক পরিমাণে ঢাকা পড়িয়া রহিয়াছে।” এ যাহা আমি বলিয়াছি ইহাতে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, ব্যষ্টিসত্তামাত্রই রজস্তমোগুণের সহিত জড়িত, আর সেইজন্য তাহা মিশ্রসত্ত্ব ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না—শুদ্ধসত্ত্ব হইতে পারে না। তাহার পরে বলিয়াছি

“পক্ষান্তরে এইরূপ দেখা যায় যে, যেমন তোমার বাহিরে আমি রহিয়াছি, আমার বাহিরে তুমি রহিয়াছ—সমষ্টিসত্তার বাহিরে সেরূপ যখন দ্বিতীয় কোনো সত্তা নাই, তখন কাজেই দাঁড়াইতেছে যে, সমষ্টি-সত্তার সহিত লেশমাত্রও বাধার সংস্পর্শ থাকিতে পারে না।” শেষোক্ত কথাটির ভাবে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, সমষ্টিসত্তাই শুদ্ধসত্ত্ব।

শুদ্ধসত্ত্ব যে পদার্থটা কি, এই তো তাহা দেখিলাম, আর, মিশ্রসত্ত্ব যে পদার্থটা কি তাহাও একটু পূর্ব্বে দেখা হইয়াছে। এ যাহা দেখা হইল তাহা জিজ্ঞাস্য বিষয়টির মূলে পৌঁছিবার পক্ষে যদিচ সহায় মন্দ না, কিন্তু তাহার কূলে পৌঁছিতে হইলে আরো গোটাকত কথা দেখিবার আছে;—এই নিগূঢ় রহস্য-গুলি ক্রমে ক্রমে ভাঙিতেছি—প্রণিধান কর।

প্রথম দ্রষ্টব্য।

সত্তাকে যদি চৈতন্যময় সদ্‌বস্তু হইতে বিযুক্ত করিয়া দেখা যায়, তবে তাহা অস্তি নাস্তি দুয়ের বা’র—একপ্রকার জ্ঞানবিরোধী ভাব-পদার্থ হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপ অস্তি এবং নাস্তি দুয়ের বা’র—জ্ঞান-বিরোধী ভাবপদার্থের নাম বেদান্তদর্শনের পারিভাষায়—অবিদ্যা, কাণ্টের পারিভাষায়—thing-in-itself। এ বিষয়ে কাণ্টের মন্তব্য কথা এই:—

ঘটদৃষ্টে যখন আমার মনোমধ্যে ঘটজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন সে যে

ঘটজ্ঞান তাহা আমারই ঘটজ্ঞান; পক্ষান্তরে, ঘটবস্তু কিছু আর আমারই ঘটবস্তু নহে। আমার ঘটজ্ঞান যে আমারই ঘটজ্ঞান তাহার প্রমাণ এই যে, আমি না থাকিলে আমার ঘটজ্ঞান থাকিতে পারে না; আর, ঘটবস্তু যে আমারই ঘটবস্তু নহে তাহার প্রমাণ এই যে, আমি না থাকিলেও ঘটবস্তু যাহা-আছে তাহাই থাকে। যাহাই হো'ক্ না কেন—আমার ঘটজ্ঞানের সীমার বাহিরে ঘট নিজে যে, কি, তাহা বলিতে পারা একান্ত পক্ষেই আমার সাধ্যাতীত। তবেই হইতেছে যে, যাহাকে আমি বলি ঘটবস্তু তাহার সহিত আমার ঘটজ্ঞান অবিচ্ছেদ্যরূপে সংশ্লিষ্ট। তেমনি, যাহাকে আমি বলি পটবস্তু তাহার সহিত আমার পটজ্ঞান অবিচ্ছেদ্যরূপে সংশ্লিষ্ট। অতঃপর দ্রষ্টব্য এই যে, ঘটদ্রষ্টার যদি জ্ঞান না থাকে তবে ঘটজ্ঞানই বলো, পটজ্ঞানই বলো, আর, মঠজ্ঞানই বলো—কোনো জ্ঞানই তাহার মনোমধ্যে উৎপন্ন হইতে পারে না। ঘটদ্রষ্টার জ্ঞান আছে বলিয়াই, তাহার সেই একই অভিন্ন জ্ঞান ঘটদৃষ্টে ঘটজ্ঞানে পরিণত হয়, পটদৃষ্টে পটজ্ঞানে পরিণত হয়, মঠদৃষ্টে মঠজ্ঞানে পরিণত হয়, ইত্যাদি। তবেই হইতেছে যে, ঘটপটাদি বিষয়ক বিভিন্ন জ্ঞান একই অভিন্ন জ্ঞানের শাখাপ্রশাখা। ইহাতে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, বৃক্ষ এবং শাখা-সমূহের মধ্যে যেমন সমষ্টি-ব্যষ্টি সম্বন্ধ, দ্রষ্টা পুরুষের একই অভিন্ন জ্ঞান এবং ঘটপটাদি-বিষয়ক বিভিন্ন জ্ঞানের মধ্যে তেমনি সমষ্টি-ব্যষ্টি সম্বন্ধ। অনতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, আমি যাহাকে বলি ঘটবস্তু তাহার সহিত আমার ঘটজ্ঞান অবিচ্ছেদ্যরূপে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে; আমি যাহাকে বলি পটবস্তু তাহার সহিত আমার পটজ্ঞান অবিচ্ছেদ্যরূপে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে; এক কথায়—আমি যাহাকে বলি ব্যষ্টিবস্তু তাহার সহিত আমার

ব্যষ্টিজ্ঞান বা শাখাজ্ঞান বা ফ্যাঁকড়াজ্ঞান অবিচ্ছেদ্যরূপে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। ইহা হইতেই আসিতেছে যে, আমি যাহাকে বলি সমষ্টি-বস্তু, তাহার সহিত আমার সমষ্টিজ্ঞান বা মূলজ্ঞান বা মোটজ্ঞান অবিচ্ছেদ্যরূপে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। এখন, কাণ্টের শাস্ত্রে বলে শুধু এই যে, আমি যাহাকে বলি ব্যষ্টিবস্তু তাহার সহিত আমার ব্যষ্টিজ্ঞান নিরবচ্ছিন্ন লাগিয়া আছে—যেমন ঘটবস্তুর সহিত ঘটজ্ঞান—পটবস্তুর সহিত পটজ্ঞান, ইত্যাদি; আর, আমার ব্যষ্টিজ্ঞানে অবভাসিত সেই যে ব্যষ্টিবস্তু, তাহা হইতে ঐ জ্ঞানাংশটিকে ছাড়াইয়া লইলে অবশিষ্ট থাকে কেবল thing-in-itself। বৈদান্তিকের শাস্ত্রে তাহা তো বলেই, তা ছাড়া অধিকন্তু আর একটি কথা বলে এই যে, জ্ঞানবিভাসিত ব্যষ্টি বস্তু হইতে জ্ঞানাংশটিকে ছাড়াইয়া লইলে অবশিষ্ট থাকে যেমন ব্যষ্টি thing-in-itself বা ব্যষ্টি-অবিদ্যা, জ্ঞানাবভাসিত সমষ্টি-বস্তু হইতে জ্ঞানাংশটিকে ছাড়াইয়া লইলে অবশিষ্ট থাকে তেমনি সমষ্টি thing-in-itself বা সমষ্টি-অবিদ্যা।

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য।

কাণ্ট্‌কে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, কাহাকেই বা তুমি বলিতেছ ব্যষ্টিবস্তু, আর, কাহাকেই বা তুমি বলিতেছ অবিদ্যা বা thing-in-itself? তবে তাহার উত্তরে কাণ্ট্‌ একটা ঘট এবং একটা পট প্রশ্নকর্ত্তার সম্মুখে রাখিয়া সে-দুটার প্রতি একে একে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া বলিবেন যে, এই যে ঘট, আর, এই যে পট, দুইই, জ্ঞানে অবভাসিত হইবামাত্র ব্যষ্টিবস্তু হইয়া ওঠে, আর, জ্ঞান হইতে বিযুক্ত হইবামাত্র অবিদ্যা বা thing-in-itself হইয়া পড়ে। পরন্তু, শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, কাহাকেই বা

তুমি বলিতেছ সমষ্টিবস্তু, আর কাহাকেই বা তুমি বলিতেছ সমষ্টি-অবিদ্যা? তবে তাহার উত্তরে তিনি কী বলিবেন? তিনি যে কি বলিবেন তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে;—সকল শাস্ত্রেই যাহা বলে তাহাই তিনি বলিবেন;—তিনি বলিবেন—"তুমি যাহা দেখিতে চাহিতেছ তাহা আমি তোমাকে অবশ্যই দেখাইব—কিন্তু এখন না; পৃথিবী যখন সাগর গর্ভে প্রবেশ করিয়া জলময় হইয়া যাইবে; মহা-সাগর যখন অগ্নিগর্ভে প্রবেশ করিয়া অগ্নিময় হইয়া যাইবে; অগ্নি যখন বায়ুগর্ভে প্রবেশ করিয়া বায়ুময় হইয়া যাইবে; বায়ু যখন আকাশে মিশিয়া আকাশের সহিত একীভূত হইয়া যাইবে; আকাশ যখন আরো সূক্ষ্মাৎ-সূক্ষ্মতর চৈতন্য-ঘ্যাঁসা শুদ্ধসত্ত্বে মিশিয়া চৈতন্যময় হইয়া যাইবে, তখন তাহার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তোমাকে আমি বলিব যে, বিশ্বব্যাপী মহাচৈতন্যে অবভাসিত এই যে শুদ্ধসত্ত্ব ইহাই সমষ্টিবস্তু বা একমাত্র অদ্বিতীয় সদ্বস্তু, আর উহাকে চৈতন্য হইতে বিযুক্ত ভাবে দেখিলে উহাই সমষ্টি অবিদ্যা; আবার, উহাকে চৈতন্যের প্রতিবিম্বে অবভাসিত এবং চৈতন্যের প্রভাবে অভিভূত ভাবে দেখিলে উহাই মায়া, অথবা যাহা একই কথা—ঐশী শক্তি। দ্বিতীয় ভাবে দেখিলে শুদ্ধসত্ত্বও যা, মায়াও তা', ঐশী শক্তিও তা, একই। চৈতন্যের আলোকে আলোকিত এবং চৈতন্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত শুদ্ধসত্ত্বকে মায়া বলা যায় এইজন্য, যেহেতু তাহা বহুধা বিচিত্র পরমাশ্চর্য্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূল উপাদান। মায়া শব্দের গোড়া'র অর্থ—লোকে যাহাকে বলে জাদুবিদ্যা; কিন্তু তাহার সেই গোড়া'র অর্থটি তাহার প্রকৃত অর্থ হইতে পারে না এই জন্যে—যেহেতু তাহা একটা মোটামুটি ভাবের উপমা মাত্র। যদি বলা যায় যে, ঈশ্বর জাদুবিদ্যার প্রভাবে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন" তবে

প্রকারান্তরে বলা হয় যে, চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যেখানে যত কার্য্য আছে—সবই জাদুকার্য্য। বীজহইতে বৃক্ষের উৎপত্তি, ঈথরকম্পন হইতে আলোকের অভিব্যক্তি, সচেতন ইচ্ছার বলে অচেতন দৈহিক ব্যাপার সকলের প্রবর্ত্তনা, নিদ্রা হইতে জাগরণ, জাগরণ হইতে নিদ্রা—সবই জাদুকার্য্য। এইরূপ যদি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কার্য্যই জাদুকার্য্য হয়, তবে জাদুকার্য্যের বিশেষত্ব কী আর থাকে? জাদুকার্য্যের বিশেষত্বই যদি না থাকে, তবে জাদুকার্য্যকে অন্যান্য কার্য্য হইতে বিশেষিত করিয়া তাহাকে একটা স্বতন্ত্র শ্রেণীর কার্য্যরূপে দাঁড় করাইবার প্রয়োজন কি? বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের মতে নিতান্তই তাহার প্রয়োজনাভাব; আর, সেইজন্য তাঁহারা "জাদু" "মায়া" "Miracle"—এইভাবের শব্দগুলার দলবল যেখানে যত আছে সমস্তই বিজ্ঞানরাজ্য হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু বিজ্ঞানী-দিগের এইরূপ কঠোর আইন-জারি-কার্য্যে কবির মন প্রাণান্তেও সায় দিতে পারে না। কথাটা আর কিছু না—বিজ্ঞানীর মস্তিষ্ক চক্ষুষ্মান্, হৃদয় অন্ধ; কবির হৃদয় চক্ষুষ্মান্, মস্তিষ্ক অন্ধ। এইজন্য, বিজ্ঞানীরা যাহা স্পষ্ট দেখিতে পা'ন, কবি তাহা দেখিতে পা'ন না; তেমনি আবার, কবিরা যাহা স্পষ্ট দেখিতে পা'ন, বিজ্ঞানীরা তাহা দেখিতে পা'ন না। বিজ্ঞানীরা যাহাই বলুন্ না কেন—কবির চক্ষে অঘটনঘটনাপটীয়সী পরমাশ্চর্য্য ঐশীশক্তি মহামায়াই বটে। ফল কথা এই যে, মহামায়াও যা—ঐশীশক্তিও তা;—কথা একই—কেবল ভাষা ভিন্ন। কবির ভাষায় যাহা মহামায়া—বিজ্ঞানের ভাষায় তাহাই ঐশীশক্তি। এই সকল অনির্ব্বচনীয় নিগূঢ় তত্ত্বের আলোচনা-স্থলে ভাষা লইয়া বাদ প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্তই হৃদয়-শূন্য মূঢ় ব্যক্তির কার্য্য।

তৃতীয় দ্রষ্টব্য।

বেদান্তদর্শনের আর একটি কথা এই যে, শুদ্ধসত্ত্ব বা মায়া বা **সমষ্টি**-অবিদ্যা নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূল উপাদান। তাহা তো হইবেই—যাহার গর্ব্ভে পৃথিবী জলময়, জল অগ্নিময়, অগ্নি বায়ুময়, বায়ু ঈথরময়, এবং যিনি আপনি ঈশ্বর-চৈতন্যে চৈতন্যময়ী সেই সর্ব্বধারিণী বিশ্বজননী—জগতের মূল উপাদান নহেন তো আর কী? শঙ্করাচার্য্য তাই তাঁহার সর্ব্ববেদান্তসারসংগ্রহে বলিয়াছেন।

"অনন্তশক্তি-সম্পন্নো মায়োপাধিক ঈশ্বরঃ।
ঈক্ষামাত্রেণ সৃজতি বিশ্বমেতচ্চরাচরং॥
অদ্বিতীয়ঃ স্বমাত্রোঽসৌ নিরুপাদান ঈশ্বরঃ।
স্বয়মেব কথং সর্ব্বং সৃজতীতি ন শঙ্ক্যতাং॥
নিমিত্তমপ্যুপাদানং স্বয়মেবাভবৎ প্রভুঃ।
চরাচরাত্মকং বিশ্বং সৃজত্যবতি লুম্পতি॥
স্বপ্রাধান্যেন জগতো নিমিত্তমপি কারণং।
উপাদানং তথোপাধিপ্রাধান্যেন ভবত্যয়ং॥
যথা লূতা নিমিত্তং চ স্বপ্রধানং তথা ভবেৎ।
স্বশরীর-প্রধানত্বে চোপাদানং তথেশ্বরঃ॥

ইহার অর্থ এই :—

অনন্তশক্তিসম্পন্ন এবং মায়া-উপাধির সহবর্ত্তী—এমন-যিনি ঈশ্বর, তিনি সংকল্প-মাত্রে বিশ্বচরাচর সৃজন করেন। স্বয়ং ঈশ্বর যখন অদ্বিতীয় আপনি-মাত্র এবং উপাদানরহিত, তখন তিনি জগৎ সৃষ্টি করিবেন কিরূপে এ প্রকার শঙ্কা করিও না। স্বয়ংই প্রভু নিমিত্ত

এবং উপাদান উভয়বিধ কারণ হইয়া জগৎ সৃজন পালন এবং সংহার করেন। যে অংশে তিনি স্বপ্রধান, সেই অংশে তিনি নিমিত্ত কারণ, আর, যে অংশে তিনি উপাধি-প্রধান সেই অংশে তিনি উপাদান কারণ। যেমন মাকড়সা যে অংশে স্বপ্রধান সেই অংশে তন্তুজালের নিমিত্তকারণ অর্থাৎ কর্ত্তাকারণ, আর যে অংশে শরীরপ্রধান সেই অংশে উপাদান-কারণ (অর্থাৎ মৃত্তিকা যেমন ঘটে পরিণত হয় সেইরূপ পরিণামী কারণ), ঈশ্বর তেমনি নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ দুইই একাকী আপনি। শঙ্করাচার্য্য এই যে বলিয়াছেন—

"মাকড়সা যেমন স্বীয় শরীরগুণে তন্তুজালের উপাদান কারণ, ঈশ্বর তেমনি স্বীয় উপাধিগুণে নিখিল জগতের উপাদান কারণ"

ইহাতেই উপাধি যে পদার্থটা কি তাহা প্রকারান্তরে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। উপাধি—পদার্থটা আর কিছু না—শরীর। যেমন রূপকচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে, তপ্ত অঙ্গারের দৃশ্য কিরণ-ছটা অগ্নির স্থূল শরীর, তপ্ত অঙ্গারের অদৃশ্য উত্তাপ অগ্নির সূক্ষ্ম শরীর, আর তপ্ত অঙ্গারের দাহিকা শক্তি দীপ্তি-এবং-উত্তাপ-উভয়েরই মূল কারণ এই অর্থে তাহা অগ্নির কারণ শরীর; তেমনি বলা যাইতে পারে যে, নিখিল বাহ্যজগৎ পরমাত্মার স্থূল শরীর, নিখিল অন্তর্জ্জগৎ পরমাত্মার সূক্ষ্মশরীর, আর ঐশী শক্তি যাহার দ্বিতীয় নাম মায়া এবং তৃতীয় নাম শুদ্ধ সত্ত্ব, তাহা অন্তর্বাহ্য উভয় জগতের কারণ—এই অর্থে কারণ শরীর। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেনও তা'ই। সেই সঙ্গে এটাও তিনি বলিয়াছেন যে, জীব-শরীরের যে অংশ অস্থিমজ্জারসরক্ত ত্বক্ প্রভৃতি পাঞ্চভৌতিক উপাদানে পরিগঠিত তাহা জীবের স্থূল শরীর; যে অংশ বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয় এবং প্রাণের সূক্ষ্ম উপাদানে পরিগঠিত তাহা জীবের সূক্ষ্ম শরীর; আর জীব-চৈতন্যের উপাধি-ভূত সেই যে অবিদ্যা বা

মলিনসত্ত্ব * তাহা অল্পজ্ঞতা এবং অহঙ্কারাদির কারণ—এই অর্থে তাহা জীবের কারণ-শরীর।

চতুর্থ দ্রষ্টব্য।

বেদান্তের মতে পরমাত্মা এবং জীবাত্মা উভয়েরই কারণ শরীর সুষুপ্তি-রূপী। প্রভেদ কেবল এই যে, জীবাত্মার কারণ শরীর সামান্য-গোচের সুষুপ্তি; পরমাত্মার কারণ শরীর সেই মহাসুষুপ্তি যাহার আর এক নাম প্রলয়। একটু পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, পরমাত্মার সেই যে মায়া-উপাধি যাহার আরেক নাম শুদ্ধ সত্ত্ব তাহাই তাঁহার কারণশরীর, আর তাহাতে পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু প্রভৃতি সমস্ত বস্তু একসঙ্গে মিশিয়া একাকারে পরিণত। ইহা হইতে আসিতেছে যে পরমাত্মার কারণশরীর প্রলয়রূপী। আবার, জীবের কারণশরীর যেহেতু তাহার সমস্ত শরীরের সারভূত মূল উপাদান, কিনা বৈজ্ঞানিক ভাষায় যাহাকে বলে Protoplasm, এইজন্য তাহাতেও জীবের স্থূলসূক্ষ্ম সমস্ত অবয়ব একসঙ্গে মিশিয়া একাকারে পরিণত হইবারই কথা; কাজেই তাহাও সুষুপ্তিরূপী। † বেদান্তদর্শনে

* পঞ্চদশীতে স্পষ্ট লেখা আছে যে, মায়া = শুদ্ধসত্ত্ব-প্রকৃতি, এবং অবিদ্যা = মলিনসত্ত্বা-প্রকৃতি; যথা—

"তমোরজঃ সত্ত্বগুণা প্রকৃতি দ্বিবিধা চ সা।
সত্ত্বশুদ্ধাবিশুদ্ধিভ্যাং মায়া বিদ্যে চ তে মতে॥"

† জীবাত্মার সমস্ত শরীরের সারভূত *protoplasm* যাহা তাহার মস্তিষ্কের শ্রেষ্ঠ কোষে পুঞ্জীভূত রহিয়াছে তাহা চৈতন্যের প্রতিবিম্বে চৈতন্যময়; আর, সেইজন্য আমরা মস্তিষ্কের শিখর প্রদেশে আত্মাকে উপলব্ধি করি—যদিও তাহা আত্মার প্রতিবিম্ব মাত্র—চিদাভাস মাত্র। ঐ চিদাবভাসিত জৈব সত্ত্বকে যদি চিদাত্মা হইতে বিযুক্তভাবে দেখা যায়, তবে তাহারই নাম অবিদ্যা বা *thing-in-itself*, কেননা তাহা অস্তিনাস্তি দুয়ের বা'র। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের মস্তিষ্কের অন্তর্নিগূঢ় মলিনসত্ত্ব বা ব্যষ্টিসত্ত্ব যেমন জীবচৈতন্যের প্রতিবিম্বগ্রাহী দর্পণ, বৃহৎব্রহ্মাণ্ডের মহাকাশের অন্তর্নিগূঢ় শুদ্ধ সত্ত্ব বা সমষ্টি সত্ত্ব তেমনি ব্রহ্মচৈতন্যের প্রতিবিম্বগ্রাহী দর্পণ।

আরো বলা হইয়াছে এই যে, জীবাত্মার সেই যে সুষুপ্তিরূপী কারণ-শরীর, তাহা জীবাত্মার আনন্দময় কোষ ; আর পরমাত্মার আনন্দময় কোষ হ'চ্চে সেই মহাসুষুপ্তি যাহার আরেক নাম প্রলয়। গীতায় কিন্তু লেখে

"অব্যক্তাদীনি ভুতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥"

"জানাই তো আছে যে, সৃষ্টির মধ্যই কেবল ব্যক্ত, পরন্ত তাহার আদিও যেমন—অন্তও তেমনি—দুইই অব্যক্ত, তাহার জন্য খেদ কিসের?" ফলেও ত্রইরূপ দেখা যায় যে, বৃহৎব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়ই বা কেমন ধারা আর সৃষ্টিই বা কেমনধারা তাহার রহস্য-বার্ত্তা মুখে বলিয়াছেন এবং গ্রন্থে লিখিয়াছেন নানা দেশের নানাশাস্ত্রকার, কিন্তু চক্ষে দেখেন নাই কেহই। পক্ষান্তরে, আদি এবং অন্তের মাঝের জায়গাটিতে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া-রহিয়াছি এই যে ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ড-সবাই-আমরা-এক-একটি, এ ব্রহ্মাণ্ডের আটপহুরিয়া প্রলয় এবং সৃষ্টি যে কিরূপ তাহা আমাদের কাহারো নিকটে অবিদিত নাই। তার সাক্ষী—কল্পনাকুহকিনী যখন আমাদের ধ্যানচক্ষুর সম্মুখে বিরাট অন্ধকার-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রলয়ের অভিনয় করে, তখন তাহার কোনো স্থানেই আমরা নাস্তি ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাই না ; পক্ষান্তরে আমরা যখন রাত্রিকালের সুনিদ্রা হইতে প্রভাতে গাত্রো-থান করি, :তখন সুনিদ্রা যে কি আরামের বস্তু তাহা আমাদের জানিতে বাকি থাকে না। শ্রোতৃবর্গের জানা উচিত যে, জীবাত্মা, পরমাত্মা, ঐশীশক্তি, অবিদ্যা প্রভৃতির সম্বন্ধে এতক্ষণ ধরিয়া আমি যে কয়েকটি কথা বলিলাম, তাহার একটিও আমার নিজের কথা -না—সব বেদান্তদর্শনের কথা। সত্য কি মিথ্যা—শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য

তাঁহার প্রণীত সর্ব্ববেদান্তসারসংগ্রহে জীব ঈশ্বর এবং দোঁহায় দুই উপাধিসম্বন্ধে যেরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি প্রণিধান কর :—

"মায়োপাধিক চৈতন্যং সাভাসং সত্ত্বংহিতং।
সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণকং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণং।
অব্যাকৃতং তদব্যক্তং ঈশ ইত্যপি গীয়তে॥
সর্ব্বশক্তিগুণোপেতঃ সর্ব্বাজ্ঞানাবভাসকঃ।
স্বতন্ত্রঃ সত্যসংকল্পঃ সত্যকামঃ স ঈশ্বরঃ॥
তস্যৈতস্য মহাবিষ্ণো র্মহাশক্তি র্মহীয়সঃ।
সর্ব্বজ্ঞত্বেশ্বরত্বাদিকারণত্বা ন্মনীষিণঃ
কারণং বপুরিত্যাহুঃ সমষ্টিং সত্ত্বংহিতং॥
আনন্দ প্রচুরত্বেন সাধকত্বেন কোষবৎ।
সৈষানন্দময়ঃ কোষ ইতীশস্য নিগদ্যতে॥
সর্ব্বোপরম হেতুত্বাৎ সুষুপ্তিস্থান মিষ্যতে।
প্রাকৃতো প্রলয়ো যত্র শ্রাব্যতে শ্রুতিভির্মুহুঃ॥
অজ্ঞানং ব্যষ্ট্যভিপ্রায়া দনেকত্বেন ভিদ্যতে।
অজ্ঞানবৃত্তয়ো নানা তত্তদ্‌গুণ বিলক্ষণাঃ॥
বনস্য ব্যষ্ট্যভিপ্রায়াৎ ভূরুহা ইত্যনেকতা।
যথা তথৈবাজ্ঞানস্য ব্যষ্টিতঃ স্যাদনেকতা॥

* * *

ব্যষ্টির্মলিনসত্ত্বৈষা রজসা তমসা যতঃ।
ততো নিকৃষ্টা ভবতি সোপাধিঃ প্রত্যগাত্মনঃ।
চৈতন্যং ব্যষ্ট্যবচ্ছিন্নং প্রত্যগাত্মেতি গীয়তে॥
সাভাসব্যষ্ট্যুপহিতঃ সৎ তাদাত্ম্যেন তদ্গুণৈঃ।

অভিভূতঃ স এবাত্মা জীব ইত্যভিধীয়তে।
কিঞ্চিজ্‌জ্ঞত্বানীশ্বরত্ব সংসারিত্বাদি ধর্ম্মবান্‌॥
অস্য ব্যষ্টিরহঙ্কারকারণত্বেন কারণং।
বপুস্তত্রাভিমান্যাত্মা প্রাজ্ঞ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
প্রাজ্ঞত্বমস্যৈকাজ্ঞানভাসকত্বেন সম্মতং॥

*　　*　　*

স্বরূপাচ্ছাদকত্বেনাপ্যানন্দ প্রচুরত্বতঃ
কারণং বপুরানন্দময়ঃ কোষ ইতীর্য্যতে॥
অস্যাবস্থা সুষুপ্তিঃ স্যাৎ যত্রানন্দঃ প্রকৃষ্যতে।
এষোঽহং সুখমস্বাপ্সং ন তু কিঞ্চিদবেদিষং।
ইত্যানন্দঃ সমুৎকৃষ্টঃ প্রবুদ্ধেষু প্রদৃশ্যতে॥"

ইহার অর্থ এই :—

আপনার প্রতিবিম্বের সহিত মায়া-উপাধিতে অধিষ্ঠান করিতেছেন এমন-যে সত্ত্বগুণ-পরিপুষ্ট চৈতন্য, তিনি সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণবিশিষ্ট, সৃষ্টি-স্থিতিপ্রলয়ের কারণ, অব্যাকৃত এবং অব্যক্ত, এই অর্থে ঈশ বলিয়া অভিহিত হ'ন। আর, তিনিই সর্ব্বশক্তিমান্‌ সমষ্টি-অবিদ্যার (অর্থাৎ মায়ার) অবভাসক, স্বতন্ত্র, সত্যকাম, এবং সত্যসংকল্প—এই অর্থে ঈশ্বর *। এই মহীয়ান্‌ মহাবিষ্ণুর মহাশক্তি সত্ত্বগুণে পরিপুষ্ট সমষ্টি-

* মূলে আছে "সর্ব্বাজ্ঞানাবভাসক" অর্থাৎ সমস্ত অজ্ঞানের অবভাসক। অজ্ঞান শব্দের অর্থ কিন্তু অবিদ্যা, আর, সেইজন্য "সর্ব্বাজ্ঞানাবভাসক" এই শব্দটির আমি অনুবাদ করিলাম "সমষ্টি অবিদ্যার অবভাসক"। উদ্ধৃত শ্লোকাবলীর আর আর প্রদেশেও যে যে স্থানে লেখা আছে "অজ্ঞান", সেই সেই স্থানে আমি তাহার অনুবাদ করিয়াছি "অবিদ্যা"। প্রচলিত ভাষায় অজ্ঞান শব্দের অর্থ জ্ঞানের অভাব-মাত্র, পরন্তু বৈদান্তিক ভাষায়—অজ্ঞান-শব্দে বুঝায় অবিদ্যা। "অবিদ্যা" কিনা

অবিদ্যা, আর, যেহেতু তাহা সর্ব্বজ্ঞতা এবং সর্ব্বাধিপত্যের কারণ, এই হেতু মনীষীরা তাহাকে বলিয়া থাকেন কারণ-শরীর। * তাহা আনন্দবহুল এবং কোষের ন্যায় স্বরূপের আচ্ছাদক বলিয়া তাহাকে বলা হইয়া থাকে আনন্দময় কোষ; এবং তাহা সর্ব্বজগতের লয়স্থান বলিয়া তাহাকে বলা হইয়া থাকে সুষুপ্তিস্থান; আর বেদে উক্ত হইয়াছে যে, তাহাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় †। ব্যষ্টি অভিপ্রায়ে অবিদ্যা অনেক এবং বিভিন্ন। অবিদ্যার ডালপালা অনেক এবং তাহার গুণবৈচিত্র্যও অশেষপ্রকার। বন এক হইলেও ব্যষ্টি-অভিপ্রায়ে তাহা যেমন অনেক বৃক্ষ, অবিদ্যার অনেকতাও সেইরূপ। ব্যষ্টি অবিদ্যা রজস্তমোগুণ দ্বারা মলিনসত্ত্বা বলিয়া তাহা আত্মার নিকৃষ্ট উপাধি। এই ব্যষ্টি-অবিদ্যা দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে জীবচৈতন্য তাহাকে বলা হইয়া থাকে

এক প্রকার অন্যথা-প্রদর্শনী শক্তি—সত্যকে ঢাকা দিয়া রাখিয়া অসত্যকে সত্যের মতো করিয়া সাজাইয়া দাঁড় করাইবার শক্তি। এ যে, "শক্তি", এ শক্তি আর কিছু না—Mill যাহাকে বলেন "*permanent possibility of sensation.*"

* ভাব এই যে, পরমাত্মা এক, সমষ্টি অবিদ্যা সর্ব্ব। একজ্ঞান যে, এইরূপ-সর্ব্বজ্ঞান-রূপে প্রকাশ পায়—সর্ব্বই (অর্থাৎ সমষ্টি অবিদ্যাই) তাহার কারণ।

† প্রলয়ের নাম শুনিলে কাহার না গা কাঁপে? অনতিপূর্ব্ব-কালের সুসভ্য লোকেরাও ধূমকেতু কখন্ আসেন কখন্ যা'ন তাহার ঠিকানা না পাইয়া মনে করিতেন যে, উনি প্রলয়ের গুপ্তচর তাহাতে আর ভুল নাই। অথচ ধূমকেতু এমনি সহৃদয় ভদ্রপ্রকৃতির জ্যোতিষ্ক যে, কিয়ৎবৎসরপূর্ব্বে পৃথিবীপৃষ্ঠে তাঁহার পায়ের ধুলা পড়িয়াছিল (অথবা যাহা আরো ঠিক্—ল্যাজের ঝাপোট্ পড়িয়াছিল) এম্নি সখারসার্দ্র শান্তশিষ্ট সুকোমলভাবে যে, পৃথিবী তাহা জানিতেও পারে নাই। অতএব ইহাই বেশী সম্ভব বলিয়া মনে হয় যে, আমাদের এই ধাত্রীমণি-রজনী যেমন সন্ধ্যার মধ্য দিয়া সুধীরে আগমন করে, ব্রহ্মার মহারজনী তেমনি যুগযুগান্তরব্যাপী মহাসন্ধ্যার মধ্যদিয়া মহাধীরভাবে আগমন করিবে। হয় তো সত্ত্বগুণের প্রাদুর্ভাববশতঃ রজস্তমোগুণ, আর সেই সঙ্গে মনুষ্যের বংশবৃদ্ধি, ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে পাইতে পরিশেষে এমন এক সময় উপস্থিত হইবে যে, তখন পৃথিবীর ত্রিসীমার মধ্যে জন-মানব নাই; আর, সেই অবসরে পৃথিবী ধীরে ধীরে আপনার পিত্রালয়ে অর্থাৎ রসাতলে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।

প্রত্যগাত্মা। এই ব্যষ্টি-অবিদ্যারূপী উপাধিতে স্বীয় প্রতিবিম্বের সহিত বর্ত্তমান, আর, সেই উপাধির সহিত একীভূত হওয়া-গতিকে তাহার গুণত্রয়ে অভিভূত—এমন-যে অল্পজ্ঞ পরতন্ত্র এবং সংসারী চৈতন্য, তাহা জীব-নামে অভিহিত হয়। ব্যষ্টিঅবিদ্যা অহঙ্কারের কারণ বলিয়া তাহাকে বলা হইয়া থাকে জীবের কারণ-শরীর। কারণ-শরীরাভিমানী জীবচৈতন্যকে পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন প্রাজ্ঞ; তাহাকে তাঁহারা প্রাজ্ঞ বলেন এইজন্য—যেহেতু তাহা ব্যষ্টি-অবিদ্যার অবভাসক। জীবেরও কারণ-শরীর স্বরূপের আচ্ছাদক এবং আনন্দ-বহুল বলিয়া তাহাকে বলা হইয়া থাকে আনন্দময় কোষ। সুষুপ্তির অবস্থাই প্রকৃষ্ট আনন্দের অবস্থা। সুষুপ্তিকালের পরমানন্দ স্মরণ করিয়াই সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি বলে—"গতরাত্রে পরমসুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম—কোন্ দিক্ দিয়া রাত্রি প্রভাত হইল তাহা জানিতেও পারি নাই।"

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, বেদান্তদর্শনের মতে প্রলয়রূপী ঐশ্বরিক কারণ-শরীর এবং সুষুপ্তিরূপী জৈব কারণ-শরীর দুইই আনন্দময় কোষ। প্রলয়ের বৃহৎ ব্যাপারটাকে আপাততঃ না ঘাঁটাইয়া সুষুপ্তির সহিত আনন্দময় কোষের কিরূপ সম্বন্ধ—অগ্রে তাহারই তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাক্।

নিদ্রা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত (১) তামসিক, (২) রাজসিক, (৩) সাত্ত্বিক। একপ্রকার পাশবপ্রকৃতির নিদ্রা আছে যাহা ভূরিভোজন এবং মাদক দ্রব্য সেবনাদির ফলস্বরূপ—ইহাই তামসিক নিদ্রা; আর একপ্রকার নিদ্রা আছে যাহা স্বপ্নের উপদ্রবে অশান্তিময়—ইহাই রাজসিক নিদ্রা; তৃতীয় আর এক প্রকার নিদ্রা আছে যাহা শারীরিক মানসিক এবং আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের ফলস্বরূপ, আর

সেই জন্য স্বর্গসুখের পূর্ব্বাভাস—ইহাই স্বাত্ত্বিক নিদ্রা, আর, তাহারই নাম সুষুপ্তি। সুষুপ্তির মন্দাকিনীস্নানে সুপ্ত ব্যক্তির মন হইতে সমস্ত শ্রমক্লম নিঃশেষে ধৌত হইয়া গিয়া যখন তাহার স্থানে সুনির্ম্মলা শান্তি একাকী বিরাজ করিতে থাকে, তখন তাহার অন্তঃকরণের গূঢ়তম প্রদেশে আনন্দময় কোষের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া যায় এবং তাহার মধ্যদিয়া পরমাত্মার সুমঙ্গল শান্তি তাহার শরীর মনের উপরে স্বচ্ছন্দ-মতে কার্য্য করিতে পথ পায়। ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, কোনো সুস্থশরীর পুণ্যাত্মা রাত্রিকালে সুষুপ্তির স্বর্গে বাস করিয়া প্রাতঃকালে যখন মর্ত্ত্যে আগমন করেন, তখন, বুদ্ধির প্রসন্নতা, মনের স্ফূর্ত্তি, প্রাণের শান্তি, দেহের স্বচ্ছন্দতা সঙ্গে-করিয়া প্রত্যাগমন করেন, তা বই, শূন্যহস্তে প্রত্যাগমন করেন না। ইহার ভিতরে একটি নিগূঢ় রহস্য আছে, তাহা ভাঙ্গিয়া বলিতেছি—প্রণিধান কর।

পূর্ব্বে ঢের বলিয়াছি এবং এখানে ফের বলিতেছি যে, তোমারও যেমন, আমারও তেমনি, আর, তৃতীয় যে কোন ব্যক্তি—যেমন দেবদত্ত—তাহারও তেমনি, সত্তার সঙ্গে বর্ত্তিয়া থাকিবার ইচ্ছা অবিচ্ছেদে লাগিয়া আছে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, বর্ত্তিয়া থাকিবার সেই যে ইচ্ছা—আসে তাহা কোথা হইতে? আসে যে তাহা কোথা হইতে তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। সত্তার প্রকাশ হইলেই সত্তার রসানুভূতি হয়, সত্তার রসানুভূতি হইলেই সত্তার প্রতি প্রেম জন্মে, প্রেমের উপরে আনন্দের গোড়া পত্তন হয়, আর; সেই প্রেমানন্দের সঙ্গে এইরূপ একটি সদিচ্ছা আপনা হইতেই আসিয়া যোটে যে "সত্তা চিরজীবী হইয়া বর্ত্তিয়া থাকুক।" এইরূপ দেখা যাইতেছে যে সদিচ্ছার মূলে প্রেমানন্দ চাপা দেওয়া রহিয়াছে—প্রেমানন্দের মূলে চিৎপ্রকাশ চাপা দেওয়া রহিয়াছে। এখন দ্রষ্টব্য

এই যে, সদিচ্ছার উৎপত্তি হইয়াছে যেমন প্রেমানন্দের অনুভূতি হইতে, সদিচ্ছার চরম উদ্দেশ্যও তেমনি প্রেমানন্দের অনুভূতি। কিন্তু এইমাত্র দেখিলাম যে, সত্তার প্রকাশ না হইলে সত্তার প্রতি প্রীতি-জনিত আনন্দ অনুভূত হইতে পারে না। অতএব, যাহাকে বলিতেছি সদিচ্ছা তাহা বর্ত্তিয়া থাকিবার ইচ্ছা তো বটেই তা ছাড়া—তাহা চিদালোকে এবং প্রেমানন্দে বর্ত্তিয়া থাকিবার ইচ্ছা। অতঃপর দ্রষ্টব্য এই যে, চিদালোকে এবং প্রেমানন্দে বর্ত্তিয়া থাকিবার এই যে ইচ্ছা—এ ইচ্ছা ইচ্ছামাত্র নহে—পরন্তু উহা আত্মশক্তিরই আর এক নাম। কেননা, সমষ্টিসত্তার বাহিরে যখন দ্বিতীয় কোনো সত্তা নাই, তখন, সমষ্টি সত্তা যে, আপনার স্বাভাবিকী শক্তি ব্যতিরেকে অপর কোন শক্তির আশ্রয়ে ভর করিয়া নিত্য কাল বর্ত্তমান, একথা একেবারেই অগ্রাহ্য। দাহিকাশক্তি যেমন অগ্নির অগ্নিত্ব, কাব্যরচনা-শক্তি যেমন কবির কবিত্ব, তেমনি, চিদালোকে এবং প্রেমানন্দে বর্ত্তিয়া থাকিবার শক্তি চিদানন্দস্বরূপ সদ্‌বস্তুর সত্ত্ব; আর, সদ্‌বস্তুর সেই যে, সত্ত্ব, তাহা রজস্তমোগুণদ্বারা অবাধিত এবং পরমপরিশুদ্ধ বলিয়া উপনিষদে উক্ত হইয়াছে "স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া (সা)" পরমাত্মার জ্ঞানক্রিয়া এবং বলক্রিয়া (অর্থাৎ ঐশীশক্তি) স্বাভাবিকী। এই সঙ্গে আর একটি কথা দ্রষ্টব্য এই যে, ব্যষ্টিসত্তা যখন সমষ্টিসত্তা হইতেই আসিয়াছে, তখন ব্যষ্টিসত্তাতে সমষ্টিসত্তার গুণ ন্যূনাধিক পরিমাণে কিছু না কিছু থাকিবেই থাকিবে। মনুষ্যের তো কথাই নাই—অধম শ্রেণীর জীবেরাও একপ্রকার বাধাবিঘ্নের প্রতিকূলে আপনার আপনার সত্তা বাঁচাইয়া রাখিতে সর্ব্বদাই সচেষ্ট। এখন প্রকৃত কথা যাহা তাহা এই :—

একটুপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, সদিচ্ছার উৎপত্তি হইয়াছে যেমন

আনন্দের অনুভূতি হইতে, সদিচ্ছার চরম উদ্দেশ্যও তেমনি আনন্দের অনুভূতি ; আর, এইমাত্র দেখিলাম যে, সেই যে সদিচ্ছা অর্থাৎ সকলে মিলিয়া চিদালোকে এবং প্রেমানন্দে বর্ত্তিয়া থাকিবার ইচ্ছা, তাহা শক্তিময়ী প্রবলা ইচ্ছা, তা বই, তাহা ফাঁকা ইচ্ছা নহে। তবেই হইতেছে যে, সেই যে শক্তিময়ী ইচ্ছা বা ইচ্ছাশক্তি, অথবা যাহা একই কথা—আত্মশক্তি, তাহার গোড়াতেও আনন্দ, শেষেও আনন্দ ; মাঝে শক্তির খাটুনি। গোড়ায় যেখানে আত্মশক্তি সুপ্তিগর্ত্তে বিশ্রাম করে, সেখানেও জীবাত্মার ভোগের জন্য আনন্দের নৈবেদ্য সাজানো থাকে ; আবার মাঝপথে যেখানে আত্মশক্তি উদ্যমের সহিত কার্য্য খাটে, সেখানেও আনন্দ ধ্রুবতারার ন্যায় চক্ষের সম্মুখে ভাসিতে থাকে। এখন কথা হইতেছে এই যে, প্রকাশের বাধা কিনা জড়তা এবং আনন্দের বাধা কিনা অশান্তি, এই দুইপ্রকার বাধা অতিক্রম করাই জীবাত্মার আত্মশক্তির মুখ্য কার্য্য। একদিনের মতো বাধা অপসারিত হইলেই আত্মশক্তির একদিনের কার্য্য পরিসমাপ্ত হয় ; আর তাহা যখন হয়, তখন, সেই অবসরে আত্মশক্তি সেদিনকার মতো বিশ্রাম করে। যে পরিমাণে আত্মশক্তি দিনগত বাধাবিঘ্নের উপরে জয়-লাভ করে, সেই পরিমাণে চিৎপ্রকাশ এবং প্রেমানন্দ বাধামুক্ত হয়। আবার, আত্মশক্তির বিশ্রাম কালে সেই যথাপরিমাণে-বাধামুক্ত প্রকাশ এবং আনন্দ'কে সঙ্গে লইয়া জীবাত্মা সুষুপ্তির আরামনাড়ে প্রবেশ করে ; আর সেই গতিকে সুষুপ্তির নিভৃত নিকেতনে চিৎপ্রকাশ এবং আনন্দ উভয়েই একত্রে মিলিত হয়। তবে কিনা—চিৎপ্রকাশ সুষুপ্তির সঙ্গে মিশিয়া ঘনীভূত বা একীভূত হইয়া যায়, আর, সেই জন্য বেদান্তশাস্ত্রে সুষুপ্তিকে বলা হইয়া থাকে "প্রজ্ঞান-ঘন" ; আনন্দ জীবাত্মার ভোগের জন্য অনাবৃত হয়, আর, সেই জন্য বেদান্তশাস্ত্রে

সুষুপ্তিকে বলা হইয়া থাকে আনন্দময় কোষ। সুষুপ্তিকালে চিৎপ্রকাশ যদি মূলেই বর্ত্তমান না থাকিত—সুপ্তির সঙ্গে মিশিয়া সুপ্তবৎভাবেও বর্ত্তমান না থাকিত, তাহা হইলে সুষুপ্তিতে আনন্দ অনুভূত হইতে পারিত না; কেননা (একটু পূর্ব্বে যেমন দেখিয়াছি) সত্তার প্রকাশ ব্যতিরেকে আনন্দের অনুভূতি সম্ভবে না; আর সুষুপ্তিতে যদি আনন্দের অনুভূতি না হইত, তাহা হইলে সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি কখনই এত বড় একটা মিথ্যা কথা মুখে উচ্চারণ করিতে সাহসী হইত না—যে, "কাল্ রাত্রে আমি পরম সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম।'

ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের সুষুপ্তি এই যেমন আনন্দময় কোষ; বৃহৎব্রহ্মাণ্ডের মহাসুষুপ্তি, যাহার নাম প্রলয়, তাহাও তেমনি আনন্দময় কোষ হইবারই কথা, কেননা, বৃহৎব্রহ্মাণ্ড এবং ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সমষ্টি ব্যষ্টি সম্বন্ধ। প্রভেদ কেবল এই যে, ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডে, পূর্ব্বরাত্রের আনন্দ হইতে পররাত্রের আনন্দে প্রয়াণ করিবার সময় মাঝের পথে বাধাবিঘ্নের সহিত আত্মশক্তির সংগ্রাম এবং তজ্জনিত দুঃখক্লেশ অনিবার্য্য; পরন্তু, বৃহৎব্রহ্মাণ্ডে, ঐশীশক্তির মূলেই বা কি—শেষেই বা কি—আর মাঝেই বা কি, সর্ব্বত্রই আনন্দের অমৃত ধারা চির-প্রবাহমান। একটু-পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, জীবাত্মার আত্মশক্তি যে-পরিমাণে দিনগত বাধাবিঘ্নের উপরে জয়লাভ করে, সেই পরিমাণে চিৎপ্রকাশ এবং প্রেমানন্দ বাধামুক্ত হয়, আর আত্মশক্তির বিশ্রামকালে—সেই পরিমাণে বাধামুক্ত প্রকাশ এবং আনন্দকে সঙ্গে লইয়া জীবাত্মা সুষুপ্তির আরাম নীড়ে প্রবেশ করে। এখন কথা হইতেছে এই যে, "সম্মুখের বাধাবিঘ্ন অপক্রান্ত হইলেই ঈশ্বরপ্রসাদে আনন্দের অভ্যুদয় হইবে' এই বিশ্বাসে ভর করিয়া জীবাত্মার আত্মশক্তি যদিচ খাটুনি'র কষ্টকে কষ্টজ্ঞান করে না, তথাপি তাহাকে কষ্ট করিয়া গন্তব্য পথে প্রতিপদ অগ্রসর হইতে

হয় তাহাতে আর ভুল নাই। এক প্রকার খাটুনি আছে—ইংরাজি ভাষায় যাহাকে বলে Labour of love—প্রীতির খাটুনি। মোটা-মুটি বলা যাইতে পারে যে, রামায়ণের রচনা-কার্য্যে বাল্মীকি মুনি যেরূপ খাটিয়াছিলেন, তাহা প্রীতির খাটুনি; কিন্তু তথাপি তাঁহার সেই সাধের রচনাকার্য্যটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পরিপাটীরূপে সুসম্পন্ন করিয়া তুলিতে তাঁহাকে বিলক্ষণই কষ্ট পাইতে হইয়াছিল;—নারদ মুনির নিকট হইতে রামের সমস্ত জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল;—আবার, ক্রৌঞ্চীপক্ষীটির জন্য তাঁহাকে যেরূপ মর্ম্মবেদনা ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা একপ্রকার সরস্বতীর গর্ভবেদনা! দুঃসহ শোকসন্তাপে তাঁহার মন যখন কিছুতেই শান্তি মানিতেছিল না—সেই মুখ্য সময়-টিতে লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার নয়ন-সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন; আর-অম্নি—ব্রহ্মা'র দৈবশক্তিময়ী অভয়বাণীতে তাঁহার মনোমধ্যে কবিত্বরসের উৎস উন্মুক্ত হইয়া গেল। তবেই হইতেছে যে, রামায়ণের রচনা-কার্য্যে প্রীতির খাটুনি এবং কষ্টের খাটুনি দুইই একসঙ্গে জড়ানো ছিল। পরন্তু জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-কার্য্যে ঐশীশক্তির যেরূপ অনুলোম-প্রতিলোম ক্রম-পদ্ধতির কথা দর্শনাদি শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা নিখুঁত আনন্দ-সঙ্গীত; তাহা পরমাত্মার স্বাভা-বিকী জ্ঞানবলক্রিয়া; তাহা একান্ত পক্ষেই বাধাবিহীন; তাহার কোথাও কোনো স্থানে কষ্টকল্পনার নামগন্ধও নাই। ঐশীশক্তিতে বিশ্রামের আনন্দ এবং উদ্যমের স্ফূর্ত্তি নিশ্বাস এবং প্রশ্বাসের ন্যায় একসূত্রে গ্রথিত এবং উভয়ে উভয়ের প্রতিপোষক। অতএব এটা স্থির যে, ঐশীশক্তি নিত্যানন্দময়ী। এই যে নিত্যানন্দময়ী ঐশীশক্তি ইহাই নিত্য সত্ত্ব। এই নিত্য সত্ত্বের অমৃত-ভাণ্ডার সর্ব্বজগতের মঙ্গলের জন্য নিরন্তর উন্মুক্ত রহিয়াছে। যাহাতে অমৃতের পুত্র-

কন্যারা সকলে মিলিয়া চিদালোকে এবং প্রেমানন্দে বর্ত্তিয়া থাকিতে পারে, আত্মার এই অন্তরতম সদিচ্ছাটিকে বলবতী এবং ফলবতী করিবার অভিপ্রায়ে মনুষ্যের আত্মশক্তি যদি সম্মুখস্থিত বাধাবিঘ্নের অপনয়ন-কার্য্যে কায়মনোবাক্যে সচেষ্ট হয়, তাহা হইলে, আত্মশক্তি একদিনের কার্য্য একদিনের মতো সুসম্পন্ন করিয়া রাত্রিকালে যখন সুষুপ্তির আনন্দময় কোষে বিশ্রাম করে, তখন পরমাত্মার সেই অমৃত-ভাণ্ডার হইতে—স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া হইতে—নিত্যসত্ত্ব হইতে—সুনির্ম্মল আত্মপ্রসাদ শান্তি তৃপ্তি এবং আরোগ্য অবতীর্ণ হইয়া সুষুপ্ত ব্যক্তির নির্জ্জীব শরীরে নবজীবনের সঞ্চার করে; আর, পরমাত্মার প্রসাদ-লব্ধ সেই যে নবজীবন, যাহা সদাচারপরায়ণ পুণ্যাত্মারা সুষুপ্তির হস্ত হইতে প্রাপ্ত হ'ন, তাঁহাদের নিকটে তাহা অমূল্য ধন, কেননা, পরদিনের কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহারা তাহা বিধিমতে কাজে খাটাইয়া তাহা হইতে সোণা ফলাইয়া তোলেন।

মনে কর, রাজর্ষি জনক সমস্তদিন তাঁহার অধীনস্থ প্রজাদিগের মুখে তাহাদের নানা প্রকার দুঃখের কাহিনী শ্রবণ করিয়া তাহার প্রতিবিধান-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। সন্ধ্যার সময়ে তিনি এম্নি শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে, প্রজাদিগের জন্য তিনি কি করিয়াছেন না-করিয়াছেন তাহার বিশেষ বিবরণ কিছুই তখন তাঁহার মনোমধ্যে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে না, কেবল মোটের উপরে তিনি যে প্রজাবর্গের হিতানুষ্ঠানে ব্যাপৃত ছিলেন—এই মোট জ্ঞানটি তাঁহার অন্তঃকরণে আত্মপ্রসাদের জ্যোৎস্না বিকীর্ণ করিতেছে। এই যে মোট জ্ঞান এবং তজ্জনিত আত্মপ্রসাদ, এই দুইটি পুণ্যফল লইয়া তিনি যখন সুষুপ্তির আরামনীড়ে প্রবেশ করিবার উদ্‌যোগ করিতেছেন, তখন তাঁহার এরূপ মনে হইতেছে না যে, "আমি এক্ষণে সর্ব্বসংহারক মৃত্যুর

ভীষণ বন্দিশালায় প্রবেশ করিতেছি” পরন্তু ঠিক তাহার বিপরীত। তাঁহার মনে হইতেছে “আমি এক্ষণে সর্ব্বসন্তাপহারিণী জগজ্জননীর ক্রোড়ে নিলীন হইতেছি।” এ যাহা তাঁহার মনে হইতেছে—বাস্তবিকই তা'ই। কেননা সুষুপ্তির আনন্দময় কোষ হইতে আনন্দামৃত পান করিয়া যাবৎ পর্য্যন্ত না তাঁহার শরীর সবল হয়, প্রাণ ঠাণ্ডা হয়, মন তৃপ্ত হয় এবং বুদ্ধি প্রসন্ন হয়, তাবৎপর্য্যন্ত সেই স্নেহময়ী জননী তাঁহাকে অপনার শান্তিসদনের পরিধির মধ্যে যত্নের সহিত আগলিয়া রাখেন। এখন কথা হইতেছে এই যে, সুষুপ্তিকালে সুপ্ত ব্যক্তির অজ্ঞাতসারে তাঁহার মনের যেরূপ প্রশান্ত সরল এবং নির্ম্মল অবস্থা স্বভাবত ঘটিয়া দাঁড়ায়, তেমনি, জাগ্রৎকালে যদি কোনো সাধক সজ্ঞানভাবে আত্মশক্তি খাটাইয়া আপনার মন হইতে বিষয়-বাসনা এবং অহঙ্কারাদি ধৌত করিয়া ফ্যালেন, তবে তাঁহারও মনের সেইরূপ প্রশান্ত সরল এবং নির্ম্মল অবস্থা ঘটিয়া দাঁড়াইবারই কথা; আর তাহা যখন ঘটিয়া দাঁড়ায় তখন পরমাত্মার স্বাভাবিকী জ্ঞানবল-ক্রিয়া হইতে—নিত্যসত্ত্ব হইতে—প্রজ্ঞাজ্যোতি এবং আনন্দামৃত অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার সমস্ত অভাব ঘুচাইয়া দ্যায়। এরূপ মহাত্মারা আপনার জন্য নির্ভাবনা এবং নিশ্চিন্ত; ইঁহারা “নির্যোগক্ষেম”। ইঁহাদের নিকটে আপনার মঙ্গল এবং অন্যের মঙ্গল—দুই মঙ্গল নহে, পরন্তু সব মঙ্গলই এক মঙ্গল; ইঁহাদের কার্য্যও তদনুরূপ। আর সেইরূপ কার্য্যে ইঁহাদের আত্মশক্তি নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায়—যখন খাটিবার হয় তখন খাটে, যখন বিশ্রাম করিবার হয় তখন বিশ্রাম করে; ইঁহাদের আত্মশক্তি অনেক পরিমাণে বাধা-মুক্ত; ইঁহারা “আত্মবান্”। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে “নিত্যসত্ত্বস্থ” হওয়া “নির্য্যোগক্ষেম” হওয়া এবং “আত্মবান” হওয়া একই ব্যাপার।

কেহ যদি মনে করেন যে, সুষুপ্তি কেবল সুষুপ্ত অবস্থারই নিজস্ব ধন, তবে সেটা তাঁহার বড়ই ভুল। তাঁহার জানা উচিত যে, জাগরিতাবস্থাতে সবই আছে—বুদ্ধির জাগরণও আছে, মনের স্বপ্নও আছে, প্রাণের সুষুপ্তিও আছে; আর তিনের সামঞ্জস্য লোকমধ্যে দুর্লভ হইলেও মঙ্গলকামী ব্যক্তির পক্ষে তাহা অতীব প্রার্থনীয়। বড় বড় চিত্রকরদিগের চিত্ররচনার একটি প্রধান গুণ হচ্চে—জাগ্রৎসুষুপ্তি; আর, সে-যে সুষুপ্তি অর্থাৎ চিত্রময়ী জাগ্রৎসুষুপ্তি, তাহার ইংরাজি পারিভাষিক নাম Repose *। অব্যবসায়ী লোকদিগের অভিধানে বুক-ফোলানো, চক্ষুরাঙানো, এবং বাহু আস্ফালন করা'র নামই বীরত্ব;—ফলে, বীরত্ব যে কাহাকে বলে তাহা নেলসন্ জানিতেন; আর তাহা জানিতেন বলিয়া—ভীষণ জলযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার প্রারম্ভ মুহূর্ত্তে সমস্ত মানোয়ারি সৈন্যবর্গকে সামনে ডাকিয়া তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন শুধু এই যে, England expects every man to do his duty ইংলণ্ড চা'ন—প্রতিজন আপনার কর্ত্তব্য করে। ভাব এই যে, "তোমরা যেমন সুনিশ্চিন্ত মনে আর-আর কর্ত্তব্য কার্য্য সমাধা কর, উপস্থিত কর্ত্তব্য কার্য্যও সেইরূপ সুনিশ্চিন্ত মনে সমাধা কর।" ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, সঙ্গতিপন্ন গৃহীব্যক্তিরা যেরূপ নিশ্চিন্তমনে বন্ধুবর্গের সহিত প্রীতিভোজনে উপবিষ্ট হ'ন—হাড়পাকা যোদ্ধারা অর্থাৎ Veteran শ্রেণীর যোদ্ধারা সেইরূপ নিশ্চিন্ত মনে তোপের মুখে অগ্রসর হয়। ইহারই নাম Repose। সিংহপ্রকৃতির যোদ্ধাবীরদিগের যুদ্ধকার্য্যে এই যেমন একপ্রকার জাগ্রৎ সুষুপ্তির ভাব

---

* Library Dictionary তে এইরূপ লেখে:—
Repose, in the fine art, that harmony and moderation which affords rest for the eye.

দেখিতে পাওয়া যায়, বুদ্ধদেব এবং ঈসামহাপ্রভুর ন্যায় ধর্ম্মবীরদিগের অন্তঃকরণে এবং আচার ব্যবহারে তাহা অপেক্ষা তাহা আরো সুপরিস্ফুটভাবে বিরাজমান দেখিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভকালে ইহুদীদেশীয় ফারিসীদিগের অভিধানে ধর্ম্মের নিশান ওড়ানো'র নামই ছিল ধর্ম্ম; কিন্তু ঈসা তাঁহার শিষ্যবর্গকে সম্মুখে জড়ো করিয়া তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তোমরা যখন দান করিবে, তখন তোমাদের ডা'ন হাত কি করিতেছে—বাঁ হাত যেন তাহা জানিতে না পারে। প্রকৃত কথা এই যে, কোনোপ্রকার মঙ্গলের উদ্দেশে আত্মশক্তিকে বিধিমতে কার্য্যে খাটাইতে হইলে বুদ্ধিকে জাগ্রত করা সাধকের পক্ষে যেমন আবশ্যক, অশান্ত এবং দুর্দ্দান্ত মন'কে সুষুপ্তির শান্তিসলিলে অবগাহন করানোও তেমনি আবশ্যক। কিন্তু তাহা হইতে পারে কেমন করিয়া? গীতাশাস্ত্রের উপদেশ এই যে, মনুষ্যের অন্তরাত্মার সুনিভৃত প্রদেশে রজস্তমোগুণদ্বারা অবাধিত যে এক মহাসত্তা পরমাত্মাতে ওতপ্রোত রহিয়াছে—যাহা পরমাত্মার স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া—যাহাকে কোনো প্রকার দুঃখক্লেশও স্পর্শ করিতে পারে না—অশান্তিও স্পর্শ করিতে পারে না—জড়তাও স্পর্শ করিতে পারে না—সেই নিত্য সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেই মনুষ্যের মন অটল প্রশান্তি এবং স্থিরত্ব লাভ করে। ব্যাপারটি সামান্য নহে—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ! তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইলে কত না প্রভূত পরিমাণে আত্মশক্তির পুঁজি সংগ্রহ করা আবশ্যক? অর্জ্জুনের ধনুক যেমন বিশ্ববিজয়ী গাণ্ডীব ধনু, অর্জ্জুনের তুণীর যেমন অক্ষয় তুণীর, অর্জ্জুনের রথধ্বজা যেমন দুদ্ধর্ষ ভীষণ মহাকপি; অর্জ্জুনের আধ্যাত্মিক রণসজ্জা তেমনি উহাদেরই সঙ্গে পাল্লা দিতে পারিবার মতো বিরাট ছাঁচের হওয়া চাই; অর্জ্জুনের ধৈর্য্য-বীর্য্য হিমালয় পর্ব্বতের ন্যায় অটল হওয়া চাই; অর্জ্জুনের জ্ঞাননেত্র

নিস্তরঙ্গ স্বচ্ছ সরোবরের ন্যায় স্বর্গমর্ত্ত্যঅন্তরীক্ষের পরিস্কার প্রতিবিম্বগ্রাহী দর্পণ হওয়া চাই ; বিশেষত, অর্জ্জুনকে, ব্রহ্মের আনন্দের সহিত পরিচিত হওয়া চাই ; কেননা, উপনিষদে আছে "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন—ন বিভেতি কদাচন" "ব্রহ্মের আনন্দের সহিত যিনি পরিচিত হইয়াছেন তিনি কুত্রাপি ভয় প্রাপ্ত হ'ন না—কদাপি ভয় প্রাপ্ত হ'ন না।" শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রাণতুল্য প্রিয় অর্জ্জুনকে এই সকল আধ্যাত্মিক ব্রহ্মাস্ত্রে সুসজ্জিত করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে এইরূপ উপদেশ দিতেছেন যে, যাহারা ত্রৈগুণ্যের সেবক তাহারা বেদাদি শাস্ত্রই জানে সার—তুমি অর্জ্জুন নিস্ত্রৈগুণ্য হও, নির্দ্বন্দ্ব হও, নিত্যসত্ত্বস্থ হও, নির্যোগক্ষেম হও, আত্মবান্ হও।

একাদশ অধিবেশন।

ব্যাখ্যান।

পূর্ব্বপ্রপাঠে যে শ্লোকটির অর্থ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহার পরবর্ত্তী আটটি শ্লোকের সারাংশ একটি শ্লোকেই পর্য্যাপ্ত। সে শ্লোকটি এইঃ—

(শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন)

"যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গংত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥"

ইহার অর্থ এইঃ—

যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম কর, ধনঞ্জয়। কি ভাবে? না নিঃসঙ্গভাবে—নির্লিপ্তভাবে—অনাসক্তভাবে। আর কি ভাবে? না সিদ্ধি-অসিদ্ধির প্রতি সমদর্শিভাবে। সমত্বেরই নাম যোগ।

এখানে চারিটি বিষয় সবিশেষ দ্রষ্টব্য।

প্রথম দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বমঙ্গলালয় পরমেশ্বরের সহিত যোগে যুক্ত হইয়া যাঁহারা কর্ম্ম করেন—তাঁহাদের সেই যোগই তাঁহাদের নিকটে সিদ্ধির পরাকাষ্ঠা। এ যে সিদ্ধি—এ সিদ্ধির নাম পুরুষার্থসিদ্ধি। এ সিদ্ধির জন্য যিনি যত্ন করেন—গীতায় তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে তিনি সহস্রের মধ্যে এক জন—"মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।" ইহা ব্যতীত আর এক প্রকার সিদ্ধি আছে যাহার নাম স্বার্থসিদ্ধি। সচরাচর লোকের নিকটে স্বার্থ-সিদ্ধিই সিদ্ধি—স্বার্থহানিই অসিদ্ধি; পরন্তু যোগস্থ ব্যক্তির নিকটে (যেমন

বলিলাম) যোগই পরম সিদ্ধি ; তা বই, স্বার্থসিদ্ধি হয় হউক্, না হয় না হউক্, দুইই তাঁহার নিকটে সমান।

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য।

এখানে প্রশ্ন-একটি উঠিতে পারে এই যে, তাহা যদি হয়—এরূপ যদি হয় যে, যোগস্থ ব্যক্তির নিকটে যোগই পরাকাষ্ঠা সিদ্ধি, তবে তো তিনি সিদ্ধ হইয়া চুকিয়াছেন—কর্ম্মানুষ্ঠানে কী তাঁহার প্রয়োজন? ইহার উত্তর এই যে, যোগশাস্ত্রের তান্ত্রিক (technical) ভাষায় যাহাকে বলে "মৈত্রী" অর্থাৎ লোকের সহিত সমদুঃখসুখিতা, তাহা যোগের একটি প্রধান অঙ্গ। যিনি আপনাকে জানেন যোগী মহাপুরুষ—অথচ যিনি হিতানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ, তাঁহার যোগ যোগই নহে। মহোদ্যমশালী সেনাপতি স্বয়ং যখন অশ্বপৃষ্ঠে অসিহস্তে বিরাজমান, তখন যে সৈন্য অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া দিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাইয়া বসিয়া থাকে, তাহার সম্বন্ধে যেমন এ কথা খাটে না যে, সে—সেনাপতির সহিত যোগযুক্ত ; তেমনি পরমেশ্বর স্বয়ং যখন সকল মঙ্গলের জাগ্রত জীবন্ত অধিনায়ক, তখন যে সাধক আপনার অধিকারায়ত্ত মঙ্গল কার্য্য হইতে বিরত হইয়া নৈষ্কর্ম্ম্য-ব্রত ধারণ করেন, তাঁহার সম্বন্ধে এ কথা খাটে না যে, তিনি পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত।

তৃতীয় দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন।—তবে কি তুমি বলো যে, কোনো সাধক যদি আর আর সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া জনশূন্য নিভৃত স্থানে বসিয়া যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হ'ন—তাঁহার পক্ষে তাহা অনুচিত কার্য্য?

উত্তর।—তাহা আমি বলি না। আমি বলি এই যে, পাঠাভ্যাসেরও সময় আছে, যোগাভ্যাসেরও সময় আছে। বিদ্যার্থী ব্যক্তিরা

চিরকালই কিছু-আর সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে বসিয়া পাঠাভ্যাস করেন না। এটা যেমন সত্য যে, তাঁহাদের পঠদ্দশায় তাঁহারা সব কাজ ছাড়িয়া নির্জ্জনে বসিয়া পাঠাভ্যাসে রত হ'ন; এটাও তেমনি সত্য যে, তাঁহাদের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে তাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া শিক্ষিত বিদ্যাকে কাজে খাটা'ন্। প্রকৃত কথা এই যে, সাধনের প্রথম অবস্থায় নির্জ্জন-বাস সাধকের পক্ষে নিতান্তই প্রয়োজন হয়, আর, প্রয়োজন হয় বলিয়াই তাহা শোভা পায়। পরন্তু, সাধনের প্রথম অবস্থায় সাধকের পক্ষে তাহা শোভা পায় বলিয়া কেহ যদি মনে করেন যে, তাহা সিদ্ধাবস্থার পরিচয়-লক্ষণ, তবে সেটা তাঁহার বড়ই ভুল। যে বীজ মাত্রাতীত দীর্ঘকাল মাটি-চাপা থাকে সে বীজ মাটি হইয়া যায়; পক্ষান্তরে, যে বীজ যথাসময়ে অঙ্কুরিত, শাখান্বিত, পল্লবিত, পুষ্পিত হইয়া, পরিশেষে ফলে পরিণত হয়, সেই বীজই কাজের বীজ। ব্যুৎপন্নচেতা সুপণ্ডিত ব্যক্তিদিগের আচার-ব্যবহার, কথাবার্ত্তা, চালচলন প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই বিজ্ঞোচিত ধীর ভাব ধারণ করে, আর, সেই জন্য উপনিষদাদি শাস্ত্রে তাঁহারা ধীর নামে প্রসিদ্ধ; তেমনি, যোগে যাঁহারা সিদ্ধি লাভ করেন, তাঁহাদের আচার-ব্যবহার, চালচলন-কথাবার্ত্তা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই যোগযুক্ত মুক্তভাব ধারণ করে; আর, সেইজন্য তাঁহাদিগকেই জীবন্মুক্ত বলা যুক্তিসঙ্গত। এমন কি, গীতা-শাস্ত্রে স্পষ্টই লিখিত হইয়াছে যে,—

"যুক্তাহার-বিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥"

ইহার অর্থ এই যে, যাঁহার আচার-ব্যবহার যোগযুক্ত, কর্ম্মচেষ্টা যোগযুক্ত, নিদ্রাজাগরণ যোগযুক্ত তাঁহার যোগই সর্ব্বদুঃখের মহৌষধ। আমি তাই বলি যে, সেইরূপ যোগই সিদ্ধপুরুষের পরিচয় লক্ষণ।

চতুর্থ দ্রষ্টব্য।

যেমন, বিদ্যাঙ্গ স্বতন্ত্র, আর, বিদ্যা স্বতন্ত্র; তেমনি, যোগাঙ্গ স্বতন্ত্র, আর, যোগ স্বতন্ত্র। পূর্ব্বতন কালে আমাদের দেশে দশ-বিশ বৎসর ধরিয়া কেহবা মুগ্ধ-বোধ ব্যাকরণ, কেহবা ভাষাপরিচ্ছেদ, প্রচুর পরিমাণে জ্ঞানে উদরসাৎ এবং ধ্যানে চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিয়া চতুষ্পাটীর গুরুগৃহ হইতে মহাদম্ভের সহিত দিগ্বিজয়ে বাহির হইতেন। ইঁহাদের বিদ্যা ঐ পর্য্যন্তেই পরিসমাপ্ত। তেমনি যাঁহারা বাল্যাবস্থা হইতে পদ্মাসন, সিদ্ধাসন, ময়ূরাসন প্রভৃতি তরো-বেতরো আসন শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চাশ বৎসর বয়সে আসন-সিদ্ধ হ'ন, তাঁহারা যোগী যত হো'ন বা না হো'ন—রঙ্গ-প্রদর্শনকার্য্যে বড় বড় ভেল্কিবাজ-দিগকে হারাইয়া দ্যা'ন। আবার যাঁহারা ঐরূপ কঠোর তপস্যায় শ্যাম কেশ শুক্লে পরিণত করিয়া প্রাণায়াম-সিদ্ধ হ'ন তাঁহাদের মধ্যে কোনো মহাত্মা কৌতূহলাবিষ্ট দর্শকগণের বিস্মিত নেত্রের সমক্ষে গর্ত্ত কাটিয়া তাহার মধ্যে ছয় মাস মাটি-চাপা থাকিয়া শেষে যখন অস্থিচর্ম্মসার অর্দ্ধমৃত শরীরে অন্ধকার হইতে আলোকে বাহির হ'ন, তখন, তাহা-দৃষ্টে লোকের তাক্ লাগিয়া যায়—সকলেই বলে "ইনি সিদ্ধযোগী"। এরূপ সাধক যদি যোগী না হইয়া ডুবুরী হইতেন তাহা হইলে সমুদ্রগর্ভ হইতে রাশি রাশি রত্ন সংগ্রহ করিয়া মস্ত একজন ধনাঢ্য বড়লোক হইতে পারিতেন সন্দেহ নাই। এরূপ দীর্ঘকাল-ব্যাপী যোগাঙ্গের অনুশীলন যোগপন্থীদিগের পক্ষে অনিষ্টজনক বই শুভজনক নহে তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। গীতাশাস্ত্র সাধককে শ্বাস রোধ করিয়া হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে বলিতে-ছেন না; বলিতেছেন তিনি—যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করিতে; অথবা

যাহা একই কথা—পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত হইয়া তাঁহার মঙ্গল-কার্য্যে যোগ দিতে।

পঞ্চম দ্রষ্টব্য।

প্রকৃত যোগী পুরুষ যে কিরূপ লক্ষণাক্রান্ত, ভবগদ্গীতায় তাহা দুইটি শ্লোকে নির্ঘাত বলিয়া দেওয়া হইয়াছে; সে দুইটি শ্লোক এই :—

(১)

"আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমংপশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥"

(২)

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥"

ইহার অর্থ এই :—

যে জন সুখই বা কি আর দুঃখই বা কি—আপনাতেও যেমন, অন্যতেও তেমনি—সর্ব্বত্র সমান দেখেন অর্জ্জুন, সেই যোগীই পরম যোগী। আবার যোগীদিগের মধ্যে তিনিই যুক্তম যোগী যিনি আমা-গত প্রাণ হইয়া আমাকে শ্রদ্ধার সহিত ভজনা করেন।

পরমাত্মার সহিত যোগে যাঁহাদের জ্ঞান-চক্ষু সুপরিস্ফুট হইয়াছে, তাঁহারা দেখিতে পা'ন যে, আপনারও যেমন—অন্যেরও তেমনি—সকল জীবেরই সুখ-দুঃখ একই অভিন্ন প্রেমানন্দের বিভিন্ন অভিব্যক্তি; কেননা, গোড়ায় প্রেম না থাকিলে—বিচ্ছেদের দুঃখও থাকে না—মিলনের সুখও থাকে না—কিছুই থাকে না। যোগী পুরুষেরা সুখ-দুঃখমোহের আবরণ ভেদ করিয়া—আপনাতেও যেমন অন্যেতে তেমনি—আত্মসত্তার রসাস্বাদনজনিত আনন্দ সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করেন; আর, সেইজন্য, সর্ব্বজগৎই তাঁহাদের নিকটে আনন্দময়

এবং সর্ব্বাবস্থাতেই তাঁহারা সদানন্দ। এইরূপে যাঁহার অন্তঃকরণে প্রেমানন্দের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায় তিনি আপনার আত্মাতে পরমাত্মার দর্শনলাভ করিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধাভক্তির সহিত ভজনা করেন এবং তাহাতেই তিনি আপনার সমস্ত কামনার চরিতার্থতা লাভ করেন।

দ্বাদশ অধিবেশন।

ব্যাখ্যান।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বুদ্ধিযোগের উপদেশ দিতেছেন এইরূপ :—

"দূরেণহ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাৎ ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌশরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ॥
বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃত দুষ্কৃতে।
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং॥
কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ং॥
যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধি র্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥
শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধি স্তদা যোগমবাপ্স্যসি॥"

ইহার অর্থ :—

আর আর যত সব কর্ম্ম—সমস্তই বুদ্ধিযোগ হইতে অনেক নীচে ধনঞ্জয়। বুদ্ধির শরণ গ্রহণ কর। যাহারা ফলের উদ্দেশে কর্ম্ম করে তাহারা কৃপাপাত্র। যাঁহারা বুদ্ধিযোগে যুক্ত হ'ন, তাঁহারা সুকৃত এবং দুষ্কৃত দুয়েরই হস্ত হইতে পরিত্রাণ পা'ন। অতএব যোগের জন্য প্রযত্নপরায়ণ হও; যোগ কর্ম্মনৈপুণ্যেরই আর-এক নাম। যখন তোমার বুদ্ধি মোহজাল কাটাইয়া উঠিবে, তখন বেদোক্ত ফলাফল বিষয়ে যাহা-কিছু তোমার শোনা আছে বা শুনিবার আছে—সমস্তেরই প্রতি তোমার বিতৃষ্ণা জন্মিবে। বেদের অনভিমতে বুদ্ধি যখন তোমার—সমাধিতে স্থিরত্ব লাভ করিবে, তখন যোগ তোমার আয়ত্তাধীন হইবে।

শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের সকলেরই এটা জানা কথা যে, বেদেরই আর এক নাম শ্রুতি, আর, এটাও বোধ করি তাঁহাদের কাহারো অবিদিত নাই যে, লৌকিকভাষায় যাহাকে বলে কথার বৈপরীত্য বা অসঙ্গতি-দোষ—নৈয়ায়িকভাষায় তাহাকে বলে "বিপ্রতিপত্তি" (Contradiction in terms)। উদ্ধৃত শ্লোকপঞ্চকের শেষের শ্লোকটিতে "শ্রুতিবিপ্রতিপন্না" এই যে-একটি বিশেষণ সমাধি-নিষ্ঠ বুদ্ধির উপরে আরোপিত হইয়াছে—আমি তাই তাহার অনুবাদ করিলাম "বেদের অনভিমত"। সমাধিনিষ্ঠ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি যে বেদবাদীদিগের অনভিমত, তাহা গীতার আর এক স্থানে আরো স্পষ্ট করিয়া ফুটাইয়া বলা হইয়াছে এইরূপ :—

"যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি॥
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াঽপহৃতচেতসাং।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥"

ইহার অর্থ :—

বেদ'কেই যাঁহারা জানেন সার—যাঁহাদের মতে বেদ ছাড়া মানিবার বস্তু আর কিছুই নাই—সেই সকল কামাত্মা স্বর্গভক্ত অবিবেকী পরামর্শদাতাদিগের প্রলোভনবাক্যে ভুলিয়া যাঁহারা ভোগৈশ্বর্য্য-লাভকেই পরম পুরুষার্থ মনে করেন, তাঁহাদের অস্থির বুদ্ধি সমাধির অনুপযুক্ত।" আবার গীতার আর-এক স্থানে উক্ত হইয়াছে

"যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সম্প্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥

ইহার অর্থ এই যে, জলপূর্ণ সুবিস্তীর্ণ জলাশয়ের যতটুকু অংশ স্নান-পানাদির জন্য পুরবাসীদিগের কাজে লাগে—সুবিস্তীর্ণ বেদ-শাস্ত্রের ততটুকু-মাত্র অংশ জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে যথেষ্ট—তাহার অধিক নিষ্প্রয়োজন। গীতাশাস্ত্রের এই সকল লোকাচার-বিরুদ্ধ উপদেশবাক্যগুলির ভিতরে সকৌতুকে উঁকি দিয়া—ভারতবর্ষীয় তত্ত্ব-জ্ঞানের ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের একটি গোড়া'র রহস্য আমি যেন দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি। রহস্য-সেটি এই :—গতানুগতিক মূঢ় ব্যক্তিদিগকে জ্ঞানদান করিবার জন্য ঐ লোকাচার-বিরুদ্ধ উপদেশ-গুলি যে-সময়ে শ্লোকবদ্ধ হইয়াছিল, সেই আদিম পুরাকালের আচার্য্যেরা দুই দলে বিভক্ত ছিলেন। একদল ছিলেন বেদবাদী; আর একদল ছিলেন ব্রহ্মবাদী। বেদবাদীদিগের শাস্ত্র ছিল বেদ; ব্রহ্মবাদীদিগের শাস্ত্র ছিল উপনিষদ্। বেদবাদীরা ভোগৈশ্বর্য্যপরায়ণ যজমানদিগকে ধন-পুত্র-স্বর্গাদির লোভ দেখাইয়া বেদবিহিত যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করাইতেন; ব্রহ্মবাদীরা মুমুক্ষু ব্যক্তিদিগকে যাগযজ্ঞাদি কাম্য কর্ম্ম সকলের অসারতা প্রদর্শন করাইয়া, তাহার বিরুদ্ধে ব্রহ্মজ্ঞান এবং অধ্যাত্মযোগের উপদেশ প্রদান করিতেন। তখনকার সময়ে বেদ বলিতে বুঝাইত কেবল—যাগযজ্ঞাদি কাম্যকর্ম্মের বিধিব্যবস্থা এবং প্রকরণ-পদ্ধতির সংহিতা—তা ছাড়া আর কিছুই বুঝাইত না। ব্রহ্ম-জ্ঞান এবং অধ্যাত্মযোগ প্রভৃতি মুক্তিমার্গের নিগূঢ় রহস্য যত কিছু—সমস্তই উপনিষদের মন্ত্রপূত গণ্ডির মধ্যে অবরুদ্ধ ছিল; তাহার চতুঃসীমার মধ্যে বৈদিক বিধান-ব্যবস্থার প্রবেশাধিকার ছিল না। গীতাশাস্ত্রে তাই উক্ত হইয়াছে যে, অধ্যাত্মযোগের অনুশীলন "শ্রুতি-বিপ্রতিপন্ন"কি না বেদের অনভিমত।

শ্রীকৃষ্ণের মুখে—বেদে যাহা নাই এইরূপ নূতন ধাঁচার জ্ঞানো-

পদেশ শুনিয়া অর্জ্জুনের কৌতূহল জাগিয়া উঠিল; তিনি বিস্ময়ান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

"স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিং॥"

ইহার অর্থ:—

সমাধিতে যাঁহার বুদ্ধি স্থিরত্ব লাভ করিয়াছে কেশব, সেই স্থিত-প্রজ্ঞ ব্যক্তির কথাবার্ত্তাই বা কিরূপ, থাকেনই বা তিনি কি লইয়া, করেনই বা তিনি কি?

ইহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন।

(১)

"প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞঃ স উচ্যতে।"

(২)

"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥"

(৩)

"রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥
প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসোহ্যাশু বুদ্ধিঃপর্য্যবতিষ্ঠতে॥"

(৪)

"ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি॥

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্যপ্রজ্ঞাপ্রতিষ্ঠিতা ॥"

(৫)

"আপূর্য্যমানমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্‌বৎ।
তদ্‌বৎকামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥

ইহার অর্থ এই :—

(স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির পরিচয়লক্ষণ)

(১)

তাঁহাকেই তখন বলা যায় স্থিতপ্রজ্ঞ—যিনি যখন মনোগত সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করিয়া আত্মার শক্তি খাটাইয়া আত্মাতে পরিতুষ্ট হ'ন।

(২)

তাঁহাকেই বলা যায় স্থিতধী মুনি—দুঃখে যাঁহার মন উদ্বিগ্ন হয় না, সুখে যিনি স্পৃহা রাখেন না; রাগ ভয় এবং ক্রোধ হইতে যিনি বিনির্ম্মুক্ত।

(৩)

যে জিতাত্মা পুরুষ রাগদ্বেষবিনির্ম্মুক্ত-সুসংযত-ইন্দ্রিয়গণের সহিত বিষয়-ক্ষেত্রে বিচরণ করেন, তাঁহার মন প্রসন্ন হয়; মন প্রসন্ন হইলে মনের মধ্যে কোন প্রকার দুঃখ থাকে না; প্রসন্নচিত্ত সাধুসজ্জনের বুদ্ধি সহজেই সমাধিস্থ হয়।

(৪)

যে মন ধাবমান ইন্দ্রিয়গণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গোড় দিয়া চলে, সে মন পুরুষের প্রজ্ঞা'কে ডুবাইয়া দ্যায়—বায়ু যেমন নৌকাকে। এই জন্য,

মহাবাহু, তাঁহাকেই বলি স্থিত-প্রজ্ঞ—যিনি ইন্দ্রিয়গণকে চারিদিকের বিষয়রাজ্য হইতে প্রত্যাকর্ষণ করিয়া আপনার বশে রাখেন।

(৫)

স্বস্থানে অবিচলিতভাবে স্থিতি করিতেছে যে আপূর্য্যমান সমুদ্র, তাহাতে যেমন নদনদীসকল প্রবেশ করিয়া বিলীন হইয়া যায়, তেমনি, যিনি আপনাতে স্থির-থাকেন, আর, চতুর্দ্দিক হইতে কামনা সকল যাঁহাতে প্রবেশ করিয়া বিলীন হইয়া যায়, তিনিই শান্তি লাভ করেন ; যিনি কামনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হ'ন—তিনি না।

স্থিতপ্রজ্ঞ সমাধিস্থ .পুরুষের এই যে পাঁচটি পরিচয়লক্ষণ পরে পরে বিজ্ঞাপিত হইল, ইহার মধ্য হইতে সারসঙ্কলন করিয়া আমরা জ্ঞান-লাভ করিতেছি এইরূপ ঃ—

একদিকে আমরা দেখিতেছি যে, বিষয়সুখমাত্রই ক্ষণস্থায়ী, আর সেইজন্য বিষয়-সুখের সম্ভোগ-পারিপাট্য মনুষ্যজীবনের চরম-উদ্দেশ্য-পদবীর অনুপযুক্ত। তা ছাড়া—মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে যেমন আছে—"ন জাতু কামঃ কামনামুপভোগেন শাম্যতি, হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে" ইহার অর্থ এই যে, কাম্যবস্তুর উপভোগ দ্বারা কামনার কখনও নিবৃত্তি হয় না ; নিবৃত্তি দূরে থাকুক—ঘৃতপ্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় তাহার ভূয়শঃ বৃদ্ধিই হইতে থাকে। আর এক দিকে দেখিতেছি যে, আত্মসত্তার রসাস্বাদন-জনিত একপ্রকার নিষ্কাম প্রেমানন্দ যাহা মনুষ্যের অন্তঃকরণের অন্তরতম কোষে নিয়তকাল বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা জীবাত্মার অনন্তকালের পাথেয় সম্বল, আর সেইজন্য তাহারই পরিস্ফুটন মনুষ্যজীবনের চরম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। তাহা যেন বুঝিলাম—এটা যেন বুঝিলাম যে, নিষ্কাম প্রেমানন্দের মতো দেবস্পৃহনীয় শেরা রত্ন এমন-আর জগতে নাই ; আর সেই সঙ্গে এটাও

বুঝিলাম যে, তাহা প্রতিজনের আপনার মধ্যেই আছে—কেবল তাহার পরিস্ফুটনের এক যা অপেক্ষা; তাহা প্রস্ফুটিত হইলেই মর্ত্ত্যের জীব স্বর্গের দেবতার ন্যায় অজর অমর এবং অভয় হইয়া ওঠে। কিন্তু সে যে নিষ্কাম প্রেমানন্দের পরিস্ফুটন;—হইতে-পারে তাহা যে কেমন করিয়া—সেইটিই হ'চ্চে জিজ্ঞাস্য। হইতে পারে যে তাহা কেমন করিয়া, তাহার অব্যর্থ উপায় গীতাশাস্ত্রে ভূয়োভূয় কথিত হইয়াছে—নানা স্থানে নানাপ্রকারে কথিত হইয়াছে; সংক্ষেপে সে উপায় হ'চ্চে শমদমাদির সাধন-দ্বারা আত্মজ্ঞানের উদ্দীপন। ইন্দ্রিয়-চাপল্য দ্বেষ হিংসা ভয়-লোভ মদ-মাৎসর্য্য—এইগুলি হ'চ্চে আত্ম-জ্ঞানের পথের বাধা। আত্মশক্তির কার্য্যই হ'চ্চে—এই সকল বাধাবিঘ্নের অপসারণ। শেষোক্ত কার্য্যে মনুষ্যের আত্মশক্তি যথেষ্ট পরিমাণে কষ্ট স্বীকার করিয়া কায়মনোবাক্যে প্রবৃত্ত হইলে, তাহার সেই প্রাণ-গত মঙ্গল-চেষ্টার উপরে যখন দেবপ্রসাদের বর্ষণ হয়, অথবা যাহা একই কথা—ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টি নিপতিত হয়, তখন আত্ম-প্রভাব এবং দেবপ্রসাদের সহযোগ-প্রভাবে জীব-চৈতন্য আত্মজ্ঞানের জ্বলন্ত জ্যোতিতে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। তাহার পরে, রাত্রিকালে মাঠের মাঝে অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে, পতঙ্গেরা যেমন তৃণাবরণের মধ্য হইতে ক্রমে ক্রমে বাহির হইয়া সেই প্রজ্বলিত অনলে মাথা সঁপিয়া তাহার ভিতরে স্বচ্ছন্দে বিলীন হইয়া যায়, তেমনি সাধকের মনোগত কামনা-সকল মোহাবরণের মধ্য হইতে ক্রমে ক্রমে বিনির্গত হইয়া আত্ম-জ্ঞানের দিব্যজ্যোতিতে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া তাহার ভিতরে লয় পাইয়া যায়। গীতাশাস্ত্রের অভিধানে—এইরূপ কামনা-বিলয়ের নামই কর্ম্মবিলয়, তা বই—কর্ম্ম-বিলয় বলিতে শরীর-মনের নৈষ্কর্ম্মে পরি-সমাপ্তি বুঝায় না। উক্ত হইয়াছে বটে—

"জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন"

"জ্ঞানাগ্নি সমস্তকর্ম্ম ভস্মীভূত করিয়া ফ্যালে অর্জ্জুন"; কিন্তু সে যে কর্ম্ম তাহা বেদোক্ত বৈধ এবং নিষিদ্ধ শ্রেণীর কর্ম্ম, সংক্ষেপে—সকাম কর্ম্ম; এতদ্ব্যতীত আর এক শ্রেণীর কর্ম্ম আছে—যাহাকে বলা যায় নিস্কাম কর্ম্ম। সকাম কর্ম্ম যখন জ্ঞানাগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া যায়, তখন তাহার আগাগোড়া সবই কিছু আর ভস্মীভূত হয় না—ভস্মীভূত হইতে তাহার সঙ্গাশ্লিষ্ট কামনা-অংশই ভস্মীভূত হয়; পরন্তু তাহার শক্তি-অংশ কাঁচা সোনার ন্যায় অগ্নি-পরীক্ষায় গলিয়া-গিয়া নিষ্পাপ প্রেমমূর্ত্তি ধারণ করে। তখন সেই জ্ঞানে আলোকিত এবং প্রেমে অনুপ্রাণিত আত্মশক্তি হইতে নিষ্কাম কর্ম্ম প্রসূত হয়। তবেই হইতেছে যে, নিষ্কাম কর্ম্ম জ্ঞানেরও যেমন, প্রেমেরও তেমনি, উভয়েরই অঙ্গের সামিল। গীতাশাস্ত্রের মতে, তাই, নিষ্কাম কর্ম্ম জ্ঞানীজনেরও যেমন, ভক্তজনেরও তেমনি, উভয়েরই অবশ্য-কর্ত্তব্য। আমাদের দেশের শাস্ত্রীয় ভাষার অভিধানে অনেকগুলি দ্ব্যর্থ-সূচক কথা আছে—কর্ম্ম তাহার মধ্যে একটি। শাস্ত্রীয় অভিধানে—কর্ম্ম শব্দের অর্থ কার্য্য-একরকম বটে, কিন্তু কার্য্য বলিতে সচরাচর লোকে যেরূপ বোঝে—উহার অর্থ ঠিক্-সেরূপ নহে। শাস্ত্রীয়ভাষার অভিধানে, কর্ম্ম বলিতে বুঝায়—একপ্রকার বন্ধন-শৃঙ্খল; আর, সে যে বন্ধন-শৃঙ্খল, তাহা দুইপ্রকার—(১) স্বর্ণশৃঙ্খল এবং (২) লৌহশৃঙ্খল। স্বর্ণশৃঙ্খল—বৈধ কর্ম্ম; লৌহশৃঙ্খল—নিষিদ্ধ কর্ম্ম। নিষ্কাম কর্ম্ম কিন্তু, শাস্ত্রের মতে, মূলেই বন্ধনশৃঙ্খল নহে—না তাহা স্বর্ণশৃঙ্খল—না তাহা লৌহ-শৃঙ্খল। শাস্ত্রের মতে, তাই, নিস্কাম কর্ম্ম কর্ম্মই নহে; তাহা একপ্রকার ধর্ম্ম—মুক্ত আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। অস্থায়ী শরীর এবং সংসারের প্রতি বদ্ধজীবের যেরূপ প্রাণের টান, তাহারই নাম কামনা;

পক্ষান্তরে—আত্মার প্রতি মুক্তপুরুষের যেরূপ আত্মার টাণ, তাহার নাম কাম নহে তাহার নাম প্রেম। কামনা-প্রধান সকাম কর্ম্মই জীবের বন্ধন শৃঙ্খল; প্রেমপ্রধান নিষ্কাম কর্ম্ম আত্মার স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্ম, তা বই তাহা আত্মার বন্ধন-শৃঙ্খল নহে; আর, তাহা আত্মার বন্ধন-শৃঙ্খল নহে বলিয়া শাস্ত্রীয় ভাষার অভিধানে তাহা কর্ম্মশব্দে সংজ্ঞিত হয় না। অতএব এটা স্থির যে, সকাম কর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই গীতা-শাস্ত্রে বলা হইয়াছে—

"জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।"

"জ্ঞানাগ্নি সমস্ত কর্ম্ম ভস্মীভূত করে অর্জ্জুন।"

ইহা হইতে আমরা পাইতেছি এই যে, নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান কোনো প্রকারেই মুক্তির ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে না। অধিকন্তু আমরা আর-একটি কথা পাইতেছি এই যে, শাস্ত্রে যাহাকে বলে "ব্রহ্মনির্ব্বাণ" তাহার অর্থ শুধু দুর্নিবার কামনানলের নির্ব্বাণ; তা বই, ব্রহ্মনির্ব্বাণ বলিতে—জ্ঞানেরও নির্ব্বাণ বুঝায় না—প্রেমেরও নির্ব্বাণ বুঝায় না, আর, চিদানন্দময়ী আত্মশক্তির মঙ্গল-স্ফূর্ত্তিরও নির্ব্বাণ বুঝায় না। সকল শাস্ত্রই এক বাক্যে বলে যে, পরাৎপর পরমেশ্বর শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত পুরুষ, অথচ, তিনি নিখিল জগৎকার্য্যের নির্ব্বাহকর্ত্তা। এ কথাও সকল শাস্ত্রেই বলে যে, জনক রাজা অদ্বিতীয় মুক্ত পুরুষ ছিলেন, অথচ, প্রজাপালনাদি রাজকর্ত্তব্যে তাঁহার বিন্দু-মাত্রও প্রযত্নের শৈথিল্য ছিল না।

প্রশ্ন॥ জনকরাজার ন্যায় জীবন্মুক্ত পুরুষেরা পৃথিবীতে যত দিন অবস্থিতি করেন, ততদিন পর্য্যন্ত নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান তাঁহাদের অবশ্যকর্ত্তব্য ইহা আমি অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু উপনিষদে এই যে একটি কথা স্পষ্টাক্ষরে উদ্গীত হইয়াছে যে, মুক্তপুরুষ ইহলোক

হইতে অবসৃত হইলে "ন স পুনরাবর্ত্ততে" আর তিনি ফিরিয়া আসেন না অর্থাৎ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন না, তখন তাহাতেই প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে যে, মুক্তপুরুষ পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইলেই তাঁহার কর্ত্তব্যের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

উত্তর॥ সব শাস্ত্রেই বলে যে, জল যেমন পদ্মপত্রকে ভিজাইতে পারে না, তেমনি, যে কার্য্য নিষ্কামভাবে কৃত হয়, তাহা কর্ত্তাপুরুষকে বন্ধন করিতে পারে না। অতএব শাস্ত্রের কথা যদি শিরোধার্য্য করিতে হয় তবে বলা উচিত এই যে, পৃথিবীতেই বা কি, আর, লোক-লোকান্তরেই বা কি, কোনো স্থানেই, অনুষ্ঠিত নিষ্কাম কর্ম্ম অনুষ্ঠাতা মুক্ত আত্মাকে বন্ধন করিতে পারে না। জনকরাজা যখন মুক্তি লইয়া পৃথিবী হইতে অবসৃত হইয়াছেন, তখন, আর তাঁহাকে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে হইবে না—এ কথা সত্য হইলেও—পৃথিবীতে মুক্ত অবস্থায় বর্ত্তমান থাকা-কালে তিনি যেমন কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে আনন্দের সহিত রত ছিলেন, ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া সেখানেও তেম্নি তিনি নারদাদি দেবর্ষিগণের ন্যায় ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া ঈশ্বরের কার্য্যে আনন্দের সহিত যোগ দিতে কেন যে ভার বোধ করিবেন—তাহার কোনো অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমি তো বুঝি এই যে, সব শাস্ত্রেরই মতে—বিশেষতঃ গীতা-শাস্ত্রের মতে—নিষ্কর্ম্মা হইয়া হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকা অধম তামসিক ব্যক্তিদিগকেই শোভা পায়। অনর্থক বাদবিতণ্ডা ছাড়িয়া দিয়া আমাকে যদি সহজভাবে জিজ্ঞাসা কর যে, "মুক্তি পদার্থটা কি", আর তাহার সদুত্তর প্রদান আমা কর্ত্তৃক যতদূর সম্ভবে তাহা যদি ধৈর্য্য ধরিয়া শুনিতে ভার-বোধ না কর, তবে তাহা সংক্ষেপে এই :—

মুক্তি পদার্থটা আর কিছু না—আত্মার বন্ধন-মুক্ত স্বচ্ছন্দ অবস্থা

অথবা যাহা একই কথা—আত্মার সদানন্দ সহজ অবস্থা বা স্বাভাবিক অবস্থা। আত্মার স্বাভাবিক অবস্থায় আত্মার স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্মের সমুচিত স্ফূর্ত্তি হইবে—ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে; পরন্তু, জগতের মধ্যে পরমাশ্চর্য্য যদি কিছু থাকে, তবে, আত্মার স্বাভাবিক অবস্থায় আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্মের নির্ব্বাণপ্রাপ্তি হইবে—ইহাই আকাশ-কুসুমের ন্যায় পরমাশ্চর্য্য। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, আত্মার সেই যে স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম যাহা তাহার বন্ধনমুক্ত স্বাভাবিক অবস্থার সঙ্গের সঙ্গী, তাহা কিরূপ পদার্থ? ইহার একমাত্র উত্তর যাহা সম্ভবে তাহা এই যে, আত্মার আধ্যাত্মিক প্রকৃতিই আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। একটু স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলেই এটা কাহারো বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, আত্মার আধ্যাত্মিক প্রকৃতি (সংক্ষেপে আত্মশক্তি) তিন গুণের ত্রিবেণী-সঙ্গম;—একটি গুণ হ'চ্চে আত্মসত্তার প্রকাশ কিনা জ্ঞান; আর একটি গুণ হ'চ্চে আত্মসত্তার রসানুভূতি কিনা প্রেম; তৃতীয় আর একটি গুণ হ'চ্চে আত্মসত্তার প্রভাবস্ফূর্ত্তি কিনা মঙ্গলক্রিয়া। আমি তাই বলি যে, আত্মার বন্ধনমুক্ত স্বাভাবিক অবস্থায়, অথবা যাহা একই কথা—মুক্ত অবস্থায়, আত্মাতে—জ্ঞানেরও যেমন, প্রেমেরও তেমনি, আর, মঙ্গল-ক্রিয়ারও তেমনি, তিনেরই সমুচিত স্ফূর্ত্তি হয়; তা বই, তিনের কোনোটিরই নির্ব্বাণ প্রাপ্তি হয় না। শরীর রোগমুক্ত হইলে যেমন চক্ষুতে জ্যোতিস্ফূর্ত্তি হয়, রসনাতে রসস্ফূর্ত্তি হয়, হস্তপদে বলস্ফূর্ত্তি হয়—নির্ব্বাণ পাইবার মধ্যে কেবল জ্বরজ্বালা নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত হয়; আত্মা বন্ধনমুক্ত হইলে, তেমনি, জ্ঞানে সত্যস্ফূর্ত্তি হয়, প্রেমানন্দে রসস্ফূর্ত্তি হয়, মঙ্গলইচ্ছাতে বলস্ফূর্ত্তি হয়—নির্ব্বাণ পাইবার মধ্যে কেবল রাজসিক কামনা-সকলের দুরন্ত অনল এবং তামসিক আত্মগ্লানির মর্ম্মভেদী অন্তর্দাহ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়।

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

"এষা ব্রাহ্মীস্থিতিঃ পার্থ নৈনাংপ্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণ মৃচ্ছতি॥

ইহার অর্থ এই :—

ইহাই, পার্থ, ব্রাহ্মীস্থিতি। এইরূপ স্থিতিতে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া যোগীপুরুষেরা মোহপাশ হইতে বিমুক্ত হ'ন এবং অন্তিমসময়েও উহাতেই স্থির থাকিয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।

এ বিষয়ের সম্বন্ধে আমার বক্তব্যের অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ অংশ যাহা আমার মনের ভিতরে চাপা দেওয়া রহিয়াছে তাহা বারান্তরে যথাস্থানে বিবৃত করিব ; এখানে আর তাহা ভাঙিলাম না।

ত্রয়োদশ অধিবেশন।

ব্যাখ্যান।

বলিয়াছি যে, আত্মার বন্ধনমুক্ত সহজ অবস্থার নামই মুক্ত অবস্থা। ইহাতে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, মুক্ত অবস্থাই আত্মার স্বাভাবিক অবস্থা। মুক্তিই আত্মার প্রকৃতি। প্রকৃতি বলিতে কি বুঝায়? সাংখ্যাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন—প্রকৃতি আত্মা হইতে ভিন্ন স্বতন্ত্র পদার্থ; আত্মা চেতন পদার্থ, প্রকৃতি জড় পদার্থ। ফের আবার যদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা যায়—"তোমরা বলো বুদ্ধি প্রকৃতির প্রথমা কন্যা; তবে কি বুদ্ধিও জড় পদার্থ?" সাংখ্যাচার্য্য ইহার উত্তর দ্যা'ন এই যে, বুদ্ধির নিজগুণে বুদ্ধি জড় পদার্থ; সূর্য্যালোক যেমন জড়পদার্থ—প্রজ্ঞালোক তেমনি নিজগুণে জড়পদার্থ; কেবল আত্মার অধিষ্ঠান-গুণেই বুদ্ধি চিন্ময়ী। বৈদান্তিক পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আরেক কথা বলেন। তিনি বলেন যে, এ কথা ঠিক্ যে, আত্মার অধিষ্ঠানগুণে বুদ্ধি চিন্ময়ী; কিন্তু এ কথা ঠিক্ নহে যে, বুদ্ধির নিজ গুণে বুদ্ধি অচেতন পদার্থ। এটা যেমন সত্য যে, চাক্ষুষ চেতনের সহিত তাদাত্ম্যের গুণেই সূর্য্যালোক আলোক-পদার্থ, এটাও তেম্নি সত্য যে, আত্মার সহিত তাদাত্ম্যের গুণেই প্রজ্ঞালোক চেতনপদার্থ; তাহার নিজগুণে তাহা চেতনাচেতন দুয়ের বা'র একপ্রকার জ্ঞানবিরোধিনী শক্তি; আর, তাহা জ্ঞান বিরোধিনী বলিয়া তাহার নাম অবিদ্যা। কিন্তু বেদান্ত এবং সাংখ্য ছাড়া আরেক শাস্ত্র আছে; সে শাস্ত্রে বলে এই যে, (১) সাংখ্যের অচেতন প্রকৃতি, (২) কাণ্টের thing-in-itself, (৩) Schopenhouer-এর

অন্ধ Will, (৪) Mill-এর ইন্দ্রিয়-চেতনার অধিষ্ঠাত্রী নিত্যা শক্তি, ইংরাজি ভাষায়—permanent possibility of sensation, (৫) বেদান্তের সদসদ্‌ভ্যামনির্ব্বাচনীয়া অবিদ্যা;—পাঁচ শাস্ত্রের এই পাঁচরকমের বস্তু একই বস্তু; সবই এক প্রকার অন্ধ সংস্কার—এক-প্রকার প্রবৃত্তির ঝোঁক বা গোঁ—তা বই আর কিছুই নহে। যাহাই হো'ক্ না কেন—বেদান্ত-শাস্ত্রের অবিদ্যা-শব্দটিকে আমি সব-চেয়ে বেসী পছন্দ করি এই জন্য—যেহেতু অমনতরো একটি স্পষ্টার্থ-বোধক বৈজ্ঞানিক পারিভাষা অন্যত্র খুঁজিয়া পাওয়া ভার। ফলে, অবিদ্যা যে, জ্ঞানের উল্টা পিঠ, তাহা তাহার গায়ে লেখা রহিয়াছে বলিলেই হয়। বেদান্তের সুবিচারিত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে বন্ধনের আঁট রহিয়াছে যেমন চমৎকার, সাংখ্যের মধ্যে তেমনটি দেখিতে পাওয়া যায় না। তার সাক্ষী ঃ—সাংখ্যের মতে প্রকৃতি স্বপ্রধানা; বেদান্তের মতে—দেহী যেমন দেহের সারসর্ব্বস্ব, পরমাত্মা তেমনি প্রকৃতির সারসর্ব্বস্ব। সাংখ্যের মতে—প্রত্যেক জীবাত্মাই স্বপ্রধান; বেদান্তের মতে—রত্নমালায় যেমন মণিগণ একসূত্রে গ্রথিত, সমস্ত আত্মা তেমনি ঐক্যসূত্রে গ্রথিত। সাংখ্যের মতে প্রকৃতি নিজগুণে প্রত্যেক জীবাত্মার ভোগমোক্ষের নির্ব্বাহকর্ত্রী; বেদান্তের মতে প্রকৃতি নিজগুণে সৎও নহে, অসৎও নহে, কিছুই নহে, অথচ পরমাত্মার গুণে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্রী। বেদান্তের পারিভাষায়—প্রকৃতি ঐশীশক্তিরই আর এক নাম। বেদান্তদর্শনের আগাগোড়া এইরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ সঙ্গতিপারিপাট্য দেখিয়া আমার এইরূপ মনে হয় যে, বৃক্ষ যেমন কালক্রমে মুকুলিতাবস্থা হইতে পুষ্পিতাবস্থায় এবং পুষ্পিতাবস্থা হইতে ফলিতাবস্থায় পরিণত হয়—আমাদের দেশের তত্ত্বজ্ঞান তেমনি কালক্রমে সাংখ্যদর্শন হইতে

পাতঞ্জল দর্শনে এবং পাতঞ্জল দর্শন হইতে বেদান্তদর্শনে পরিণত হইয়াছে। এই জন্য গীতাপাঠের আলোচনা-ক্ষেত্রে এযাবৎকাল পর্য্যন্ত আমি বেদান্তদর্শনের যুক্তিপূর্ণ কথা-গুলিকেই আমাদের দেশীয় সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানের সার সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি; আর, এক্ষণেও তাহাই করিব। এই প্রসঙ্গে আর-একটি কথা আমার বক্তব্য এই যে, বেদান্ত-সংজ্ঞক দর্শন যেমন আমাদের দেশের সকল দর্শনের শেষের দর্শন, বেদান্তশাস্ত্র (অর্থাৎ উপনিষদ্) তেমনি আমাদের দেশের সকল শাস্ত্রের গোড়ার শাস্ত্র। শেষের শস্য যেমন গোড়ার বীজেরই নূতন সংস্করণ, বেদান্তদর্শন তেমনি বেদান্তশাস্ত্রেরই নূতন সংস্করণ।*

প্রশ্ন॥ বেদান্ত আমাদের দেশের গোড়ার শাস্ত্র তা' তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে—বেদান্তের গোড়া'রশাস্ত্র কী সেইটিই হ'চ্চে জিজ্ঞাস্য।

উত্তর॥ সব শাস্ত্রের যাহা গোড়া'র শাস্ত্র, বেদান্তেরও তাহাই গোড়ার শাস্ত্র। সে শাস্ত্র তোমার মধ্যেও আছে—আমার মধ্যেও আছে। সে শাস্ত্র আর কিছু না—স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান।

প্রশ্ন॥ হইতে পারে যে, তাহা তোমার মধ্যে আছে। কিন্তু কই—আমার মধ্যে আমি তো তাহা কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছি না।

উত্তর॥ চস্‌মা রহিয়াছে তোমার নাকে বসিয়া—অথচ তুমি চস্‌মা কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছ না! যে শাস্ত্র তোমার অন্তরাত্মায়

* বেদান্তশাস্ত্র অদ্বৈতবাদীও নহে, দ্বৈতবাদীও নহে, প্রকৃতিবাদীও নহে, মায়াবাদীও নহে; কোনো বাদীই নহে। বেদান্তশাস্ত্রকে যদি বাদী বলিতেই হয়, তবে তাহা সত্য-বাদী। সত্যবাদী বলিতে একহিসাবে সর্ব্ববাদী বুঝায়, আর এক হিসাবে নির্ব্বিবাদী বুঝায়। এ রহস্যটি'র অর্থ-যাঁহারা বোঝেন তাঁহারা সহজেই বুঝিবেন; যাঁহারা না-বোঝেন, তাঁহাদের বুঝিয়া কাজ নাই।

স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে তাহা যদি তুমি না দেখিতে পাও তবে আমি তাহা তোমাকে দেখাইতেছি—প্রণিধান কর।

প্রথম সূত্র।

ইহা তুমি অস্বীকার কর-ও না, অস্বীকার করিতে পার-ও না যে, একমাত্র অদ্বিতীয় সদ্‌বস্তু, কিনা নিত্য সত্য, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আপনার সত্তাতে পরিপূর্ণ করিয়া নিত্যকাল বর্ত্তমান। এইটি হ'চ্চে তোমারও যেমন, আমারও তেমনি, আমাদের উভয়েরই গোড়া'র শাস্ত্রের গোড়া'র সূত্র।

দ্বিতীয় সূত্র।

কবিত্ব বা কবিতা যেমন কবির স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম—সত্ব বা সত্তা তেমনি সদ্‌বস্তুর স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম।

তৃতীয় সূত্র।

কবির ভাবের প্রকাশ এবং সেই সঙ্গে কবির ভাবের রসানুভূতি ব্যতিরেকে যেমন কবিতা হয় না, তেমনি, সৎস্বরূপের ভাবের প্রকাশ এবং তাহার রসানুভূতি ব্যতিরেকে সত্তা হয় না। সর্ব্বদেশের সর্ব্বসত্তার মধ্য হইতে যদি সত্তার প্রকাশ সর্ব্বকালের মতো সর্ব্বতোভাবে অন্তর্ধান করে, তবে সেই সঙ্গে সত্তাও অন্তর্ধান করে। তেমনি আবার, সত্তাতে যদি কোনোপ্রকার রস না থাকে তবে সত্তার প্রতি জ্ঞাতাপুরুষের প্রীতি আকৃষ্ট হয় না; সত্তার প্রতি জ্ঞাতাপুরুষের প্রীতি আকৃষ্ট না হইলে সত্তাতে তাঁহার মন বসে না। যাঁহার মন সত্তাতে বসে না, তাঁহার জ্ঞানে সত্তার প্রকাশ ঘটিতে পারে না। কোনো নিদ্রিত ব্যক্তির চক্ষু অর্দ্ধোন্মীলিত থাকিলেও সম্মুখস্থিত দৃশ্যবস্তুতে তাঁহার মন আকৃষ্ট হয় না বলিয়া—সেরূপ অবস্থায় তাঁহার

উন্মীলিত চক্ষুর সম্মুখেও যেমন দৃশ্য বস্তুর প্রকাশ সম্ভবে না, তেমনি, সত্তার ভিতরে জ্ঞাতাপুরুষের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারিবার মতো কোনোপ্রকার রস না থাকিলে জ্ঞান-গোচরে সত্তার প্রকাশ সম্ভবে না।।

চতুর্থ সূত্র।

ভাবের প্রকাশ হয় জ্ঞানে; ভাবের রসানুভূতি হয় প্রেমে। জ্ঞানালোকের নামই সত্তার প্রকাশ; প্রেমানন্দের নামই সত্তার রসানুভূতি। এমতে দাঁড়াইতেছে যে, সদ্‌বস্তু বা নিত্য সত্য—সৎ চিৎ এবং আনন্দ তিনই একাধারে।

পঞ্চম সূত্র।

যেখানে সদ্‌বস্তু, সেখানে সবই আছে। আছে সবই—কিন্তু সবই বাধাবিহীন, অপরিচ্ছিন্ন, এবং অপরিসীম। সত্তা অসীম, জ্ঞান অসীম, আনন্দ অসীম। সেখানে সত্তাও আছে, জ্ঞানও আছে, আনন্দও আছে, ইহা ধ্রুব সত্য। কিন্তু সেখানকার সে যে অসীম সত্তা কিরূপ সত্তা, অসীম জ্ঞান কিরূপ জ্ঞান, অসীম আনন্দ কিরূপ আনন্দ, তাহা জগদ্‌বাসী বদ্ধ জীবদিগের কাহারো বুঝিতে পারিবার কথা নহে। সে যে স্থান নিস্তব্ধ গম্ভীর অগম্য অপার! "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" "মনের সহিত রাশি রাশি বাক্য সেখানে পৌঁছিতে না পারিয়া মাঝপথ হইতে ফিরিয়া আসে"। "আছে"—তাহা সুনিশ্চিত; কিন্তু "কিরূপ"—তাহা জানিতে পারা আমাদের এ অবস্থায় অতীব সুকঠিন; অনেক কালের সাধ্যসাধনা এবং তপস্যা দ্বারা অপরোক্ষ জ্ঞানের পরিস্ফুটন-ব্যতিরেকে তাহা কাহারো জ্ঞানায়ত্ত হইতে পারিবার কথা নহে। উপনিষদে তাই উক্ত হইয়াছে

"অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে" "'আছেন' এই কথা ছাড়া আর কী-কথা বলিয়া তাঁহাকে উপলব্ধি করা যাইবে?" অপরিসীম ধ্রুব সত্যকে এইরূপে যখন শুদ্ধ কেবল "আছেন" বলিয়া উপলব্ধি করা যায়, তখন তাঁহার নাম দেওয়া হইয়া থাকে "নির্গুণ ব্রহ্ম"। এখন দেখিতে হইবে এই যে, নির্গুণ ব্রহ্ম এবং সগুণ ব্রহ্ম বলিয়া দুই ব্রহ্ম নাই; তবে কি? না একই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম একভাবে নির্গুণ; আর একভাবে সগুণ। চন্দ্রের যেমন দুই পৃষ্ঠ—(১) এক পৃষ্ঠ পৃথিবীস্থ জীবের চক্ষুর গ্রাহ্য, (২) আর এক পৃষ্ঠ চক্ষুর অগ্রাহ্য; সদ্বস্তুর তেমনি দুই ভাব—(১) এক ভাব বুদ্ধির গ্রাহ্য, (২) আর-এক ভাব বুদ্ধির অগ্রাহ্য। নির্গুণ এবং সগুণের মধ্যে এইরূপ ভাবগত প্রভেদ ভিন্ন বস্তুগত প্রভেদ নাই।

ষষ্ঠ সূত্র।

সদ্বস্তুর সত্তা মৃত সত্তা নহে; তাহা জ্ঞানালোকে আলোকিত এবং প্রেমানন্দে পুলকিত জাগ্রত জীবন্ত সত্তা। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, সে সত্তা সমর্থিত হয় কিসের বলে? অবশ্য তাঁহার আপনারই শক্তির বলে; কেন না, তাঁহার বাহিরে দ্বিতীয় বস্তুও নাই—দ্বিতীয় শক্তিও নাই—আর, তাহার কথাও নাই। ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত মহাপণ্ডিত স্পেন্সর সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলে দেখিয়াছিলেন—একমাত্র অদ্বিতীয় Persistent Force কিনা আত্মসমর্থনী শক্তি। রূপকচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে স্পেন্সর্ চন্দ্রের একপিঠ দেখিয়াছিলেন—আর-এক পিঠ দেখেন নাই। এটা তিনি দেখিয়াও দেখেন নাই যে, আত্মবস্তুকে ছাড়িয়া আত্মসমর্থনী শক্তি এক প্রকার শিরোনাস্তি শিরঃপীড়া। কথাটা খুবই সত্য যে, একমাত্র অদ্বিতীয় আত্মসমর্থনী

শক্তি সর্ব্বজগতের মূলাধার; তবে কি না তাহা অঙ্গহীন। যে ব্যক্তির এক পা আছে—আরেক পা নাই, সে ব্যক্তি যেমন দাঁড়াইতে পারে না; স্পেন্‌সরের ঐ একপেয়ে কথাটি তেমনি দাঁড়াইতে পারে না। উহাকে বিধিমতে দাঁড় করাইতে হইলে উহার অঙ্গপূরণ করা নিতান্তই আবশ্যক। আমাদের দেশের সব-শাস্ত্রেই তাই বলে যে, আত্মবস্তু এবং আত্মশক্তি দুয়ে এক—একে দুই। বিশেষতঃ বেদান্ত এ বিষয়ে স্থির নিশ্চয় যে, শুদ্ধ সত্ত্ব কি না ঐশী সত্তা এবং মায়া কিনা ঐশী শক্তি একই বস্তু; তাহা ঈশ্বরের কারণ-শরীর। ফল কথা এই যে, ঐশী শক্তি ঐশী সত্তারই প্রভাব—ঐশী সত্তা ঐশী শক্তিরই আবির্ভাব। সদ্‌বস্তুর সঙ্গে সদ্‌বস্তুর সত্তা এবং শক্তি অবিচ্ছেদে মিশিয়া আছে;—ঐশী শক্তি সেই সত্তাকে সমর্থন করে অর্থাৎ ফুটাইয়া তোলে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, আত্মশক্তি দ্বারা আত্মসত্তার সেই যে, সমর্থন, তাহার প্রক্রিয়া কিরূপ?

সপ্তম সূত্র।

এটা সকলেরই দেখা কথা যে, কালো কাষ্ঠফলকের গাত্রে সাদা খড়ির আঁক পরিস্ফুট হয়; নৈশ অন্ধকারের গাত্রে পৃথিবীস্থ খদ্যোতমালার জ্যোতি এবং আকাশস্থ নক্ষত্রমালার জ্যোতি পরিস্ফুট হয়। পক্ষান্তরে, সাদা দেয়ালে সাদা খড়ি'র আঁক এবং দিবালোকে নক্ষত্র-জ্যোতি উভয়েই বেঘোরে পড়িয়া মাঠে মারা যায়। এটাও তেমনি দেখা উচিত যে, জড়ান্ধকারের প্রতিযোগেই চিদালোক পরিস্ফুট হয়। আত্মশক্তির কার্য্যই হ'চ্চে—জ্ঞানের প্রকাশকে অপ্রকাশের অঞ্জন দ্বারা ফুটাইয়া তোলা এবং একত্বরসের আস্বাদকে প্রকাশাপ্রকাশের সংঘট্টজাত বর্ণবৈচিত্র্যের রঞ্জন দ্বারা ফুটাইয়া তোলা; ফুটাইয়া তুলিয়া আত্মসত্তাকে

বলবতী এবং ফলবতী করা। আত্মশক্তি যদিচ একই শক্তি, তথাপি তাহার প্রক্রিয়া তিনটি—(১) আবরণ, (২) বিক্ষেপ, এবং (৩) সমাধি। আবরণ ক্রিয়া কি? না আত্মার প্রকাশকে ঢাকা দিয়া তাহার স্থানে অপ্রকাশের বা তমোগুণের অবতারণা; বিক্ষেপক্রিয়া কি? না প্রকাশা-প্রকাশের পরস্পরের মধ্যে ঘাতপ্রতিঘাতের বা রজোগুণের প্রবর্ত্তনা; সমাধিক্রিয়া কি? না প্রকাশাপ্রকাশের ঘাতপ্রতিঘাত অতিক্রম করিয়া উৎকৃষ্টতর প্রকাশে বা সত্ত্বগুণে ভর দিয়া দাঁড়ানো। এখন দ্রষ্টব্য এই যে মাঝের ঐ যে রজোগুণ—কিনা বিক্ষেপ-ক্রিয়া—ঐ যে প্রকাশাপ্রকাশের ঘাতপ্রতিঘাত—ঐটিই হ'চ্চে আত্মশক্তির এক-প্রকার নাড়ীস্পন্দন। প্রকাশাপ্রকাশের ঘাতপ্রতিঘাতই আত্মশক্তির উদ্যম-বিরাম, রূপকের ভাষায়—মাংসপেশীর সংকোচবিকোচ। ধ্বনি যেমন হিল্লোলে হিল্লোলে প্রবাহিত হয়, আলোক যেমন তরঙ্গে তরঙ্গে প্রধাবিত হয়, আত্মশক্তির সত্তাসমর্থনী ক্রিয়া সেইরূপ প্রকাশাপ্রকাশের ঘাতপ্রতিঘাতের যমকচ্ছন্দে নৃত্য করিতে করিতে প্রথমে প্রকাশ হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া নানাপ্রকার বর্ণবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া গাঢ় হইতে গাঢ়তর অপ্রকাশে অবতরণ করে; তাহার পরে, অপ্রকাশ হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া আবার ঐরূপ যমকচ্ছন্দে ঘাতপ্রতিঘাতের পক্ষ-দুটা হেলন করিতে করিতে ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর এবং উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর প্রকাশে সমুত্থান করে। এই দুই প্রকার গতিপদ্ধতির প্রথমটির নাম অনুলোম পদ্ধতি, দ্বিতীয়টির নাম প্রতি-লোম পদ্ধতি। এ দুইটি গতি-পদ্ধতি (অর্থাৎ অনুলোম এবং প্রতিলোম পদ্ধতি) সাংখ্যাদি শাস্ত্রের মতে এইরূপ:—

গোড়ার সেই যে ঐশ্বরিক জ্ঞান—সাংখ্যাদি শাস্ত্রে যাহার নাম দেওয়া হইয়াছে মহান্ কিনা অবাধিত এবং অপরিচ্ছিন্ন বুদ্ধিতত্ত্ব—

ঐশীশক্তি সর্ব্বপ্রথমে সেই মহান্‌কে ঢাকা দিয়া তাহার স্থানে অল্পজ্ঞতা-সুলভ অহঙ্কারকে আনিয়া দাঁড় করায়; তাহার পরে, অহঙ্কারের উপরে আর-এক পোঁচ নীলাঞ্জন লেপন করিয়া অহঙ্কারের স্থানে মনঃপ্রধান একাদশ ইন্দ্রিয় আনিয়া দাঁড় করায়; আর, সেই সঙ্গে ইন্দ্রিয়গণের পাঁচটি সূক্ষ্ম ভৌতিক উপাধি, যেমন—স্থূল শব্দের বীজভূত সূক্ষ্ম শব্দ, স্থূল স্পর্শের বীজভূত সূক্ষ্ম স্পর্শ, স্থূল অগ্নির বীজভূত সূক্ষ্ম অগ্নি, স্থূল মৃত্তিকার বীজভূত সূক্ষ্ম মৃত্তিকা অর্থাৎ শাস্ত্রীয় ভাষায় যাহাকে বলে পঞ্চ তন্মাত্র, সেই পঞ্চ তন্মাত্র আনিয়া দাঁড় করায়।* সর্ব্বশেষে পঞ্চতন্মাত্রকে ঢাকা দিয়া তাহার স্থানে পঞ্চ

* পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ তন্মাত্রের মধ্যে সম্বন্ধ কি যদি জিজ্ঞাসা কর তবে তাহা সংক্ষেপে এই:—প্রত্যেক জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দুই পৃষ্ঠ—(১) আধ্যাত্মিক পৃষ্ঠ এবং (২) আধিভৌতিক পৃষ্ঠ। যেমন—দর্শনেন্দ্রিয়ের আধ্যাত্মিক পৃষ্ঠ হচ্চে দর্শন-ক্রিয়া বা দেখা; ভৌতিক পৃষ্ঠ হ'চ্চে আলোক। দৃষ্টি এবং আলোকের মধ্যে প্রাণের টান এম্নি মর্ম্মান্তিক-গোচের যে, একটি মরিলে দুইটি মরে—একটি বাঁচিলে দুইটি বাঁচে। তা'র সাক্ষী—দৃষ্টি লুপ্ত হইলেই আলোক লুপ্ত হয়—আলোক লুপ্ত হইলেই দৃষ্টি লুপ্ত হয়; দেখা-আলোকই আলোক, আলোক-দেখাই দেখা; অ-দেখা আলোক আলোকই নহে, অন্ধকার-দেখা দেখাই নহে। দৃষ্টি-জ্যোতি এবং দৃশ্যজ্যোতি দুইই জ্যোতি; প্রভেদ কেবল এই যে, দৃষ্টিজ্যোতি আধ্যাত্মিক, দৃশ্যজ্যোতি আধি-ভৌতিক। কিন্তু দৃষ্টিজ্যোতি এবং দৃশ্যজ্যোতি পরস্পরের সহিত এরূপ মাখামাখি-ভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে যে একটির সঙ্গ হইতে অপরটিকে ছাড়ানো কোনো প্রকারেই সম্ভবসাধ্য নহে। এইজন্য সাংখ্যাদি শাস্ত্রে বলে এই যে, দর্শন-ক্রিয়া এক কিন্তু তাহার পৃষ্ঠ দুই; এক পৃষ্ঠ হ'চ্চে দর্শনেন্দ্রিয়, আর এক পৃষ্ঠ হ'চ্চে দর্শন-তন্মাত্র। দর্শনেন্দ্রিয় যেমন চর্ম্মচক্ষুর সারভূত সূক্ষ্ম চক্ষু, দর্শন-তন্মাত্র তেমনি সামান্য ধাঁচার আলোকের সারভূত একপ্রকার সূক্ষ্ম আলোক। দর্শন-তন্মাত্রের সহিত দর্শনেন্দ্রিয়ের এ যেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা গেল, শব্দতন্মাত্রের সহিত শ্রবণেন্দ্রিয়েরও তেমনি, স্পর্শ-তন্মাত্রের সহিত স্পর্শেন্দ্রিয়েরও তেমনি, রস-তন্মাত্রের সহিত রসনেন্দ্রিয়েরও তেমনি, গন্ধতন্মাত্রের সহিত ঘ্রাণেন্দ্রিয়েরও তেমনি; স্বসম্পর্কীয় তন্মাত্রের সহিত প্রত্যেক জ্ঞানেন্দ্রিয়েরই তেমনি; মাখামাখিভাবের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। তন্মাত্র-শব্দের শাব্দিক অর্থ—তন্-মাত্র অর্থাৎ তাই-মাত্র;—যেমন গন্ধতন্মাত্র—শুদ্ধ কেবল গন্ধমাত্র—ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যতা-মাত্র—তাছাড়া আর-কিছুই নহে।

স্থূল ভূতকে আনিয়া দাঁড় করায়। এই গেল অনুলোম পদ্ধতি। ঐশীশক্তি প্রথম উদ্যমে অনুলোম পদ্ধতি-অনুসারে পাঞ্চভৌতিক জগৎ নিঃশ্বসিত করে, নিঃশ্বসিত করিয়া ভবিষ্যৎ প্রকাশ্য জীবগণের ভোগের উপকরণ-সামগ্রীসকল প্রস্তুত করে। তাহার পরে প্রতি-লোম পদ্ধতি-অনুসারে ভৌতিক জগতের তামসিক আবরণ ক্রমে ক্রমে উন্মোচন করিয়া প্রথমে বীজভাবাপন্ন নিম্নতম জীব (Protoplasm), তাহার পরে উচ্চ হইতে উচ্চতর জীব, এবং পরিশেষে উচ্চতম জীব, কিনা মনুষ্য, অভিব্যক্ত করিয়া তোলে; তাহার পরে, মনুষ্যকে সুখদুঃখময় ভোগরাজ্য হইতে পরমানন্দময় মোক্ষধামে পৌঁছাইয়া দ্যায়।

প্রকৃত কথা যাহা তাহা এই :—সত্তা এক; প্রকাশাপ্রকাশ দুই; প্রকাশাপ্রকাশ এবং উভয়ের মধ্যবর্ত্তী বর্ণবৈচিত্র্য বহু। প্রকাশকে ফুটাইয়া তুলিতে হইলে প্রকাশাপ্রকাশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আবশ্যক; আনন্দকে ফুটাইয়া তুলিতে হইলে প্রতিদ্বন্দী পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সন্ধি-স্থাপন বা সমাধি-সংঘটন আবশ্যক। সেই যে ঐশীশক্তি যাহা সর্ব্ব-জগতের মূল কারণ—সেই ঐশীশক্তি ঐশী সত্তা প্রকটন করিবার উদ্দেশে স্বভাবতই ঐ দুই কার্য্যে নিত্যকাল লাগিয়া রহিয়াছে—অকাতরে এবং অবিশ্রান্তভাবে। উপনিষদে আছে "স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" "ঈশ্বরের জ্ঞানক্রিয়া এবং বলক্রিয়া স্বাভাবিকী"। বৈচিত্র্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা প্রতিযোগিতা নানা প্রকার। যেমন—রাত্রিদিনের প্রতিযোগিতা, শীতগ্রীষ্মের প্রতিযোগিতা, শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতিযোগিতা, এইরূপ কত যে তাহার সংখ্যা নাই। আবার প্রতিযোগী পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সন্ধিস্থান বা সমাধি-স্থান রহিয়াছে—কোথাও বা দুইটি—কোথাও বা একটি। তার সাক্ষী :—রাত্রিদিনের

মধ্যে একটি সমাধিস্থান প্রাতঃসন্ধ্যা ; আর-একটি সমাধিস্থান সায়ং-সন্ধ্যা। শীতগ্রীষ্মের মধ্যে একটি সমাধিস্থান শরৎ ; আরেকটি সমাধি-স্থান বসন্ত। প্রাণায়ামক্রিয়ার প্রতিযোগী পক্ষদ্বয় হ'চ্চে রেচক এবং পূরক ; আর, উভয়ের সমাধিস্থান হ'চ্চে কুম্ভক। এখন দেখিতে হইবে এই যে, শীতগ্রীষ্মের সমাধি-স্থান যেমন বসন্ত, সুখ-দুঃখের সমাধিস্থান তেমনি মুক্তির আনন্দ। আত্মার ঐ যে সমাধিস্থান মুক্তি, ঐ সমাধি-স্থানে সুখের উন্মত্ততা শান্তিরসে পরিণত হয় এবং দুঃখের জ্বালাযন্ত্রণা কারুণ্য রসে পরিণত হয় ; এইরূপে সুখদুঃখ একীভূত হইয়া সুবিমল আনন্দে পরিণত হয়। এখানে অতীব একটি গুরুতর কথা আছে—সেটাও ভাবিয়া দেখিবার বিষয় ; সে কথা এই :—রাত্রি-দিনের প্রতিযোগিতা, শীতগ্রীষ্মের প্রতিযোগিতা, শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতি-যোগিতা, জন্মমৃত্যুর প্রতিযোগিতা, এইরূপ যেখানে যতপ্রকার প্রতি-যোগিতা আছে—তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক রকমের প্রতি-যোগিতা হ'চ্চে সগুণ নির্গুণের প্রতিযোগিতা। সুষুপ্ত অবস্থায় যখন আমাদের আত্মশক্তি অপ্রকাশে নিলীন থাকে তখন আমরা নির্গুণ হই ; জাগরিতাবস্থায় যখন আমাদের আত্মশক্তি প্রকাশে ভর দিয়া দাঁড়ায় তখন আমরা সগুণ হই ; স্বপ্নাবস্থায় আমরা প্রকাশ এবং অপ্র-কাশের মধ্যে—সগুণ এবং নির্গুণের মধ্যে—দোলায়মান হই। বেদান্তশাস্ত্রে বলে যে, সমাধি-অবস্থা তুরীয় অবস্থা, অর্থাৎ তাহা না জাগরিতাবস্থা, না স্বপ্নাবস্থা, না সুষুপ্তাবস্থা, পরন্তু তিনের অতীত চতুর্থ অবস্থা। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, সে যে চতুর্থ অবস্থা তাহা কিরূপ অবস্থা ? বৈদান্তিক পণ্ডিতগণের কথার ভাবে শ্রোতার এরূপ মনে হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে যে, তাহা স্বপ্ন জাগ্রৎ এবং সুষুপ্তি এই তিনের সমাহিত অবস্থা বা একীভূত অবস্থা ; আর, তাহা তিনের "সমাহিত"

অবস্থা বলিয়া তাহার নাম "সমাধি"। তাহা যদি হয়, তবে তাহাতে এইরূপ দাঁড়ায় যে তাহা নির্গুণ এবং সগুণ এই দুই ভাবের ঐক্যস্থান বা সমাধি স্থান। বিষয়টি অতিশয় দুরূহ; অতএব আজ এইখানেই বিশ্রাম করা শ্রেয়। আগামী বারে জিজ্ঞাস্য বিষয়টির মীমাংসায় সাধ্যমতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে।

চতুর্দ্দশ অধিবেশন।

ব্যাখ্যান।

বিগত দুইবারের অধিবেশনে গীতোক্ত "ব্রহ্মনির্ব্বাণ" শব্দের ভাবার্থের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া প্রসঙ্গক্রমে--কিরূপ অবস্থার নাম মুক্ত অবস্থা, তদ্বিষয়ে আমার যেরূপ ধারণা তাহারই আমি অল্প একটু ইঙ্গিত করিয়াছিলাম; বলিয়াছিলাম যে, আত্মার বন্ধন-শূন্য স্বাভাবিক অবস্থার নামই মুক্ত অবস্থা। কিন্তু বেদান্তাদি-শাস্ত্রের মতানুসারে সমাধির অবস্থা একরূপ "তুরীয়" অবস্থা, অর্থাৎ তাহা জাগরিতাবস্থাও নহে, স্বপ্নাবস্থাও নহে, সুষুপ্ত অবস্থাও নহে--পরন্তু তিনের অতীত চতুর্থ অবস্থা; আর তাহাই মুক্ত অবস্থার পূর্ব্বাভাস। বেদান্তের এ কথাটার ভাব যে কি তাহা সহজে কাহারো বোধগম্য হইবার সম্ভাবনা না দেখিয়া শেষে বলিয়াছিলাম "বিষয়টা অতিশয় দুরূহ---এখন এই পর্য্যন্তই থা'ক্।" এখন দেখিতেছি যে, ভয়ের কোনো কারণ নাই; --অন্ধকার রাত্রে দূর হইতে দেখিয়া যাহাকে ব্যাঘ্র মনে হইতেছিল---বক্ষে সাহস বাঁধিয়া প্রদীপ ধরিয়া দুই চারি পা তাহার নিকটাভিমুখে অগ্রসর হইবামাত্র দেখিতে পাওয়া গেল যে, ব্যাঘ্রের নাম গন্ধও তাহাতে নাই—তাহা দিব্য একটি মটোরী গাভী! কামধেনু বিশেষ। উহাকে দোহন করিলে কত না জানি সুস্বাদু এবং বলপুষ্টিকর পাথেয়-সম্বল লাভ করা যাইতে পারিবে! অতএব কালবিলম্ব না করিয়া দোহন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যা'ক্।

প্রশ্ন। এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, একমাত্র অদ্বিতীয় সত্য পরমাত্মা কোনো প্রকার বন্ধনশৃঙ্খলে বিজড়িত নহেন, সুতরাং তিনি যে শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ এ বিষয়ে কাহারো দ্বিরুক্তি হইতে পারে না।

জীবাত্মা কিন্তু ত্রিগুণপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত ; তা যখন, তখন জীবাত্মার মুক্ত অবস্থা কিরূপ সেইটিই হ'চ্চে জিজ্ঞাস্য।

উত্তর। মুণ্ডকোপনিষদে তোমার জিজ্ঞাস্য বিষয়টির সন্ধান কেমন সুন্দর সহজ ভাবে দুই কথায় বলিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা যদি একবার চক্ষু মেলিয়া দেখ, তবে তোমার মনের ধন্দ মিটাইবার জন্য তোমাকে আর-কাহারো দ্বারস্থ হইতে হইবে না। বলা হইয়াছে—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং
বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরেকঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি।
অনশ্নন্ অন্যো অভিচাকশীতি।
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো
অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যতি অন্যমীশং
—অস্য মহিমানং ইতি বীতশোকঃ।"

ইহার অর্থ :—

সুন্দর পক্ষদ্বয়ে শোভমান দুইটি সযুক্ (কিনা সহযোগী) সখাপক্ষী (কিনা জ্ঞানপ্রেমে শোভমান জীবাত্মা পরমাত্মা) একই বৃক্ষ (কিনা জগদ্বৃক্ষ) আঁকড়িয়া ধরিয়া রহিয়াছে। দুইটির একটি স্বাদু ফল খাইতেছে (অর্থাৎ ভোগে রত) আর একটি না খাইয়া অন্যটির খাওয়া দেখিতেছে। খাওয়া-তেই যেটি মগ্ন, সে তাহার সখার সঙ্গে বাস করিতেছে যদিচ একই বৃক্ষে, তথাপি সে মোহে মুহ্যমান হইয়া "আমি অনীশ (অর্থাৎ আমি অতি দীনহীন—আমার কোনো সামর্থ্য নাই—আমার কি হইবে," এই বলিয়া শোচনা করে (কিনা দুঃখ করে); কিন্তু সে যখন তাহার সম্ভজনীয় ঈশ'কে (কিনা শনুক্তিমা

প্রভুকে) দেখে, আর সেই যোগে ইহার (কিনা এই আত্মার) মহিমাকে দেখে (অর্থাৎ যখন দেখে যে, আমার মহিমা (কিনা বড়ত্ব) উনি—আমার ঐশ্বর্য্য উনি—আমার কিসের অভাব) তখন দুঃখশোক হইতে মুক্ত হয়।”*

উপনিষদ্‌শাস্ত্রের অন্য একস্থানে উক্ত হইয়াছে—

“ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্যকর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥”

পরমাত্মার দর্শন লাভ হইলে হৃদয়ের কঠিনতা ভগ্ন হইয়া যায়, সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়, কর্ম্মজনিত সংস্কার বাসনা এবং ফলাফল ক্ষয়-প্রাপ্ত হইয়া যায়।”

জীবাত্মার মুক্ত অবস্থা এ ছাড়া আর যে কিরূপ হইতে পারে তাহা আমি জানি না। সার কথা আমি যাহা বুঝি তাহা এই যে, জীবাত্মা আপনি আপনার ক্ষুদ্রত্ব—আপনি আপনার দৈন্যদশা—আপনি আপনার বন্ধনপাশ; আর পরমাত্মাই জীবাত্মার মহিমা, পরমাত্মাই জীবাত্মার ঐশ্বর্য্য, পরমাত্মাই জীবাত্মার শক্তিসামর্থ্য, পরমাত্মাই জীবাত্মার মুক্তির নিদান।

প্রশ্ন। তুমি বলিতেছ জীবাত্মা আপনি আপনার বন্ধন;—কিসের বন্ধন?

উত্তর। সকল শাস্ত্রেই একবাক্যে বলে যে, জীবাত্মার সে যে বন্ধন তাহা ত্রিগুণের বন্ধন; আর, সেই সঙ্গে এটাও বলে যে, ত্রিগুণাতীত অবস্থার নামই মুক্ত অবস্থা।

---

* রাজাকে যেমন His *majesty* বলা হয়, এখানে তেম্নি পরমাত্মাকে জীবাত্মার মহিমা (কিনা বড়ত্ব) বলা হইতেছে। জীবাত্মা ছোটো আত্মা—পরমাত্মা বড় আত্মা; পরমাত্মাকে তাই জীবাত্মার বড়ত্ব বলা হইতেছে।

প্রশ্ন। কিন্তু গুণের সহিত মূলেই যাহার কোনো সম্পর্ক নাই এরূপ পদার্থ কাহারো কোনো কাজে আসিতেও পারে না,—ভোগে আসিতেও পারে না, আর, তা ছাড়া, তাহা জ্ঞানেরও উপলব্ধিগম্য নহে। অতএব শাস্ত্রে যাহাই বলুক্ না কেন—"নির্গুণ আত্মা জ্ঞানের বা ভাবের বা সাধনের বস্তু" এই অর্থশূন্য কথাটা সোণার পাথর-বাটির ন্যায় একটা ফাঁকা আওয়াজ বই আর কিছুই নহে। পাথর-বাটি যেমন সোণার বাটি হইতে পারে না, জ্ঞানাতীত, ভাবাতীত, এবং ধ্যানাতীত নির্গুণ আত্মা তেমনি জ্ঞানের বা ভাবের বা সাধনের বস্তু হইতে পারে না।

উত্তর। নির্গুণ-শব্দের অর্থ তুমি যদি এইরূপ বুঝিয়া থাক' যে, গুণের সহিত মূলেই যাহার কোনো সম্পর্ক নাই তাহাকেই বলে নির্গুণ পদার্থ, তবে ঐ যাহা তুমি বলিলে—যে, নির্গুণ আত্মা সোণার পাথর-বাটিরই আর এক নাম—তোমার ও-কথা খুবই ঠিক্। আমি কিন্তু উহার অর্থ আর-একরূপ বুঝি। দেশীয় শাস্ত্রের বাক্যাবরণের ভিতর-অঞ্চলে উঁকি দিয়া দেখিতে গিয়া আমার শুভাদৃষ্টক্রমে এই একটি নিগূঢ় তত্ত্বের আমি সন্ধান পাইয়াছি যে,

নির্গুণ—অন্তর্লীন-গুণ

সগুণ—প্রাদুর্ভূত-গুণ

আমার একথাটি যে কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহার চারিটি দৃষ্টান্ত তোমাকে পরে পরে দেখাইতেছি, তাহা দেখিলে উহার প্রকৃত মর্ম্ম এবং তাৎপর্য্য বোধ করি সহজেই তোমার হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে। প্রথম দৃষ্টান্তটি নিতান্তই মোটামুটি ভাবের দৃষ্টান্ত; দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি তাহা অপেক্ষা সূক্ষ্মতর; তৃতীয় এবং চতুর্থ দৃষ্টান্ত-দুটি তাহা অপেক্ষা আরো সূক্ষ্মতর, আর, সেই জন্য সব চেয়ে বেশী কাজের।

প্রথম দৃষ্টান্ত।

একটা কচ্ছপ আপনার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভিতরে টানিয়া লইয়াছে দেখিয়া কোনো দর্শক যদি বলে যে, কচ্ছপটা এক্ষণে নিরঙ্গ হইয়াছে, তবে তাহাতে বোঝা উচিত শুধু এই যে, কচ্ছপটার শরীর এক্ষণে লীনাঙ্গ, তা বই, এরূপ বোঝা উচিত নহে যে, কচ্ছপটা'র শরীর এক্ষণে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত একেবারেই সম্পর্ক রহিত। কেননা, কচ্ছপটার শরীর যদি তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত একেবারেই সম্পর্করহিত হইত, তবে কচ্ছপটা কোনো কালেই ভূতলে চলিয়া বেড়াইতে পারিত না। তেমনি আত্মা যদি গুণের সহিত একেবারেই সম্পর্কবর্জ্জিত হ'ন, তাহা হইলে কোনো হিসাবেই (এমন কি স্বপ্নেও) কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি গুণ আত্মাতে আরোপ-যোগ্য হইতে পারে না।

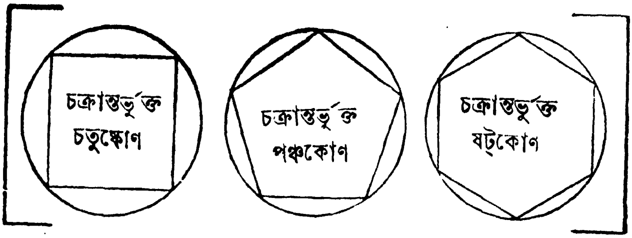
দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত।

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের এটা একটা সুপরীক্ষিত সিদ্ধান্ত যে, লোকে যাহাকে বলে "অচল পর্ব্বত" তাহার অন্তর্ভূত সূক্ষ্মাৎসূক্ষ্মতর সমস্ত পরমাণু কামানের গোলা অপেক্ষাও শতসহস্রগুণ দ্রুতবেগে ঘোরাফেরা করিতেছে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের সূক্ষ্মদৃষ্টির এটা যদিচ একটা দেখা কথা যে, পর্ব্বত-একটা আর কিছু না—কেবল ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাণুগণের প্রমত্ত লীলাক্ষেত্র, আর সেই জন্য উহার কাঠিন্য গুণই বা কি, আর স্থৈর্য্য গুণই বা কি, উহার কোনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণই উহাতে আরোপযোগ্য নহে, সুতরাং উহা এক-প্রকার নির্গুণ পদার্থ; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তোমার আমার মতো লোকের অমার্জ্জিত চক্ষে পর্ব্বতটাতে তাহার কাঠিন্যাদি কোনো

গুণেরই অসদ্ভাব নাই—সুতরাং ওটা একটা মস্ত সগুণ পদার্থ। একই পর্ব্বত একই সময়ে যখন এক-দ্রষ্টার চক্ষে নির্গুণ, আর এক-দ্রষ্টার চক্ষে সগুণ, তখন কেমন করিয়া বলিব যে, গুণের সহিত মূলেই যাহার কোনো সম্পর্ক নাই তাহারই নাম নির্গুণ।

তৃতীয় দৃষ্টান্ত।

জ্যামিতি-শাস্ত্রে লেখে এই যে, একটা চক্র যেমন-কেন হউক না, তাহার ভিতরে নানা কোণ-বিশিষ্ট বহু-কোণ ফলক সংভুক্ত করা যাইতে পারে;—যেমন চতুষ্কোণ, পঞ্চকোণ, ষট্‌কোণ, সপ্তকোণ, ইত্যাদি।



এইরূপে যদি একটা চক্রের মধ্যে সহস্রকোণবিশিষ্ট বহু-কোণ-ফলক সম্ভুক্ত করা যায় (অর্থাৎ Inscribe করা যায়) তাহা হইলে বহুকোণ-ফলকটাকে অনুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতিরেকে শুধুচক্ষে দেখিলে কে বলিবে যে, তাহা চক্র নহে। কিন্তু চক্রের অন্তর্ভুক্ত বহুকোণ-ফলকের কোণাবলী যদি প্রকৃত-প্রস্তাবে সংখ্যাতীত হয়, তাহা হইলে বহুকোণ-ফলকটি আর বহুকোণ থাকিবে না—তাহা হইলে তাহা তাহার আধার চক্রের সহিত একেবারেই একীভূত হইয়া যাইবে। এই তো দেখিতেছি যে, চক্র নিজেও যা, আর চক্রের অন্তর্ভুক্ত আতিকোণিক * বহুকোণফলকও তা, দুয়ের মধ্যে মূলেই কোনো

*"আতিকোণিক" অর্থাৎ সংখ্যাতীত কোণবিশিষ্ট।

প্রভেদ নাই। তবে আর কেমন করিয়া বলিব যে, চক্র নিষ্কোণ বলিয়া তাহা কোণের সহিত একেবারেই সম্পর্ক রহিত? উল্টা আরো বলা উচিত যে, চক্র নিষ্কোণ বলিয়াই তাহা আপনার পরিধির অন্তর্ভুক্ত সংখ্যাতীত কোণাবলীর লয়স্থান বা সমাধিস্থান। তবেই হইতেছে যে চক্রকে নিষ্কোণ বলিলেও এরূপ বুঝায় না যে, চক্র কোনো অংশে কোণের সহিত সম্পর্করহিত, আর, আত্মাকে নির্গুণ বলিলেও এরূপ বুঝায় না যে, আত্মা কোনো অংশে গুণের সহিত সম্পর্করহিত। চক্রকে নিষ্কোণ বলিলে বুঝায় শুধু এই যে, চক্র আপনার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত কোণের লয়স্থান; তেমনি আবার আত্মাকে নির্গুণ বলিলে বুঝায় শুধু এই যে, আত্মা আপনার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত গুণের লয়স্থান।

চতুর্থ দৃষ্টান্ত।

ছাত্র-একটি জিজ্ঞাসা করিল—"কাহাকে বলে বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত?"

পণ্ডিত মহাশয় তাহার উত্তর দিলেন, "কালের যে মুহূর্ত্ত না-ভূত না-ভবিষ্যৎ তাহারই নাম বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত।" পণ্ডিত মহাশয়ের এই কথাটির যদি অর্থ করা যায় এইরূপ যে, ভূতভবিষ্যতের সহিত মূলেই যাহার কোনো সম্পর্ক নাই সেইরূপ মুহূর্ত্তকেই বলে বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত, তবে সেরূপ একটা যূথভ্রষ্ট মুহূর্ত্ত বাস্তবিকই আকাশ-কুসুমের ন্যায় ন-ভূতো ন-ভবিষ্যতি তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। আমার অভিধানে কিন্তু আর একরূপ লেখে; এইরূপ লেখে যে, "বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত না-ভূত না-ভবিষ্যৎ" এটা কেবল একটা শব্দ। ঐ শব্দটির অর্থ এই যে, বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত দুইটি মুহূর্ত্তের লয়স্থান, বা সঙ্গমস্থান, বা সমাধিস্থান। সে দুইটি মুহূর্ত্তের একটি হ'চ্চে ভূতকালের শেষ মুহূর্ত্ত, আর-

একটি হ'চ্চে ভবিষ্যৎ কালের আরম্ভ মুহূর্ত্ত। এটা যখন স্থির যে, বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের মধ্যে ভূত মুহূর্ত্ত "যা'ব যা'ব" করিতেছে, এবং ভবিষ্যৎ মুহূর্ত্ত "হ'ব হ'ব" করিতেছে, তখন কেমন করিয়া বলিব যে, বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের সঙ্গে ভূত ভবিষ্যতের মূলেই কোনো সম্পর্ক নাই ?

প্রশ্ন। দৃষ্টান্ত এবং উপমা যথেষ্ট হইয়াছে। এখন তোমার মোট কথাটি যাহা তুমি বলিতে চাহিতেছ সেইটি আমাকে বলো।

উত্তর। আমার মোট কথাটি এই যে, আত্মা এক অর্থে নির্গুণ আর এক অর্থে সগুণ। যে অর্থে আত্মাতে আত্মার সমস্ত গুণ একীভূত ভাবে, অনির্ব্বচনীয় ভাবে, নির্বিশেষ ভাবে, অন্তর্ভূত, সেই অর্থে আত্মা নির্গুণ ; আর, যে অর্থে, আত্মাতে আত্মার বিশেষ বিশেষ গুণ বিশেষ বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে ন্যূনাধিক পরিমাণে প্রাদুর্ভূত বা প্রকটীভূত, সেই অর্থে আত্মা সগুণ।

প্রশ্ন। আত্মাকে যদি নির্গুণ বলিতে চাও তো নির্গুণ বলো, সগুণ বলিতে চাও তো সগুণ বলো ;—কিন্তু আত্মাকে তুমি দুইই বলিতেছ কোন্ যুক্তিতে তাহা মূলেই আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

উত্তর। যাহাতে তুমি তাহা অবলীলাক্রমে বুঝিতে পারিবে, তাহার মতো করিয়া সাজাইয়া একটি দৃষ্টান্ত তোমাকে আমি দেখাইতেছি—প্রণিধান কর।

একজন পরিব্রাজক একটা পাহাড়ের শিখর হইতে দূরবীণ কসিয়া নিম্নস্থিত নগরগ্রামের রাস্তা ঘাট নিরীক্ষণ করিতেছেন। দৃশ্যমান নগরটির কোন্ রাস্তার কোথায় আরম্ভ, কোন্ দিকে গতি, কোথায় পরিসমাপ্তি, সমস্তই তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে দেদীপ্যমান। এটাও তিনি দেখিলেন যে, একটা দোতালা-মহল কোটা বাড়ির নীল প্রস্তরমণ্ডিত ললাটফলকে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রহিয়াছে—"রাজবাটীর অতিথিশালা।"

কিয়ৎপরে তাঁহার ক্ষুৎপিপাসার উদ্রেক হওয়াতে অতিথিশালায় যাইবার কোন্‌টা সোজা পথ তাহা দেখিয়া লইয়া পর্ব্বত হইতে নামিয়া সেই পথটি অবলম্বন করিয়া যথাসময়ে অতিথিশালায় উপনীত হইলেন। পর্ব্বতশিখর হইতে দূর্বীণ কসিয়া তিনি যেরূপ বহুপথসমাকীর্ণ চিত্তচমৎকারিণী মহানগরী দেখিয়াছিলেন, অতিথিশালার পথে প্রবেশ করিয়া তাহার চিহ্নমাত্রও দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার দুইবারের দেখা দুইরকম নগরের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। পূর্ব্বে পর্ব্বতের উপর হইতে নগরের যেখানকার যত কিছু দেখিবার বস্তু সবই একযোগে তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল ; এক্ষণে তাঁহার প্রয়াণ-মার্গের দুই ধারের কতকগুলা ময়রার দোকান, বস্ত্রের দোকান, এবং বসতবাটী ছাড়া আর কিছুই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। এখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করি যে, এবারের দেখা এই রকম নগর এবং সেবারের দেখা সেই রকম নগর কি বাস্তবিকই দুই নগর? কখনই না! নগর এক বই দুই নহে ; প্রভেদ কেবল এই যে, সেবারকার দেখা নগর সমগ্রভাবে দেখা, এবারকার দেখা নগর সংকীর্ণভাবে দেখা। এখন আর, বোধ করি, এটা তোমার বুঝিতে বিলম্ব হইবে না যে, পরিব্রাজক যেমন পর্ব্বতশিখর হইতে দূর্বীণ কসিবার সময় নগরের অন্তর্গত সমস্ত রাস্তাঘাটের মোট দৃশ্যটি সমগ্র নগরের সহিত একীভূত দেখিয়াছিলেন ; আবার পর্ব্বত হইতে নাবিয়া অতিথিশালায় প্রবেশ করিবার সময় একটীমাত্র পথের দুইধারের দ্রষ্টব্য বিষয়গুলিতে তাঁহার দৃষ্টি আটক পড়িয়া গিয়াছিল, তেমনি আত্মাকে সমগ্রভাবে দেখিলে আত্মার কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, জ্ঞাতৃত্ব প্রভৃতি সমস্ত গুণ আত্মাতে একীভূতরূপে বা তন্ময়ীভূতরূপে প্রতীয়মান হয় ; আর তাহারই নাম—"আত্মা নির্গুণ" ; পক্ষান্তরে, কার্য্যানুরোধে আত্মাকে

সংকীর্ণ ভাবে দেখিলে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, আত্মা কর্ম্ম করিবার সময় কর্ত্তা, সত্য উপলব্ধি করিবার সময় জ্ঞাতা, সুখ দুঃখ ভোগ করিবার সময় ভোক্তা—এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন গুণের প্রাদুর্ভাব ক্ষেত্র; ইহারই নাম "আত্মা সগুণ"। তবেই হইতেছে যে, আত্মাকে সমগ্র ভাবে দেখিলে আত্মা নির্গুণ—সংকীর্ণ ভাবে দেখিলে আত্মা সগুণ।

প্রশ্ন। কিন্তু আত্মাকে কোনভাবে দেখা উচিত?

উত্তর। দুই ভাবেই দেখা উচিত। পরিব্রাজকটি যদি পর্ব্বতের শিখর হইতে দূর্বীণ কসিয়া সমগ্র নগরটি পর্য্যবেক্ষণ না করিতেন, তাহা হইলে কোন্ পথটা অতিথিশালায় যাইবার সোজা পথ, তাহার তিনি ঠাহর পাইতেন না; আবার তিনি যদি পর্ব্বত হইতে নামিয়া সেই সোজা পথটি অবলম্বন না করিতেন, তাহা হইলে তিনি যথা-সময়ে অতিথিশালায় উপনীত হইতে পারিতেন না। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, পরিব্রাজকের কার্য্যসিদ্ধির পক্ষে নগরটাকে সমগ্র ভাবে দেখা যেমন অবশ্যক, সংকীর্ণভাবে দেখা তেমনি আবশ্যক—দুইই সমান আবশ্যক। এ যেমন বলিবামাত্রই বুঝিতে পারা গেল, এটাও তেমনি বোঝা চাই যে, আত্মাকে দুই ভাবে দেখাই সাধকের পুরুষার্থ সিদ্ধির পক্ষে সমান আবশ্যক;—ধ্যানকালে সমগ্রভাবে দেখা আবশ্যক; কার্য্যকালে সংকীর্ণভাবে দেখা আবশ্যক। মোটামুটি-ভাবে এ যাহা বলিলাম ইহার সঙ্গে একটি টিপ্পনী জুড়িয়া দেওয়া চাই, নহিলে কথাটা অঙ্গহীন হইবে। সূক্ষ্ম ধরিতে গেলে ধ্যানকালেই বা কি, আর কার্য্যকালেই বা কি—উভয়-কালেই আত্মাকে একযোগে সগুণ এবং নির্গুণ দুইভাবে দেখা ভিন্ন সাধকের গত্যন্তর নাই; তবে কি না আত্মাকে অপেক্ষাকৃত নির্গুণ ভাবে উপলব্ধি করা সাধকের ধ্যানের

পক্ষে সবিশেষ ফলপ্রদ; অপেক্ষাকৃত সগুণ ভাবে উপলব্ধি করা সাধকের কার্য্যের পক্ষে সবিশেষ ফলপ্রদ।

প্রশ্ন। কিন্তু একই সময়ে আত্মাকে দুইভাবে দেখা কিরূপে সম্ভবে —সেইটিই হ'চ্চে বিষম সমস্যা।

উত্তর। তোমার প্রশ্ন শুনিয়া আমার জীবনের বছর আষ্টেক পূর্ব্বের একটি প্রীতিকর ঘটনা আমার মনে পড়িল। খ্যাত-নামা জগদীশ বসু মহাশয়ের সহিত যেদিন আমার সবেমাত্র প্রথম চাক্ষুষ পরিচয় ঘটে, সেই দিন তিনি কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার নূতন প্রণীত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রে চাক্ষুষ চেতনা'র প্রাণ-স্ফূর্ত্তির পরিমাণ মাপিতে গিয়া দেখিলেন যে, দ্রষ্টা-জীবের দুই চক্ষুর দৃষ্টি শক্তি কোনো সময়েই সমান মাত্রায় কার্য্যে খাটে না। এক চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি যখন যথোচিত পরিমাণে কার্য্যে খাটে, আর এক চক্ষুর দৃষ্টি-শক্তি তখন অপেক্ষাকৃত নিরুদ্যম ভাবে বিশ্রাম করে। বিজ্ঞানপ্রাণ বসু মহাশয় এই কথাটি বলিয়া সেই সঙ্গে এটাও বলিলেন যে, দৃশ্য-দর্শন-কালে দ্রষ্টা-জীবের কোনো সময়েই কিন্তু এরূপ অবস্থা ঘটে না যে, কেবলমাত্র তাহার একটি চক্ষুই একাকী কার্য্যে খাটিতেছে—আর একটি চক্ষু একেবারেই নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া আছে; তা নয়;—দৃশ্যদর্শনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই দ্রষ্টাজীবের দুই চক্ষু যুগপৎ কার্য্যে খাটে, তবে কিনা এক চক্ষুর দৃষ্টিশক্তির যখন স্ফূর্ত্তি বাড়িয়া উঠে, আরএক চক্ষুর দৃষ্টি-শক্তির তখন স্ফূর্ত্তি কমিয়া পড়ে, এইরূপে পালাক্রমে দুই চক্ষুর দৃষ্টি-শক্তির স্ফূর্ত্তির হ্রাসবৃদ্ধি হয়; এই যা—নচেৎ দৃশ্য দর্শনের ব্যাপারটিতে দৃষ্টিশক্তির কার্য্যকারিতা দুই চক্ষুতেই হরেদরে সমান। এখন আমি বলিতে চাই এই যে, দৃশ্যদর্শন-কালে যেমন দ্রষ্টাজীবের দুই চক্ষু সব সময়েই এক সঙ্গে কার্য্য করে, তত্ত্বদর্শনকালে তেমনি দ্রষ্টা পুরুষের

বুদ্ধির দুই চক্ষু সব সময়েই এক সঙ্গে কার্য্য করে। বুদ্ধির একটি চক্ষু হচ্চে মোট সত্যের মোট জ্ঞান; আর একটি চক্ষু হচ্চে সেই মোট সত্যের অন্তর্ভূত শাখা-সত্যের শাখা-জ্ঞান, অথবা, যাহা একই কথা—বিশেষ বিশেষ সত্যের বিশেষ বিশেষ জ্ঞান। জ্ঞাতা-পুরুষের এ দুই অন্তশ্চক্ষু পরস্পরের বিরোধী হওয়া দূরে থাকুক্—উন্টা আরো উভয়ে উভয়ের পৃষ্ঠপোষক এবং সঙ্গের সঙ্গী। তার সাক্ষী ঃ—অতিথিশালার পথে প্রবেশ করিবার সময় পর্ব্বতশিখর হইতে পর্য্যবেক্ষিত নগরের সমগ্র দৃশ্যটি যদি পরিব্রাজকের মন হইতে সমূলে অন্তর্ধান করিত, তাহা হইলে নগরের নানাস্থানের নানাপথের মধ্যে সম্মুখস্থিত পথটাই যে অতিথিশালায় যাইবার সোজা পথ, এ কথাটাও সেই সঙ্গে তাঁহার মন হইতে অন্তর্ধান করিত, আর, তাহা হইলে পুনরায় অতিথি-শালার ঠিকানা জানিয়া লওয়া তাঁহার পক্ষে আবশ্যক হইত, আর ঠিকানা অনুসন্ধানের ধন্ধায় পড়িলে যথাসময়ে অতিথিশালায় পৌঁছানো তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিত না। তেমনি আবার, পরিব্রাজক যে সময়ে পর্ব্বতশিখর হইতে দূর্বীণ কসিয়া নগরের সমস্ত রাস্তাঘাটের মোট দৃশ্যটি একযোগে নেত্রায়ত্ত করিয়াছিলেন, সে সময়ে তিনি যদি অতিথিশালায় যাইবার সোজা পথটি দেখিয়াও না দেখিতেন, তাহা হইলে সে দিন তাঁহার উদরান্ন যোটা ভার হইত।

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, পর্ব্বতশিখর হইতে দূর্বীণ কসিবার সময়েই বা কি, আর, নগরের মধ্য দিয়া পদব্রজে গমন করিবার সময়েই বা কি, দুই সময়েই নগরের সমগ্র দৃশ্যটির প্রতিও যেমন, আর, নগরান্তর্গত শাখাদৃশ্যটির প্রতিও তেমনি, দুয়েরই প্রতি মনোনিবেশ করা পরিব্রাজকের পক্ষে সমান আবশ্যক। এটা তুমি, বোধ করি এখন বুঝিয়াছ যে, দুই সময়ে দুইই সমান আবশ্যক; তাহা যেমন

বুঝিয়াছ, সেই সঙ্গে—কোন্‌টা কোন্ সময়ে কোন্ মাত্রায় আবশ্যক সেটাও তেমনি তোমার বোঝা চাই ;—এটাও বোঝা চাই যে, পরিব্রাজক যে-সময়ে নগর-পথের মধ্য দিয়া হাঁটিয়া চলিতেছেন সে-সময়ে পথের কোন্ ধার দিয়া ঘোড়ার গাড়ি যাতায়াত করিতেছে—কোন্ ধার দিয়া ট্র্যাম্ গাড়ি যাতায়াত করিতেছে এ সকল বিষয়ে তিনি যত না মনোযোগী—নগরের সমগ্র দৃশ্যটির ধ্যানে তাহা অপেক্ষা যদি বেশী মাত্রা মনোযোগী হ'ন, তাহা হইলে খুব সম্ভব যে, অতিথিশালায় পৌঁছিতে না পৌঁছিতে তাঁহার মস্ত একটা বিপদ ঘটিবে। তেমনি আবার, পর্ব্বতশিখর হইতে দূর্বীণ কসিবার সময় নগরের সমগ্র দৃশ্যটির প্রতি পরিব্রাজক যত না নিবিষ্টচিত্ত—অতিথিশালার ললাটশোভিত স্বর্ণাক্ষর-পংক্তির প্রতি যদি তাহা অপেক্ষা বেশীমাত্রা নিবিষ্টচিত্ত হ'ন, তাহা হইলে সমগ্র নগরটা যে কিরূপ বস্তু তাহা তাঁহার ধারণা ক্ষেত্রে ধরা দিবে না। প্রথমে তোমাকে দেখাইয়াছিলাম—পর্ব্বতশিখর হইতে দূর্বীণ কসিবার সময়েই বা কি, আর নগরপথ দিয়া অতিথিশালায় গমন করিবার সময়েই বা কি—দুই সময়েই নগরের সমগ্র দৃশ্য এবং শাখাদৃশ্য দুয়েরই প্রতি মনোনিবেশ করা পরিব্রাজকের পক্ষে সমান আবশ্যক ; কিন্তু কোন্ সময়ে কোন্ দৃশ্যটির প্রতি কোন মাত্রায় মনোনিবেশ করা আবশ্যক, তখন তোমার নিকটে সে বিষয়টির কোনো উল্লেখ করি নাই। এখন তোমাকে দেখাইলাম যে, পথ চলিবার সময় পথের কোথায় কি আছে এবং কোথায় কি ব্যাপার চলিতেছে তাহার প্রতি বেশী মাত্রা মনোনিবেশ করা আবশ্যক ; তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিবার সময় নগরের সমগ্র দৃশ্যটির প্রতি বেশীমাত্রা মনোনিবেশ করা আবশ্যক। এখন প্রকৃত কথা যাহা বক্তব্য তাহা এই :—

প্রথম কথা।

আত্মজ্ঞানের অনুশীলনের সময় বুদ্ধির দুই চক্ষুকে যুগপৎ কাজে খাটাইয়া আত্মাকে একযোগে নির্গুণ এবং সগুণ দুই ভাবে দেখাই উচিত।

দ্বিতীয় কথা।

বুদ্ধির দুই চক্ষুর প্রত্যেকটিকে কোনো সময়ে বা বেশী পরিমাণে কাজে খাটানো উচিত, কোনো সময়ে বা কম পরিমাণে কাজে খাটানো উচিত। ধ্যানের সময় আত্মার নির্গুণ সমগ্র ভাবের প্রতি বেশী মাত্রা মনোনিবেশ করা উচিত, কর্ম্মানুষ্ঠানের সময় আত্মার কার্য্যোপযোগী সগুণ ভাবের প্রতি বেশী মাত্রা মনোনিবেশ করা উচিত।

তৃতীয় কথা।

বুদ্ধির এক চক্ষুকে যে সময়ে যথোচিত মাত্রায় কার্য্যে খাটানো হইতেছে, আর এক চক্ষুকে সেই সময়ে যথাপরিমাণে বিশ্রাম দেওয়া উচিত। যে সময়ে আত্মার নির্গুণ সমগ্র ভাবের প্রতি তদ্‌গতচিত্তে মনোনিবেশ করা হইতেছে, সে সময়ে আত্মার সগুণভাবের আলোচনাকে যথা-পরিমাণে বিশ্রাম দেওয়া উচিত। তেমনি আবার, যে সময়ে বিশেষ কোনো কার্য্যোপলক্ষে আত্মার বিশেষ কোনো গুণের প্রতি বিশেষরূপে মনোনিবেশ করা হইতেছে, সে সময়ে আত্মার নির্গুণ সমগ্রভাবের আলোচনাকে যথাপরিমাণে বিশ্রাম দেওয়া উচিত।

প্রশ্ন। তোমার অন্তরের কথাটি আমি এতক্ষণে বুঝিতে পারিলাম। তুমি বলিতে চাহিতেছ এই যে সাধক যখন সমস্ত সংসার-

চিন্তা হইতে মনকে উঠাইয়া লইয়া সমগ্রভাবে পরমাত্মার প্রতি লক্ষ্য নিবিষ্ট করেন তখন তিনি পরমাত্মার কোনো বিশেষ গুণের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া তাঁহাকে একমাত্র অদ্বিতীয় পরিপূর্ণ সত্যরূপে উপলব্ধি করেন। আবার, যখন তিনি ধ্যানের কৈলাসশিখর হইতে নাবিয়া সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তখন বিশেষ বিশেষ অবস্থার বশতাপন্ন হইয়া, সেই সেই অবস্থার উপযোগী পরমাত্মার বিশেষ বিশেষ গুণের প্রতি লক্ষ্য নিবিষ্ট করেন;— বিপদের সময় পরমাত্মাকে বিপদের কাণ্ডারী বলিয়া ডাকেন, অনুতাপের সময় পাপের পরিত্রাতা বলিয়া ডাকেন, সম্পদের সময় সকল মঙ্গলের মূলাধার পিতামাতা এবং সুহৃৎ বলিয়া ডাকেন, ইত্যাদি। কিন্তু তাহা বলিয়া এরূপ তোমার অভিপ্রায় নহে যে, পরমাত্মার সমগ্রভাবের প্রতি মনোনিবেশ করিলে তাঁহার বিশেষ বিশেষ গুণ সাধকের মনের উপরে মূলেই কোনো কার্য্য করে না। এরূপও তোমার অভিপ্রায় নহে যে, পরমাত্মার বিশেষ বিশেষ গুণের প্রতি লক্ষ্য নিবিষ্ট করিলে, পরমাত্মার সমগ্র ভাব সাধকের মনের উপরে মূলেই কোনো কার্য্য করে না। তোমার মনোগত অভিপ্রায়টি সংক্ষেপে অথচ সমগ্রভাবে ভাষায় ব্যক্ত করিতে হইলে এইরূপ দাঁড়ায় যে ধ্যানকালে সাধকের জ্ঞানচক্ষে পরমাত্মার সগুণভাব নির্গুণভাবের অন্তর্ভূত হইয়া যায়; আবার, আরাধনাকালে সাধকের ভক্তিচক্ষে পরমাত্মার নির্গুণভাব সগুণভাবের অন্তর্ভূত হইয়া যায়। তা বই, সাধনকালেই বা কি, আর, ভজনকালেই বা কি—দুই কালের কোনো কালেই পরমাত্মার সগুণ এবং নির্গুণ দুই ভাব (অর্থাৎ "পরমাত্মা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত" এই কথাটিতে যেরূপ নির্গুণভাবের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইরূপ নির্গুণভাব, এবং "তিনি

সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা" এই কথাটিতে যেরূপ সগুণভাবের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় সেইরূপ সগুণভাব—এই দুইরূপ ভাব) সাধকের মনের উপরে ন্যূনাধিক পরিমাণে কার্য্য করিতে ক্ষান্ত হয় না। এই না তোমার কথা?

সব তো বুঝিলাম! তবুও আমার মনের ধন্দ মিটিতেছে না। একটি কথা এখনো আমার বুঝিতে বাকি আছে। সে কথা এই যে, ধ্যান-কালে পরমাত্মার নির্গুণ সমগ্রভাব যখন সাধকের মনের উপরে বেশীমাত্রা কার্য্য করে, সাধকের সেই সময়ের মনের অবস্থাকে সমাধির অবস্থা বা তুরীয় অবস্থা বলিলেও বলা যাইতে পারে—এটা যেন বুঝিলাম; কিন্তু মুক্ত অবস্থা তো ওরূপ একটা সাময়িক অবস্থা নহে। সকল শাস্ত্রেই বলে যে, মুক্ত পুরুষ সব সময়েই মুক্ত। মুক্ত অবস্থা এবং তুরীয় অবস্থার মধ্যে ভেদাভেদ কিরূপ—এই প্রশ্নটির একটা পরিষ্কার মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত আমার জিজ্ঞাসা নিবৃত্তি মানিতেছে না।

কিন্তু তাও বলি—তোমার কামধেনুটির দুগ্ধ দোহন করিয়াই তুমি ক্ষান্ত হও নাই। তাহার দুগ্ধ হইতে ঘৃত মন্থন করিয়া তুলিয়া এতক্ষণ ধরিয়া যাহা তুমি আমাকে ভোজন করাইলে, তাহা পরিপাক করিতে আমার সময় লাগিবে নিতান্ত কম না—অন্যূন দুই সপ্তাহ তাহাতে আর ভুল নাই!" অতএব আজ "শুভমস্তু" বলিয়া বিদায় হই; আগামী অধিবেশনে আমার ঐ জিজ্ঞাস্য বিষয়টির সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে বিধিমতপ্রকারে বোঝাপড়া হইবে।

পঞ্চদশ অধিবেশন।

ব্যাখ্যান।

প্রশ্ন। বিগত বারের অধিবেশনে তোমার কথাবার্ত্তার ভাবে আমি এইরূপ বুঝিয়াছিলাম যে, সাধক যখন আর আর সমস্ত বিষয় হইতে মনকে উঠাইয়া লইয়া তাহাকে মোট জ্ঞানের মোট সত্যে নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় স্থিরীভূত করেন তাঁহার সেই সময়কার সেইরূপ অবস্থাই সমাধি নামে সংজ্ঞিত হয়। এখন আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, সাধকের সেইরূপ সমাধিমগ্ন অবস্থার নামই কি মুক্ত অবস্থা? অথবা মুক্ত অবস্থা তাহা ভিন্ন আর-কোনো কিছু?

উত্তর। তোমার প্রশ্নটি অতিশয় দুরূহ। তাহার মীমাংসার পথে যাত্রারম্ভ করিবার পূর্ব্বে পথের যত কিছু প্রয়োজনীয় বস্তু তাহার মধ্য হইতে তাহার একটি খুদকুঁড়াও বাদ না দিয়া সমস্তই পোঁটলাবন্ধী করিয়া সঙ্গে গুছাইয়া না লইলে, পথের মাঝখানে কখন্ কি দুর্বিপাক ঘটে—সেই ভাবনাতেই পথযাত্রীর আহারনিদ্রা বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। গতবারে তাই আমি প্রশ্নোত্তরচ্ছলে যতগুলি কথা ধারাবাহিক পরম্পরাক্রমে বলিয়াছিলাম, তাহার আদ্যোপান্ত সমস্তটা এইখানে আর একবার ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়া তাহার মধ্য হইতে প্রয়োজনীয় পাথেয় সম্বলের মোট বাঁধিয়া লইয়া গন্তব্য পথে যাত্রারম্ভ করিব মনে করিয়াছি; তাহাতেই এক্ষণে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

মুখ্য প্রশ্নটি হ'চ্চে—সমাধি অবস্থা এবং মুক্ত অবস্থার মধ্যে প্রভেদ কি রূপ? ইহার মীমাংসাসূত্রে প্রথমে বলিয়াছিলাম—মুক্তি কি? না বন্ধন-মুক্তি। তাহার পরে প্রশ্ন উঠিল—কিসের বন্ধন? ইহার

উত্তর দেওয়া হইল—"ত্রিগুণের বন্ধন"। ইহাতে ফলে দাঁড়াইল—মুক্ত অবস্থা একপ্রকার গুণাতীত অবস্থা ; আর তাহা হইতে সিদ্ধান্ত-স্থির করা হইল এইরূপ যে, সমাধিকালে যখন সাধকের মন নির্গুণ ব্রহ্মে তন্ময়ীভূত হইয়া যায়, তখন সাধক ত্রিগুণ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন। তাহার পরে প্রশ্ন উঠিল এই যে, এটা যখন স্পষ্ট দেখিতেছি যে, গুণের সহিত যাহা একেবারেই সম্পর্করহিত—এরূপ বস্তু—জ্ঞানের বা ভাবের বা ধ্যানের বিষয় হইতে পারে না, তখন কাজেই বলিতে হয় যে, নির্গুণ বস্তুর ধ্যান একপ্রকার সোণার পাথর-বাটি। পাথর-বাটি যেমন সোণার বাটি হইতে পারে না, তেমনি যাহা মূলেই ধ্যানের বিষয় নহে তাহার ধ্যান হইতে পারে না। ইহার উত্তরে এইরূপ বলা হইয়াছিল যে, নির্গুণ বলিতে কেহ যদি এরূপ বোঝেন যে, তাহা গুণের সহিত একেবারেই সম্পর্করহিত, তবে তাঁহার কাছে নির্গুণ বস্তুর ধ্যান সোণার পাথর-বাটি হইবারই কথা। আমি কিন্তু সগুণ নির্গুণ বলিতে আর একরূপ বুঝি—এইরূপ বুঝি যে,—

(১) সগুণ = প্রাদুর্ভূত-গুণ।

(২) নির্গুণ = অন্তর্লীন-গুণ।

সগুণ-নির্গুণের এইরূপ, সংজ্ঞা-নির্ব্বাচন করিয়া তাহার পরে, অন্তর্লীন ভাব—বলে কাহাকে, তাহার গোটাকত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলাম। তাহার মধ্যেকার তৃতীয় দৃষ্টান্তটি এইরূপ :—

জ্যামিতি শাস্ত্রে লেখে এই যে, চক্র বলিয়া যে একটি গোলাকার নিষ্কোণ জ্যামিতিক বস্তু আছে, তাহার ভিতরে নানা কোণ-বিশিষ্ট বহু কোণ-ফলক সন্তুক্ত করা যাইতে পারে (অর্থাৎ inscribe করা যাইতে পারে)—যেমন চতুষ্কোণ, পঞ্চকোণ, ষট্‌কোণ, সপ্তকোণ ইত্যাদি। এইরূপে যদি একটা চক্রের মধ্যে সহস্র কোণ-বিশিষ্ট

বহু কোণ-ফলক সন্তুক্ত করা যায়, তাহা হইলে অণুবীক্ষণের বিনা-সাহায্যে শুধু-চক্ষে দেখিলে কে বলিবে যে তাহা (অর্থাৎ বহুকোণ ফলকটা) চক্র নহে। কিন্তু চক্রের অন্তর্ভুক্ত বহুকোণ ফলকের কোণাবলি যদি প্রকৃত প্রস্তাবে সংখ্যাতীত হয়, তাহা হইলে বহুকোণ ফলকটি আর বহুকোণ থাকে না—তাহা হইলে তাহা তাহার আধার চক্রের সহিত একেবারেই একীভূত হইয়া যায়। চারিকোণ-বিশিষ্ট বহুকোণকে যেমন চতুষ্কোণ বলা যায়, পঞ্চকোণ-বিশিষ্ট বহুকোণকে যেমন পঞ্চকোণ বলা যায়, তেমনি, সংখ্যাতীত কোণবিশিষ্ট বহু-কোণকে অতিকোণ বলিয়া সংজ্ঞিত করা হউক। এমতে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, নিষ্কোণ চক্র নিজেও যা, আর নিষ্কোণ চক্রের অন্ত-র্ভুক্ত অতিকোণ ফলকও তা, দুয়ের মধ্যে মূলেই কোন প্রভেদ নাই। তবে আর কেমন করিয়া বলিব যে, চক্র নিষ্কোণ বলিয়া তাহা কোণের সহিত একেবারেই সম্পর্করহিত? উল্টা আরো বলা উচিত যে, চক্র নিষ্কোণ বলিয়াই তাহা আপনার পরিধির অন্তর্ভূত সংখ্যাতীত কোণাবলীর লয়স্থান বা সমাধিস্থান। তবেই হইতেছে যে চক্রকে নিষ্কোণ বলিলেও এরূপ বোঝায় না যে, চক্র কোন অংশে কোণের সহিত সম্পর্করহিত, আর আত্মাকে নির্গুণ বলিলেও এরূপ বুঝায় না যে, আত্মা কোনো অংশে গুণের সহিত সম্পর্করহিত। চক্রকে নিষ্কোণ বলিলে বুঝায় শুধু এই যে, চক্র আপনার অন্তর্ভুক্ত অসংখ্য কোণের লয়স্থান; —আত্মাকে নির্গুণ বলিলে বুঝায় শুধু এই যে, আত্মা আপ-নার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত গুণের লয়স্থান।

এই দৃষ্টান্ত এবং আর তিনটি দৃষ্টান্ত যাহা গতবারে দেখানো হইয়াছিল, সব-কটা'রই সঙ্গে নির্গুণভাবের বড্ড যেন দূর সম্পর্ক, আর সেই জন্য তাহা শ্রোতার মনঃপূত না হইতে পারে। এক্ষণে

তাই নির্গুণ-ভাবের খুব নিকট সম্পর্কীয় আর দুইটি ভাবের দৃষ্টান্ত দেখানো শ্রেয় বোধ করিতেছি। সে দুইটি ভাব হ'চ্চে নিঃস্বার্থ ভাব এবং নিস্কাম ভাব।

স্বর্ণ মুদ্রার সারাংশ যেমন সোণা, আর অসারাংশ তাঁবা; তেমনি শাস্ত্রবচনের সারাংশ তাহার ভাবার্থ, অসারাংশ শব্দার্থ। শাস্ত্রীয় ভাষার পোদ্দার দিগের নিকট শাস্ত্রবচনের ব্যাঙ্কনোট ভাঙ্গাইতে গেলে অনেক সময়ে ঠকিতে হয়। তাঁহাদের হস্ত হইতে ব্যাঙ্কনোটের বিনিময়ে স্বর্ণমুদ্রা যাহা গণিয়া পাওয়া যায়, তাহা কষ্টিপাথরে ঘষিয়া দেখিলে অনেক সময় এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাকে স্বর্ণ-মুদ্রা বলিলে স্বর্ণের অপমান করা হয়, কেননা তাহা সোনালী রঙের তাম্রমুদ্রা বই আর কিছুই নহে। তার সাক্ষী:—এই যে দুইটি শাস্ত্রীয় ভাষার ব্যাঙ্ক নোট—নির্গুণ এবং নিঃস্বার্থ শব্দ, অভিধান পোদ্দারের নিকটে তাহা ভাঙ্গাইতে গেলে তাহার বিনিময়ে নগদ মুদ্রা শুধু পাওয়া যায় এই যে, গুণের সহিত যাহার মূলেই কোন সম্পর্ক নাই সেই রূপ একটা অজ্ঞাত অপরিচিত বস্তুর নাম নির্গুণ আত্মা; আর যাহাতে কাহারো কোন স্বার্থ নাই, সেইরূপ অর্থশূন্য কার্য্যের নাম নিঃস্বার্থ কার্য্য। নির্গুণ এবং নিঃস্বার্থ শব্দের অর্থ যদি ওই বই আর কিছুই না হয়, তবে তাহা অভিধানের অনুমোদিত ব্যাকরণ শুদ্ধ নিখুঁত শব্দার্থ হইলেও ফলে-দাঁড়ায় এই যে, [০] এই শূন্যাঙ্কটি নির্গুণ আত্মার সেরা নমুনা; আর পানাসক্ত ব্যক্তির যেরূপ আত্ম-হিতের প্রতি লক্ষ্য-শূন্যতা, সেইরূপ স্বার্থান্ধতা নিঃস্বার্থ ভাবের সেরা নমুনা। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, যে-আপনি আপনার মধ্যে রহিয়াছে—সেই আপনি পরের মধ্যেও রহিয়াছে; দুই আপনিই আপনি; আর সেইজন্য আপনার ইষ্ট-সাধন করিলেও

পরের ইষ্ট সাধন করা হয়, পরের ইষ্টসাধন করিলেও আপনার ইষ্ট-সাধন করা হয়। তার সাক্ষীঃ—গুরু যদি আগে নিজে বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া নিজের ইষ্ট সাধন না করেন, তাহা হইলে পরে তিনি শিষ্যের জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া শিষ্যের ইষ্টসাধন করিতে পারেন না। আবার গুরু যদি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত শিষ্যের জ্ঞানচক্ষু ফুটাইতে বিধিমতে প্রয়াস পান, তবে সেই সঙ্গে তাঁহার আপনার জ্ঞানচক্ষু পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ-মাত্রা ফুটিয়া ওঠে। আমি তাই বলি যে, "আপনার ইষ্ট কিছুই নহে" এরূপ ভাবের নামও নিঃস্বার্থ ভাব নহে, আর "আপনার ইষ্টই সর্ব্বস্ব" এরূপ ভাবের নামও নিঃস্বার্থ ভাব নহে। তবে কি? না "পরের ইষ্টও আপনার ইষ্ট" আর "আপনার ইষ্টও পরের ইষ্ট" —আত্মপরের মধ্যে এইরূপ সমদর্শিতার নামই নিঃস্বার্থ ভাব। ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, দুর্জ্জনেরা যেমন পরের ইষ্টকে আপনার অনিষ্ট মনে করে, আর সেইজন্য জো পাইলে পরের অনিষ্ট সাধন করিয়া "মস্ত একটা ভাল কাজ করিলাম" বলিয়া মনকে প্রবোধ দ্যায়; সাধুজনেরা তেমনি পরের ইষ্টকে আপনারই ইষ্ট মনে করেন, আর সেইজন্য সুবিধা পাইলে পরের হিতসাধন করিয়া আপ-নাকে কৃতকৃতার্থ মনে করেন। প্রকৃত কথা যাহা তাহা এইঃ— আপনার ইষ্টকে বলে—স্বার্থ; পরের ইষ্টকে বলে—পরার্থ; আর যাহার গুণে স্বার্থ এবং পরার্থ দুইই প্রেমবন্ধনে বাঁধা পড়িয়া একীভূত হইয়া যায়, তাহাকে বলে—পরমার্থ। বিষয়-বুদ্ধি স্বার্থের রাজ্য; প্রকৃতি পরার্থের রাজ্য; তত্ত্বজ্ঞান পরমার্থের রাজ্য! পরমার্থ-রাজ্যে সবারই স্বার্থ সবারই সাধারণ সম্পত্তি, তা'বই—কোন স্বার্থই কাহারো অ্যাকলার স্বার্থ নহে; এইজন্য পারমার্থিক ভাবেরই আর এক নাম হইয়াছে "নিঃস্বার্থ ভাব"। এই সঙ্গে—নিঃস্বার্থ কার্য্যের

সহিত নিষ্কাম প্রেমের কিরূপ সম্বন্ধ সেটাও মনোযোগের সহিত ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। এ কথা আমি অনেকের মুখে শুনিয়াছি যে, দেবদত্তের নিকট হইতে তুমি কোনো উপকারের প্রত্যাশা কর না অথচ তুমি তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসো; আমার তাই মনোমধ্যে এইরূপ ধারণা যে, দেবদত্তের প্রতি তোমার এই যে প্রীতি—এ প্রীতি অহেতুকী প্রীতি, আর সেই জন্য তাহাকে আমি বলি নিষ্কাম প্রেম। এখন দেখিতে হইবে এই যে, নিষ্কাম প্রেমই নিঃস্বার্থ কার্য্যের মূল উৎস। পতিপ্রাণা দময়ন্তীকে, স্বদেশ-প্রাণ রামমোহন রায়কে, ঈশ্বরপ্রাণ ঈসা-মহাপ্রভুকে, নিঃস্বার্থ কার্য্য শিক্ষা দিবার গুরু যদি কেহ থাকেন, তবে সে গুরু, আর কেহ না,—**নিষ্কাম-প্রেম।** উপমাচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে, দম্পতি প্রেম বেগবতী নদী; স্বদেশ-প্রেম বিস্তীর্ণ সরোবর; ঈশ্বর-প্রেম অপার পারাবার;—কিন্তু যাহাই হো'ক না কেন—নিষ্কাম প্রেম নদীই হো'ক, সরোবরই হো'ক, আর, সাগরই হো'ক—তাহার একটি সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহা অন্তঃকরণে প্রবল হইলে "আত্ম" এবং "পর" এই দুই কুল ভাসাইয়া দুইকে অ্যাক করিয়া ফ্যালে। নিষ্কাম প্রেমের নিকটে আপনি এবং পর দুইই আপনি, আর, সেইজন্য উভয়ে উভয়ের দর্পণ-স্বরূপ। ঈসা মহাপ্রভু তাঁহার শিষ্যবর্গকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন যে "Love thy neighbour as thyself" "আপনাকে তুমি যেমনতর ভালবাসো, তোমার প্রতিবেশীকে তেমনিতর ভালবাসিবে।" এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, লোকে আপনাকে, কেমনতর ভালবাসে? তুমি তোমার আপনার মধ্যে বিশেষ একপ্রকার ভাল গুণ দেখিতে পাও বলিয়া তাহারি জন্য কি আপনাকে ভালবাসো? আমার তো তাহা বোধ হয় না। আমি বেস্ জানি যে, তোমার

মধ্যে ভালবাসিবার উপযুক্ত কোনোপ্রকার গুণ আছে কি নাই—সে কথা তুমি একটিবার জিজ্ঞাসাও কর না—আপনাকেও তাহা জিজ্ঞাসা কর না—দোসরা কোনো ব্যক্তিকেও তাহা জিজ্ঞাসা কর না, অথচ তুমি আপনাকে ভালবাসিতে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিরত হও না। তা ছাড়া, গুণবান্ ব্যক্তি আপনাকে আপনি যেমনতর ভালবাসে—গুণহীন ব্যক্তিও আপনাকে আপনি ঠিক তেমনিতর ভালবাসে। এটা বুঝিতে পারা কিছুই কঠিন নহে যে, পৃথিবীশুদ্ধ সকল লোকেই আপনার বিশেষ কোন গুণের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া জন্মাবধি আপনাকে ভালবাসে। তবে—মনুষ্যের ভিতরে তাহার ভাল মন্দ মাঝারি সমস্ত গুণের যে একটি লয়স্থান বা সমাধিস্থান আছে, তাহাকে "গুণ" বলিতে যদি কাহারো কোনো আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে বলিলেও বলা যাইতে পারে যে সেই-গুণটির প্রতি লক্ষ্য করিয়া লোকে আপনাকে আপনি ভালবাসে। কিন্তু সে গুণের নাম কি—যদি আমাকে জিজ্ঞাসা কর, তবে আমি নিরুত্তর। ইতিহাস-শাস্ত্রে তুমি একজন অদ্বিতীয় এম্ এ—এ কথা জগতে রাষ্ট্র; সুতরাং নেপোলিয়ন-বোনাপার্ট যে, কত গ্রন্থকারের হস্তে কত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন তাহা তোমার জানিতে বাকি নাই। কেহ বলেন—নেপোলিয়ন বড্ড পাষাণ-হৃদয় ছিলেন; কেহ বলেন—নেপোলিয়ন যেমন জনসাধারণের ব্যথার-ব্যথী ছিলেন এমন আর দেখা যায় না; কেহ বলেন—নেপোলিয়ন বড্ড যথেচ্ছাচারী ছিলেন; কেহ বলেন—নেপোলিয়নের মতো ন্যায়বান্ রাজ্যেশ্বর পৃথিবীতে অদ্যাপি জন্মে নাই। নেপোলিয়নের এই সকল ভাল মন্দ সমস্ত গুণ একসঙ্গে তাল পাকাইয়া সেই গুণসমষ্টির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তোমাকে যদি আমি জিজ্ঞাসা করি যে, নেপোলিয়নের এই মোট গুণটির নাম কি?

তবে তুমি তাহার কি উত্তর দিবে? সে গুণটিকে তুমি নিষ্ঠুরতাও বলিতে পার না, দয়াশীলতাও বলিতে পার না; যথেচ্ছাচারিতাও বলিতে পার না, ন্যায়পরায়ণতাও বলিতে পার না। কিন্তু তবুও যখন দেখিতেছি যে, তোমার মত ঐতিহাসিক পণ্ডিতেরা "নাম নাম" করিয়া পাগল, তখন নামের প্রতি নিতান্তই বিমুখ হইয়া চুপ করিয়া থাকা আমার পক্ষে ভাল দেখায় না; অতএব নাম-রসের রসিক-দিগের মনস্তুটির জন্য নেপোলিয়নের ঐ মোট গুণটির নাম আমি দিলাম "নেপোলিয়নত্ব।" নাম দিয়া ফেলিয়া এখন পস্তাইতেছি; দেখিতেছি যে, নেপোলিয়নত্ব গুণ—ন্যায়পরতা পরহিত-পরায়ণতা প্রভৃতির ন্যায় বিশেষ কোনো প্রকার ভাল গুণও নহে, আর, নিষ্ঠুরতা স্বেচ্ছাচারিতা প্রভৃতির ন্যায় বিশেষ কোন প্রকার মন্দ গুণও নহে; কাজেই বলিতে হয় যে, নেপোলিয়নত্ব গুণ গুণই নহে—তাহা নেপোলিয়ন স্বয়ং! এখন দেখিতে হইবে এই যে, নেপোলিয়নত্ব গুণ যে হিসাবে গুণই নহে, সে হিসাবে নেপোলিয়নত্ব গুণের আধার-বস্তু (অর্থাৎ আদত নেপোলিয়ন বা অখণ্ড নেপোলিয়ন) নির্গুণ; আবার, যে হিসাবে নেপোলিয়নত্বের ভিন্ন ভিন্ন অংশাবতারের ভিন্ন ভিন্ন গুণ ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকার কর্তৃক নেপোলিয়নের উপরে অধ্যারোপিত হইয়া থাকে, সে হিসাবে নেপোলিয়ন সগুণ। এক সময়ে যখন নেপোলিয়নের রুষীয় প্রতিযোদ্ধারা রণে ভঙ্গ দিয়া বরফে ঢাকা নদী নালার উপর দিয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিতেছিল, সেই সময়ে (ইতি-হাসে লেখে তো জানি—কিন্তু সত্য কি মিথ্যা তাহা জানি না) নেপোলিয়ন স্বপক্ষের জয়োৎফুল্ল সৈন্যবর্গকে হাঁকিয়া বলিলেন—পলায়ন-পরায়ণ রুষীয় সেনাগণের একমাত্র ভরসা ঐ যে বরফের কঠিন পৃষ্ঠ উহার উপরে বিধিমত-প্রকারে গোলা চালাইতে থাক'। এ

সময়ের নেপোলিয়ন নেপোলিয়নত্বের রুদ্র অবতার। আবার, যে সময়ে ফরাসী রাজ্য ভীষণ বিপ্লবানলে ছারখার হইয়া যাইতেছিল সেই সময়ে সেই নেপোলিয়নই সেই দারুণ দুর্দ্দশাপন্ন বিস্তীর্ণ রাজ্যের অর্দ্ধ মৃত শরীরে নূতন জীবন সঞ্চার করিয়া অনুপম শ্রী সমৃদ্ধিতে তাহার মুখ উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিলেন। এ সময়ের নেপোলিয়ন নেপোলিয়নত্বের বিষ্ণু অবতার। আবার, যে সময়ে বিপুল ফরাসীস্ রাজ্যে যথেচ্ছাচারিতা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিল—সে সময়ে সেই নেপোলিয়নই সভ্যজগতের আদর্শভূত রাজ্য শাসনের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিধান ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এ সময়ের নেপোলিয়ন নেপোলিয়নত্বের বিধি-অবতার বা ব্রহ্মাবতার। নেপোলিয়নের এই যে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্র অবতার যাহার কীর্ত্তিকাহিনী শত শত গ্রন্থের শত শত পত্র পৃষ্ঠা ছাপাইয়া উঠিয়া সারা পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে—এই যে বাহিরের নেপোলিয়ন--এই নেপোলিয়নই সগুণ নেপোলিয়ন। পরন্তু নেপোলিয়নত্বের ঐ তিনটি অবতার ছাড়া আর-একটি অবতার যিনি আছেন—যাঁহার একটি কথাও ইতিহাসে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—সে অবতারটিকে বলা যাইতে পারে—নেপোলিয়নত্বের চতুর্থ অবতার বা তুরীয় অবতার বা পূর্ণাবতার; সে অবতারটির ভিতরে ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বর একীভূত হইয়া ওঙ্কারে পর্য্যবসিত। নেপোলিয়নত্বের এই যে তুরীয় অবতার ইনি নেপোলিয়নের জীবনের গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত যাহা আছেন তাহাই আছেন। এই যে ভিতরের নেপোলিয়ন—ইনিই নির্গুণ নেপোলিয়ন। অতঃপর দ্রষ্টব্য এই যে নেপোলিয়নের এই-যেমন নেপোলিয়নত্ব, তেমনি, তোমারই বা কি, আমারই বা কি, আর, অপর কোন ব্যক্তিরই বা কি—প্রতিজনেরই একটি আপনিত্ব আছে; সেই

আপনিত্বটি তাহার ভাল মন্দ সমস্ত গুণেরই লয়স্থান, অথচ, তাহা নাম-করিতে-পারিবার-মতো বিশেষ কোনো গুণ নহে; তাহা না হো'ক্—তাহা বিশেষ কোন গুণ না হো'ক্—কিন্তু তাহা যে পরম ভালবাসিবার বস্তু সে বিষয়ে আর সন্দেহ-মাত্র নাই; তা'র সাক্ষী—তুমি তোমার সেই আপনিত্বটির জন্য আপনাকে যেমন ভালবাসো এমন আর কিছুরই জন্য নহে। ঈসা-মহাপ্রভু স্বচ্ছন্দে বলিতে পারিতেন—"যাহার মধ্যে ভালবাসিবার উপযুক্ত ভাল গুণ দেখিতে পাইবে তাহাকে ভালবাসিবে।" কিন্তু তাহা তিনি বলেন নাই। তিনি কেবল বলিয়াছেন—"তোমার প্রতিবেশীকে তুমি আপনার মতো করিয়া ভালবাসিবে।" কাজেই, তাঁহার ঐ উপদেশ-বাক্যটির অভিপ্রায় এ ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না যে, তুমি যেমন শুদ্ধ কেবল তোমার আপনিত্বের জন্য আপনাকে ভালবাসো, তোমার প্রতিবেশীকেও তেমনি শুদ্ধ কেবল তাহার আপনিত্বের জন্য ভালবাসিবে; কেন না আপনিত্ব সকলেতেই সমান। বলা বাহুল্য যে, সবা'রই আপনার প্রতি আপনার যে একপ্রকার অহেতুকী প্রীতি স্বভাবতই আছে—শিষ্যমণ্ডলীর অন্তঃকরণে পরস্পরের প্রতি সেই প্রকার অহেতুকী প্রীতি বা নিষ্কাম প্রেম জাগাইয়া তোলাই ঈসা-মহাপ্রভুর ঐ উপদেশ-বাক্যটির মর্ম্মগত অভিপ্রায়। এ তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে যে, আত্মার আপনিত্বের প্রতি লক্ষ্য নিবিষ্ট করাও যা, আর, আত্মার কোনো বিশেষ গুণের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া মোট আত্মার প্রতি লক্ষ্য নিবিষ্ট করাও তা—একই কথা।

শাস্ত্রে যাহাকে বলে "নির্গুণ-আত্মা" তাহা যে সোণার পাথরবাটির ন্যায় একটা ফাঁকা আওয়াজ নহে—পরন্তু তাহা যে সকলেরই পরম প্রিয়বস্তু—তাহাই আমি আজ এতক্ষণ ধরিয়া সাধ্যানুসারে বিবৃত

করিয়া দেখাইলাম। জিজ্ঞাস্য প্রশ্নটির মীমাংসার পথে যাত্রারম্ভ করিবার পূর্ব্বে প্রয়োজনীয় পাথেয় সম্বলের মোট বাঁধিয়া লইলাম। আগামী অধিবেশনে গন্তব্য পথে বিধিমতে যাত্রারম্ভ করা যাইবে।

পঞ্চদশ অধিবেশন।

ব্যাখ্যান।

প্রশ্ন। তোমার পাথেয় দ্রব্যাদির মোট বাধা এখন তো হই-য়াছে? তবে আর বিলম্ব কিসের? যাত্রারম্ভ করা হো'ক্। জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তোমাকে আমি—সমাধিমগ্ন অবস্থা এবং মুক্ত অবস্থার মধ্যে প্রভেদ কিরূপ? এ প্রশ্নের একটা পরিষ্কার মীমাংসা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না হইতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি আর-আর যতই যাহা বল না কেন তাহাতে আমার মন প্রবোধ মানিতে পারে না।

উত্তর। যাত্রারম্ভের এই মুখ্য সময়টিতে আমার যদি হিতবাক্য শোনো, তবে আমাদের-দেশীয় তত্ত্বজ্ঞান-শাস্ত্রের নিভৃত গুহামন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিবার যে একটি অমোঘ মন্ত্র-বচন আছে, এই শুভ মুহূর্ত্তে সেইটি আমি তোমাকে স্মরণ করিতে বলি। সে মন্ত্র-বচনটি যে কি তাহা কাহারো অবিদিত নাই। শাস্ত্রীয় ভাষায় তাহার নাম প্রণব। পাতঞ্জল দর্শনের ১ম পাদের ২৭ সূত্রে লেখে

"তস্য বাচকঃ প্রণবঃ"

"তাঁহার (কিনা ঈশ্বরের) বাচক (কিনা পরিচয়-জ্ঞাপক সংজ্ঞা) প্রণব (কিনা ওঙ্কার)।" মা অম্বা mamma প্রভৃতি সানুনাসিক ওষ্ঠ্য বর্ণাত্মক দ্বৈমাত্রিক বা ত্রৈমাত্রিক শব্দ কচি বালকের মুখে সহজে বাহির হয় বলিয়া ঐ ধাঁচা'র শব্দগুলা যেমন স্বভাবতই মাতৃবাচক, তেমনি পরমাত্মার ধ্যানকালে ওঙ্কার ধ্বনি ধ্যাতার মুখে সহজে বাহির হয় বলিয়া ওঁ-শব্দ স্বভাবতই ঈশ্বর-বাচক। জগৎ-সঙ্গীতের এই যে তিন শ্রেণীর গীতস্বর

(১)	(২)	(৩)
বিবাদী	বাদী	সংবাদী
—	—	—
ভাঙন	গড়ন	ব্যবস্থাবন্ধন
বিযোগ	উদ্যোগ	সংযোগ
প্রলয়	সৃষ্টি	স্থিতি

এই তিন শ্রেণীর গীতস্বর যেমন ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে মহত্তম আকাশ পর্য্যন্ত সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অনুনাদিত করিয়া একতানে ধ্বনিত হইতেছে, তেমনি ওঙ্কারের তিনটি অক্ষর—অ উ ম—উচ্চারকের কণ্ঠকুহর হইতে ওষ্ঠাগ্র পর্য্যন্ত স্বর-নির্গমনের সমস্ত পথ অধিকার করিয়া একতানে ধ্বনিত হয়। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, ওঙ্কার-মন্ত্রের উচ্চারণ-কালে শ্রদ্ধাবান্ সাধকের মনে দুইসূত্রে পরমাত্মার দুইরূপ ভাব উদ্দীপিত হয়;—সৃষ্টি-প্রবণ রজোগুণ, স্থিতিপ্রবণ সত্ত্বগুণ, এবং ভঙ্গপ্রবণ তমোগুণ কারণে অন্তর্লীন রহিয়াছে—এই সূত্রে পরমাত্মার স্বরূপগত নির্গুণভাব উদ্দীপিত হয়; আর, কার্য্যে অভিব্যক্ত হইতেছে, অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া ভিন্ন ভিন্ন গুণ ভিন্ন ভিন্ন দেশ-কালপাত্রে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে প্রাদুর্ভূত হইতেছে—এই সূত্রে পরমাত্মার সগুণ ভাব উদ্দীপিত হয়। ওঙ্কারমন্ত্রের উচ্চারণ তাই সাধকের পক্ষে ধ্যান-কালেও যেমন, আর, সাংসারিক শুভানুষ্ঠানের পথে যাত্রারম্ভ-কালেও তেমনি, উভয়-কালেই পরম ইষ্টফলপ্রদ। অতএব শ্রদ্ধাভক্তির সহিত ওঙ্কার উচ্চারণ করিয়া গন্তব্য পথে যাত্রারম্ভ করা যা'ক্।

ধ্যানকালে যখন সাধক সমস্ত জগৎসংসার হইতে মন'কে উঠাইয়া লইয়া পরমাত্মার স্বরূপগত নির্গুণভাবের প্রতি লক্ষ্য স্থিরীভূত

করেন, তাঁহার তখনকার সেইরূপ সমাহিত অবস্থা যোগাদি-শাস্ত্রে সমাধিনামে উক্ত হইয়া থাকে। তার সাক্ষী:—পাতঞ্জল দর্শনের ১ম পাদের ৩য় ৪র্থ সূত্রে লেখে

"তদা দ্রষ্টুঃস্বরূপে অবস্থানং।
বৃত্তি-সারূপ্যমিতরত্র।"

"তখন (কিনা সমাধি-কালে) দ্রষ্টা-পুরুষের স্বরূপে অবস্থান হয়। অন্য সময়ে দ্রষ্টা-পুরুষ বিশেষ বিশেষ মনোবৃত্তির সহিত জড়িত হইয়া সেই-সেই বৃত্তির রূপ ধারণ করে।"

মনোবৃত্তি প্রধানতঃ কয়প্রকার, তাহাও ঐ পাদের ৬ষ্ঠ সূত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে এইরূপ:—

মনোবৃত্তি প্রধানতঃ পাঁচ প্রকার; যথা,—

"প্রমাণ বিপর্য্যয় বিকল্প নিদ্রা স্মৃতয়ঃ।"

"প্রমাণ (কিনা সত্যজ্ঞান), বিপর্য্যয় (কিনা মিথ্যাজ্ঞান), বিকল্প (কিনা—যেমন "সোণার পাথরবাটী" এইরূপ শব্দমূলক অর্থশূন্য জ্ঞান), নিদ্রা, এবং স্মৃতি, এই পাঁচ প্রকার।"

তাৎপর্য্য এই যে, সমাধি-কালে আত্মার স্বরূপগত নির্গুণ ভাব দ্রষ্টা পুরুষের সমস্ত মনোবৃত্তি গ্রাস করিয়া ফ্যালে; আর-আর সময়ে, বিশেষ বিশেষ অবস্থাগতিকে দ্রষ্টা পুরুষের মনে বিশেষ বিশেষ গুণের প্রাদুর্ভাব হয়;—কখনও বা সত্য-জ্ঞানের প্রাদুর্ভাব হয়, কখনও বা মিথ্যা-জ্ঞানের প্রাদুর্ভাব হয়, কখনও বা শব্দমূলক অর্থশূন্য জ্ঞানের প্রাদুর্ভাব হয়, কখনও বা নিদ্রার প্রাদুর্ভাব হয়, কখনও বা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মাদি বিষয়ক স্মৃতির প্রাদুর্ভাব হয়।

এখন আমি তোমার প্রশ্নের উত্তরে বলিতে চাই এই যে, দ্রষ্টা-পুরুষের এই যে দুই সময়ের দুইরূপ-অবস্থা—(১) সমাধিকালের স্বরূপনিষ্ঠ

অবস্থা এবং (২) আর-আর সময়ের বৃত্তিনিষ্ঠ অবস্থা, এই দুই কালের দুইরূপ অবস্থা ছাড়া—দ্রষ্টা পুরুষের সর্ব্বকালের আর একরূপ অবস্থা আছে যাহাকে বলা যাইতে পারে—আত্মার বন্ধনশূন্য স্বাভাবিক অবস্থা বা সিদ্ধাবস্থা ; আর, গীতাশাস্ত্রের মর্ম্মগতভাব এবং তাৎপর্য্যের প্রতি প্রণিধান করিয়া দেখিয়া আমি এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, তাহারই নাম মুক্ত অবস্থা ।

প্রশ্ন ॥ একটি কথা তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করি :—সংসার-ধর্ম্ম ভাল, না সন্ন্যাস-ধর্ম্ম ভাল ? আমি সোজাসুজি বুঝি এই যে, এরূপ যদি হয় যে, সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অপেক্ষা সংসার-ধর্ম্ম ভাল, তবে সব কাজ ছাড়িয়া সর্ব্বকালেই গার্হস্থ্য এবং সামাজিক কর্ত্তব্যসাধনে নিযুক্ত থাকা সাধকের পক্ষে শ্রেয় ; পক্ষান্তরে যদি এরূপ হয় যে, সংসার-ধর্ম্ম অপেক্ষা সন্ন্যাস-ধর্ম্ম ভাল, তবে সব ছাড়িয়া সর্ব্বকালেই যোগসাধনে নিযুক্ত থাকা সাধকের পক্ষে শ্রেয়। কিন্তু এটা যখন স্থির যে, সাংসারিক কর্ত্তব্যসাধনে অষ্টপ্রহর ব্যাপৃত থাকিলে ত্রিগুণের বন্ধন এড়ানো যাইতে পারে না, আর, এটাও যখন স্থির যে, যোগ সাধনে সিদ্ধি লাভ করিলে সাধক ত্রিগুণের বন্ধন হইতে অনায়াসে মুক্তিলাভ করেন, তখন এ কথা তোমাকে স্বীকার করিতেই হইবে যে সাংসারিক কর্ত্তব্য-সাধনের পথ বন্ধনের পথ বই মুক্তির পথ নহে—যোগ-সাধনের পথই মুক্তির পথ। আমি তাই বলি এই যে, যাঁহারা সংসারের সহিত একেবারেই সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া রাত্রি দিন সকাল বিকাল সন্ধ্যা সব সময়েই সমাধিতে নিমগ্ন থাকেন, তাঁহাদের মতো সিদ্ধপুরুষদিগের আটপহুরিয়া তুরীয় অবস্থাকেই মুক্ত অবস্থা বলা সঙ্গত।

উত্তর ॥ কেহ যদি তোমাকে বলেন—"কর্ম্ম ভাল—না বিশ্রাম ভাল ?" আর, তাহার পরে যদি বলেন—

"যদি এমন বোঝো যে, বিশ্রাম অপেক্ষা কর্ম্ম ভাল, তবে বিশ্রামে জলাঞ্জলি দিয়া রাত্রি দিন সকাল বিকাল সন্ধ্যা অনবরত পূর্ণ উদ্যমের সহিত কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকা তোমার খুব উচিত; পক্ষান্তরে যদি এমন বোঝো যে, কর্ম্ম অপেক্ষা বিশ্রাম ভাল, তবে সব কর্ম্ম ফেলিয়া রাত্রি দিন সকাল বিকাল সন্ধ্যা সর্ব্বক্ষণই হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকা, অথবা যাহা আরো ভাল—হাত পা ছড়াইয়া নিদ্রা দেওয়া তোমার অত্যন্ত উচিত;" তবে তাঁহার সে কথার তুমি কী উত্তর দিবে জানি না, কিন্তু আমাকে যদি তিনি জিজ্ঞাসা করেন তবে আমি তাঁহাকে বলিব এই যে, রাত্রিকালে সুনিদ্রা না হইলে দিবসের কার্য্যে কাহারো রীতিমত উদ্যমের স্ফূর্ত্তি হইতে পারে না; আবার দিবসের কার্য্যে যথাবিহিত যত্ন এবং পরিশ্রমের সহিত শক্তি খাটানো না হইলে রাত্রিকালে কাহারো সুনিদ্রা হইতে পারে না। কর্ম্মের সময় কর্ম্ম এবং বিশ্রামের সময় বিশ্রাম করিলে কর্ম্মও ভাল হয়—বিশ্রামও ভাল হয়; তাহার অন্যথাচরণ করিলে কর্ম্মও ভাল হয় না—বিশ্রামও ভাল হয় না। আবার, ক্রিয়াশক্তির পূর্ণোদ্যম এবং পূর্ণাবসানের মাঝের সোপানের প্রধান দুইটি ধাপ অর্দ্ধোদ্যম এবং অর্দ্ধাবসান;—সে দুইটি ধাপ না মাড়াইয়া পূর্ণোদ্যম হইতে পূর্ণাবসানে নামিতে পারা কাহারো পক্ষে সম্ভবসাধ্য নহে। কোন্ ধাপে কখন পদনিক্ষেপ করিতে হইবে—প্রকৃতি মাতার সৌর ঘটিকার শব্দহীন ঘণ্টারবে তাহার সময়ও ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে অতি সুন্দর প্রণালীতে। জীব-জগতে তাই একথা দেশময় রাষ্ট্র—যে ক্রিয়াশক্তির পূর্ণোদ্যমের মুখ্য সময়—পূর্ব্বাহ্ণ, অর্দ্ধোদ্যমের মুখ্য সময়—অপরাহ্ণ, অর্দ্ধাবসানের মুখ্য সময়—সায়াহ্ণ, পূর্ণাবসানের মুখ্য সময়—রাত্রিকাল। বলা বাহুল্য যে, সময়ে আহার, সময়ে ক্রীড়াকৌতুক, সময়ে নিদ্রা, সময়ে জাগরণ

পরস্পরের পথে পুষ্প নিক্ষেপ করে, আর, অসময়ে আহার, অসময়ে ক্রীড়াকৌতুক, অসময়ে কর্ম্মচেষ্টা, অসময়ে নিদ্রা, অসময়ে জাগরণ পরস্পরের পথে কণ্টক নিক্ষেপ করে। গীতাশাস্ত্রে লেখেও তাই; যথা :—

"যুক্তাহার বিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥"

ঠিক সময়ে ঠিকমতো আহার বিহার, ঠিক সময়ে ঠিকমতো কর্ম্ম চেষ্টা, ঠিক সময়ে ঠিকমতো সুপ্তি-জাগরণ, দুঃখনাশক যোগের অব্যর্থ সোপান।

তোমার প্রশ্নের উত্তরে তোমাকে আমি তাই তিনটি বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতে ইচ্ছা করি।

প্রথম স্মর্ত্তব্য।

যেমন রাত্রিকালে ভাল করিয়া নিদ্রা না হইলে দিবসের কার্য্যে কাহারো রীতিমতো উদ্যমের স্ফূর্ত্তি হইতে পারে না, তেমনি ধ্যান-কালে সাধকের মন মোটজ্ঞানের মোট সত্যে নিবাত নিষ্কম্প দীপ-শিখার ন্যায় স্থিরীভূত না হইলে কার্য্যকালে তাঁহার মন ভরপুর উদ্যমের সহিত মঙ্গলের পথে পরিচালিত হইতে পারে না।

দ্বিতীয় স্মর্ত্তব্য।

যেমন দিবসের কার্য্য যথোচিত প্রযত্ন এবং পরিশ্রমের সহিত সুনির্ব্বাহিত না হইলে, রাত্রিকালে কাহারো সুনিদ্রা হইতে পারে না, তেমনি কার্য্যকালে সাধকের মন রীতিমত উদ্যমের সহিত মঙ্গলের পথে পরিচালিত না হইলে, ধ্যানকালে তাঁহার মন পরম সত্য পরমা-ত্মাতে স্থিরীভূত হইতে পারে না।

তৃতীয় স্মর্ত্তব্য।

ধ্যানকালে সাধকের চিত্ত পরম সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, কার্য্য-কালে পরম মঙ্গলের পথে সহজেই তাঁহার মতিগতি হয়। তেমনি আবার কার্য্যকালে সাধক কায়মনোবাক্যে মঙ্গলের পথে লাগিয়া থাকিলে তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন হয়, আর গীতার একথাটি বড়ই ঠিক্ যে,—

"প্রসন্ন-চেতসোহ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে।"

প্রসন্ন চেতার বুদ্ধি পরম সত্যে সহজেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

তোমার এই যে প্রশ্ন—যে, যোগ-সাধন যদি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর হয়, তবে সব ছাড়িয়া সাধক সমস্ত জীবন রাত্রিদিন যোগসাধনে নিযুক্ত না-থাকেন কেন, আর যদি সাংসারিক কর্ত্তব্যসাধন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর হয়, তবে সব ছাড়িয়া সাধক সমস্ত জীবন দিবারাত্রি সাংসারিক কর্ত্তব্যসাধনে নিযুক্ত না-থাকেন কেন? তোমার এ প্রশ্নের সম্বন্ধে গীতাশাস্ত্রের অভিপ্রায় খুবই স্পষ্ট; তাহা এই যে, যাহাকে বলা যায়—সাংখ্যানুমোদিত যোগ-সাধন, তাহা জ্ঞানযোগের সাধন; আর, যাহাকে বলা যায় ধর্ম্মানুমোদিত কর্ত্তব্যসাধন, তাহা কর্ম্মযোগের সাধন; দুই-ই যোগ-সাধন, আর, দুইই ইষ্টফলপ্রদ। তা ছাড়া গীতাশাস্ত্রের মতে ভজনও একপ্রকার সাধন—ভক্তি-যোগের সাধন। ফলে, শিবের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে যেমন যজ্ঞ নিস্ফল হয়, তেমনি ভক্তিযোগের সাহচর্য্য ব্যতিরেকে জ্ঞানযোগই বা কি, আর কর্ম্মযোগই বা কি, দুইই নিস্ফল হয়। এ সম্বন্ধে গীতাশাস্ত্রের সার উপদেশ তিনটি:—

প্রথম উপদেশ।

পরাৎপর পরম সত্যে—পরমাত্মাতে—জ্ঞানের যোগ-সাধন করিবে। ইহাই জ্ঞানযোগের উপদেশ।

দ্বিতীয় উপদেশ।

ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া ধর্ম্মানুমোদিত কর্ত্তব্যের পথে মনের যোগ-সাধন করিবে। ইহাই কর্ম্মযোগের উপদেশ।

তৃতীয় উপদেশ।

সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ঈশ্বরেতে প্রীতি স্থাপন করিবে। ইহাই ভক্তিযোগের উপদেশ।

ভক্তিযোগের এই উপদেশটি অ্যাকা যে কেবল গীতাশাস্ত্রেরই উপদেশ তাহা নহে, উহা সর্ব্বদেশের সর্ব্বশাস্ত্রেরই প্রধানতম উপদেশ। তার সাক্ষী :—বাইবেলের নববিধানের একস্থানে এইরূপ লেখে যে, ইহুদীদিগের একজন ধর্ম্মশাস্ত্রী যখন ঈসা-মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "Which is the great commandment in the law ?" "ধর্ম্মশাস্ত্রের শেরা* উপদেশ কোন্‌টা ? ঈসা তাহার উত্তর দিলেন এই যে, "Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment" "তোমার পরম প্রভু পরমেশ্বরকে তুমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত প্রীতি করিবে—ইহাই প্রথম এবং প্রধান উপদেশ।"

পাতঞ্জল-দর্শনের ভোজরাজ কৃত টীকায় "ঈশ্বর প্রণিধানাদ্ বা" এই সূত্রের অর্থ করা হইয়াছে এইরূপ ;—

"ঈশ্বর-প্রণিধানং—তত্র ভক্তিবিশেষঃ, বিশিষ্টং উপাসনং ; সর্ব্ব-

---

* শেরা শব্দের মূল শিরঃ শব্দ ;—শেরা কিনা শীরঃস্থানীয় ; এই জন্য শেরা শব্দের আদ্যক্ষর দন্ত্য স'র পরিবর্ত্তে তালব্য শ করিয়া দেওয়া হইল।

ক্রিয়াণামপি তত্রার্পণং—বিষয়সুখাদিকং ফলং অনিচ্ছন্ সর্ব্বাঃ ক্রিয়া তস্মিন্ গুরৌ অর্পয়তীতি। তৎপ্রণিধানং সমাধেঃ তৎফলস্য চ প্রকৃষ্ট উপায়ঃ।"

ইহার অর্থ :—

"ঈশ্বর প্রণিধান কি? না ঈশ্বরেতে ভক্তি বিশেষ—বিশিষ্ট রকমের উপাসনা—বিষয়সুখাদি ফলের প্রত্যাশা না রাখিয়া পরমগুরু পরমেশ্বরেতে সমস্ত কর্ম্মের সমর্পণ। এইরূপ যে ঈশ্বর প্রণিধান, ইহাই সমাধি এবং তাহার ফললাভের প্রকৃষ্ট উপায়।"

শঙ্করাচার্য্যের প্রণীত সর্ব্ববেদান্তের সারসংগ্রহে আছে—

"অত্যন্তং শ্রদ্ধয়াভক্ত্যা গুরুমীশ্বরমাত্মনি।
যো ভজত্য নিশং শান্তঃ তস্য চিত্তং প্রসীদতি॥

* * * *

"মনোঽপ্রসাদঃ পুরুষস্যবন্ধো মনঃ প্রসাদো
ভববন্ধমুক্তিঃ॥"

ইহার অর্থ :—

"অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তির সহিত যিনি পরমগুরু পরমেশ্বরকে শান্তচিত্তে ভজনা করেন, তাঁহার মন প্রসন্ন হয়। * * * মনের অপ্রসন্নতাই পুরুষের বন্ধন; মনের প্রসন্নতাই সংসারবন্ধনের মুক্তি।"

সর্ব্বদেশের সর্ব্বশাস্ত্রেরই মতে ভজন এবং সাধনের মধ্যে এইরূপ হরিহরাত্মা সম্বন্ধ, ভক্তিশাস্ত্রের বিধানানুযায়ী নামজপাদি যদি চ সাধনেরই অঙ্গ, তথাপি তাহা ভজন-প্রধান তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়; তেমনি আবার, যোগশাস্ত্রের বিধানানুযায়ী ঈশ্বরেতে কর্ম্মসমর্পণ যদি চ ভজনেরই অঙ্গ, তথাপি তাহা সাধনপ্রধান তাহাও স্পষ্ট বুঝিতে

পারা যায়। আমাদের দেশের লোকসমাজে বৈষ্ণব শ্রেণীর সাধুরা বিশিষ্টরূপে ভক্ত বলিয়া পরিচিত; আর, যোগিতপস্বীরা বিশিষ্টরূপে সাধক বলিয়া পরিচিত। সাধক সম্প্রদায়ের যোগিতপস্বীরা মুক্তি বলিতে বোঝেন—সাংখ্যদর্শনে যাহাকে বলে কৈবল্য; আর ভক্ত-সম্প্রদায়ের সাধুরা মুক্তি বলিতে বোঝেন—ভক্তিশাস্ত্রে যাহাকে বলে সালোক্য সামীপ্য অথবা সাযুজ্য। "সালোক্য" অর্থাৎ যেমন বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি; "সামীপ্য" অর্থাৎ যেমন চতুর্ভুজ বিষ্ণু-মূর্ত্তির সাক্ষাৎকার প্রাপ্তি; "সাযুজ্য" অর্থাৎ উক্ত-প্রকার মূর্ত্তির সহিত মনের ঐকান্তিক সমাহিত অবস্থা। এই যে দুই বিরোধী সম্প্রদায়ের মতানুযায়ী দুই বিরোধী শ্রেণীর মুক্তি—দুয়ের কোনটিই গীতাশাস্ত্রের অভিমত বলিয়া আমার বোধ হয় না এইজন্য—যেহেতু আমার এইরূপ ধারণা যে, সসাগরা পৃথিবীর মধ্যে কোনো দেশের কোনো শাস্ত্র যদি অসাম্প্রদায়িক নামের যোগ্য হয়, তবে সে শাস্ত্র আমাদের দেশের গীতাশাস্ত্র।

প্রশ্ন॥ গীতাশাস্ত্রের মতানুযায়ী মুক্ত পুরুষের লক্ষণ তুমি তবে কী ঠাওরাও ?

উত্তর॥ ধ্যানকালে যাঁহার চিত্ত ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য পরম সত্যে সহজেই সমাহিত হয়; কার্য্যকালে যাঁহার মন নিষ্কাম এবং অনাসক্তভাবে মঙ্গলের পথে সহজেই পরিচালিত হয়, এবং সর্ব্বকালে ঈশ্বরপ্রেমে যাঁহার মন পরমানন্দে আনন্দিত—গীতাশাস্ত্রের অভিপ্রায় মতে তিনিই মুক্তপুরুষ।

প্রশ্ন॥ কিন্তু গীতাশাস্ত্রের পুঁথি খুলিয়া তোমাকে আমি দেখা-ইতে পারি যে, ত্রিগুণাতীত নিঃসঙ্গ কেবলাবস্থা গীতাশাস্ত্রোক্ত মুক্ত পুরুষের একটি প্রধান পরিচয়-লক্ষণ; আর, এটাও তোমাকে আমি দেখাইতে পারি যে, গীতাশাস্ত্রের ১১শ অধ্যায়ে ভগবানের

দুইরূপ মূর্ত্তির অবতারণা করা হইয়াছে—একটির পরে আর একটি। প্রথমটি সহস্র-মুখচক্ষুমস্তক সহস্রবাহু সহস্রপদ ভীষণ বিরাট মূর্ত্তি; দ্বিতীয়টি স্নিগ্ধ মনোহর চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি। অতএব তুমি যাহাকে বলিতেছ শূন্যাত্মবাদদূষিত কৈবল্যসংজ্ঞক মুক্তি তাহাও গীতাশাস্ত্রের মতবিরুদ্ধ নহে, আর, তুমি যাহাকে বলিতেছ ঈশ্বরের মূর্ত্তিকল্পনা-দূষিত সালোক্যাদিসংজ্ঞক মুক্তি তাহাও গীতাশাস্ত্রের মতবিরুদ্ধ নহে।

উত্তর॥ কোনো একটি কাব্যগ্রন্থের নায়িকাকে পূর্ণচন্দ্রনিভাননা বলা হইয়াছে দেখিয়া তুমি যদি গ্রন্থকারের অভিপ্রায় এইরূপ বোঝো যে, সুন্দরী কন্যাটির মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় চক্রাকৃতি, তবে তোমার সেই মার্জ্জিত বুদ্ধির সিদ্ধান্তটি কোনো সূত্রে গ্রন্থকারের কর্ণগোচর হইলে তিনি যেরূপ দয়ার্দ্রভাবে মনে মনে হাস্য করেন; তেমনি, গীতাশাস্ত্রে মুক্ত পুরুষকে নিঃসঙ্গ এবং গুণাতীত বলা হইয়াছে দেখিয়া তুমি যদি শাস্ত্রকারের অভিপ্রায় এইরূপ বোঝো যে, মুক্ত পুরুষ জ্ঞানবর্জ্জিত প্রেমবর্জ্জিত সর্ব্ববর্জ্জিত কিছুই-না'র আর এক নাম; অথবা, গীতাশাস্ত্রে ভগবানের অদ্ভুত প্রকার বিভূতি বর্ণনা দেখিয়া শাস্ত্রকারের মর্ম্মগত অভিপ্রায় তুমি যদি এইরূপ বোঝো যে, ঈশ্বর সত্যসত্যই সহস্র মস্তক, সহস্র বাহু, এবং ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুদিগের ন্যায় করাল দংষ্ট্রায়ুধবিশিষ্ট; অথবা গীতাশাস্ত্রে ভগবানের চতুর্ভুজ মূর্ত্তির উল্লেখ দেখিয়া শাস্ত্রকারের মর্ম্মগত অভিপ্রায় তুমি যদি এইরূপ বোঝো যে, পশুরা যেমন সত্যসত্যই চতুষ্পদ, জগৎপাতা ভগবান্ তেমনি সত্যসত্যই চতুর্ভুজ, তবে তোমার সেই চমৎকার বুদ্ধির সিদ্ধান্তটি কোনো গতিকে শাস্ত্রকারের কর্ণগোচর হইলে, তিনিও সেইরূপ দয়ার্দ্রভাবে মনে মনে হাস্য করিবেন তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই।

প্রশ্ন। তোমার ও সকল ছেঁদো কথায় আমি ভুলি না। গীতা-শাস্ত্রের ঐ ঐ স্থলে শাস্ত্রকারের অভিপ্রায় সকলেই যাহা বোঝে, আমিও তাহাই বুঝি ; তদ্ব্যতীত, তাহার ভিতরে নূতন-ধাঁচার আর-যদি-কোনোরকম বুঝিবার কিছু থাকে, তবে আমার তাহা স্বপ্নের অগোচর। গীতাশাস্ত্রের ঐ-সকল স্থলে শাস্ত্রকারের অভিপ্রায় তোমার অ্যাকলার বুদ্ধিতে না জানি তুমি কিরূপ বুঝিয়াছ, সেইটি কেবল জানিবার জন্য আমার মনে কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে ; অতএব আর আর কথা ছাড়িয়া সেই কথাটি আমাকে খুলিয়া খালিয়া বলো।

উত্তর॥ আমার যাহা সত্য বলিয়া মনে হয় তাহা আমি আমার অ্যাকলার বুদ্ধিতেই বুঝিয়া থাকি, আর, দশ জনের বুদ্ধিতেই বুঝিয়া থাকি; তাহাতে কিছুই আইসে যায় না ;—তাহা যদি যুক্তিগর্ভ হয়, তবে সকলের বুদ্ধিতেই তাহা ক্রোড় পাতিয়া সাদরে গৃহীতব্য ; পক্ষান্তরে, তাহা যদি অযৌক্তিক হয়, তবে কাহারো বুদ্ধিতে তাহা তিল-মাত্রও স্থান পাইবার যোগ্য নহে। তা ছাড়া, তুমি চাহিতেছ কেবল তোমার কৌতূহলের চরিতার্থতা ; কিন্তু আমি দেখিতেছি, যে, তোমার জিজ্ঞাস্য বিষয়টির একটা পরিষ্কার মীমাংসা হইলে অনেকের অনেক প্রকার মনের ধন্দ ঘুচিয়া যাইতে পারে ; আর সেইজন্য তোমার ঐ প্রশ্নটির সদুত্তর প্রদান করা খুবই আমার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহা তাড়াহুড়ার কর্ম্ম নহে—আগামী বারের অধিবেশনে ধীরেসুস্থে তাহার চেষ্টা দেখা যাইবে।

ষোড়শ অধিবেশন।

ব্যাখ্যান।

প্রশ্নকর্ত্তার প্রতি॥ ঈশ্বরের মূর্ত্তি কল্পনাদি'র সম্বন্ধে গীতাশাস্ত্রের মর্ম্মগত অভিপ্রায় আমার বুদ্ধিতে আমি কিরূপ বুঝি—এই না তোমার জিজ্ঞাসা? ঐ শাস্ত্ররহস্যটি আমি কিরূপ বুঝি তাহা আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া—তুমি আপনি কিরূপ বোঝো তাহা যদি তোমার অন্তরাত্মাকে জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলে—আমি বেস বলিতে পারি যে, তাহার সদুত্তর পাইতে তোমার একমুহূর্ত্তও বিলম্ব হইবে না। কেন না, আমি আমার মনশ্চক্ষে স্পষ্ট দেখিতেছি যে, তুমি যে-সমাজের একজন মাথালো গোচের কর্ত্তৃপক্ষীয় ব্যক্তি, এমন কি নেতা বলিলেই হয়, সে সমাজে (অর্থাৎ কৃতবিদ্য সমাজে) এ কথা না জানে এমন লোকই নাই যে, শাস্ত্রীয় রহস্যের সাংকেতিক ভাষার বাহিরের অর্থ যাহা চাসা-ভূসা শ্রেণীর অশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের বোধ-সুলভ তাহা স্বতন্ত্র, আর তাহার ভিতরের অর্থ যাহা ভদ্রশ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে "বুঝিতে পারি না" বলা নিতান্তই লজ্জার বিষয়, তাহা স্বতন্ত্র; নারিকেলের ছোবড়া স্বতন্ত্র, আর নারিকেলের সাঁশ স্বতন্ত্র; * দুয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। আমাদের দেশের নিখিল পুরাণ-শাস্ত্রের এই যে একটি সুপ্রসিদ্ধ কথা—যে, অনন্ত-সর্পের সহস্র মস্তকের উপরে সসাগরা পৃথিবী বিধৃত রহিয়াছে, এ কথার মূলে যদি কোনো সত্য থাকে তবে তাহা এই যে, "অনন্ত সর্প" কিনা অনন্ত কাল বা অনন্ত আকাশ; "সহস্র মস্তক"

* সাঁশ শব্দ সারাংশ শব্দের অপভ্রংশ; আর, সেইজন্য তাহার প্রকৃত বানান ☞ "সাঁশ" এইরূপ; ☞ "শাঁস" এরূপ নহে।

কিনা চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি সহস্র সহস্র জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলের সমবেত আকর্ষণী শক্তি। পুরাতন গ্রীসের তান্ত্রিক পণ্ডিতেরা "আপনার ল্যাজ আপনি গিলিতেছে" এইরূপ একটা সর্পমূর্ত্তি আঁকিয়া আদি-অন্ত বিহীন মহাকালের ভাব রূপকচ্ছলে জ্ঞাপন করিতেন, ইহা কাহারো অবিদিত নাই। আমার তাই এইরূপ মনে হয় যে, গণিত শাস্ত্রের বিধানানুযায়ী অসীমতাজ্ঞাপক সাংকেতিক চিহ্নটি, [∞] এই চিহ্নটি একটা স্বলাঙ্গুলগ্রাসী সর্পমূর্ত্তির অপভ্রংশ। অতএব এ বিষয়ে আর সন্দেহমাত্র নাই যে, অনন্ত-নাম-ধারী সর্প অনন্ত মহা-কালের তথৈব অনন্ত মহাকাশের একটা রূপক চিত্র ছাড়া অর্থাৎ পাশ্চাত্য ভাষায় যাহাকে বলে Hieroglyphic তাহা-ছাড়া আর কিছুই নহে। শাস্ত্রীয় ভাষার রহস্য-মন্দিরে [∞] এই-যেমন একটা রূপক চিত্র দেখা গেল—জগৎপাতা ভগবানের চতুর্ভুজ মূর্ত্তি সেইরূপ একটা রূপক চিত্র বই আর কিছুই নহে। তার সাক্ষী :—বিষ্ণুমূর্ত্তির এক হস্তে শঙ্খ—কিনা শব্দগুণের আধার আকাশ; আর এক হস্তে চক্র—কিনা কাল-চক্র; তৃতীয় হস্তে গদা—কি না মৃত্যু; চতুর্থ হস্তে পদ্ম কি না জীবনের বিকাশ। এই রূপক চিত্রটির মর্ম্মগত অর্থ যে কি তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে; তাহা এই যে, আকাশ, কাল, এবং সমস্ত দেশ কাল জুড়িয়া জীবন-মৃত্যুর তরঙ্গ-দোলা যাহা নিরন্তর দোলায়মান হইতেছে সমস্তই ঈশ্বরের হস্তের মুঠার মধ্যে রহিয়াছে। তোমার প্রশ্নের উত্তরে তোমাকে আমি তাই দেখিতে বলি এই যে, একটা চন্দ্রমণ্ডলের ছবি সম্মুখে রাখিয়া তদ্দৃষ্টে প্রেয়সীর মুখাকৃতি মনোমধ্যে জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা, অথবা, একটা সহস্রমস্তক সর্পের ছবি সম্মুখে রাখিয়া তদ্দৃষ্টে অনন্তের ভাব মনোমধ্যে জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা যেমন নিতান্তই একটা বিসদৃশ

চেষ্টা, তেমনি, চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তির একটা ছবি বা প্রতিমা সম্মুখে রাখিয়া তদ্দৃষ্টে ভগবানের সর্ব্বব্যাপী নিত্য এবং আদ্যন্তবিহীন ঐশ্বর্য্যের ভাব মনে জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা নিতান্তই একটা বিসদৃশ চেষ্টা। এ সকল রূপক চিত্রের (অর্থাৎ Hieroglyphic এর) প্রকৃত উদ্দেশ্য যে কি, তাহা কাব্য-প্রণেতা কবিকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও যাহা বলিবেন, আর, শাস্ত্রপ্রণেতা ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও তাহাই বলিবেন ;—করুণার্দ্র চিত্তে তোমার মুখের প্রতি চাহিয়া উভয়েই তোমাকে একবাক্যে বলিবেন—

"তোমাকে তোমার মনোমধ্যে কোনোপ্রকার ছবি আঁকিতে বলিতেছি না—বলিতেছি কেবল ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে। সে যে ভাব রূপাতীত ! আর, রূপাতীত বলিয়া তাহা অপরূপ-শব্দের বাচ্য। * তাহার রূপ চর্ম্ম-চক্ষেও দেখিতে পাওয়া যায় না, মনশ্চক্ষের সম্মুখেও গড়িয়া দাঁড় করানো যায় না ; তাই তাহাকে বলা হয় "অপরূপ"। তুমি যদি ভাবুক বা প্রেমিক হও, তবে ভাব-চক্ষে অতি সহজে তাহা দেখিতে পাইবে ; আর, তুমি যদি শুষ্ক তার্কিক হও তবে সহস্র মাথা খুঁড়িলেও তাহা দেখিতে পাইবে না—বাহিরেও না—ভিতরেও না।" কবি বলিবেন "সুন্দর বস্তুর সৌন্দর্য্য ভাবে-হৃদয়ঙ্গম-করিবার বস্তু, তা বই, তাহা চক্ষে-দেখিবার-বস্তুও নহে—পটে-আঁকিবার-বস্তুও নহে ;—লেখ্যপটেও না চিত্তপটেও না।" শাস্ত্রকার ঋষি বলিবেন "ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য অপরিসীম, এবং অনির্ব্বচনীয় ! তাহা ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত প্রশান্ত-ভাবে

---

* একজন নৈয়ায়িক তর্কচূড়ামণি বলিতে পারেন—"অপরূপ রূপ" "অকথিত বাণী" "অনাহত শব্দ" এ সকল বাক্য বদতো-ব্যাঘাত দোষে দূষিত। তিনি তো তাহা বলিবেনই ! কবির ব্যথা কবিই জানে।

হৃদয়ঙ্গম করিবার বস্তু, তা বই তাহা লেখ্য-পটে বা মানস-পটে আঁকিবার বস্তু নহে।” কবি বলিবেন “সুন্দর বদনের রূপমাধুর্য্য বর্ণনাতীত বলিয়া আমরা উজ্জ্বল এবং সুন্দর বস্তু যাহা যখন হাতের কাছে পাই তাহারই সঙ্গে তাহার তুলনা দিই, কিন্তু তাহাতে আমাদের মনের আকাঙ্ক্ষা মেটে না ;—সুন্দর মুখের অনুপম শ্রীকে পূর্ণচন্দ্রনিভ বলিয়াও আমাদের মন তৃপ্তি মানে না ; তাহার পরিবর্ত্তে আমরা তাই বলি ‘ইন্দু-বিনিন্দিত’ ; বলি—‘চন্দ্রকে তাহা লজ্জা দ্যায়’। মহাকবি শেক্সপিয়র জুলিয়েটের রূপ-মাধুর্য্যের কথা রোমিও’র মুখ দিয়া যাহা বাহির করাইয়াছেন—তা তো তুমি জানো ! রোমিও বলিতেছে

‘But soft ! What light through yonder window breaks !
It is the east, and Juliet is the sun !—
Arise, fair sun, and kill the envious moon,
That thou, her maid art far more fair than she !”

ইহার টীকা।

পুরাতন গ্রীসের পুরাণ-শাস্ত্রে লেখে—Diana-নাম্নী দেবী চন্দ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর (সংক্ষেপে—চন্দ্রদেবীর) পরিচারিকা ; আর সেই সঙ্গে এটাও লেখে যে Diana দেবী কুমারী-কন্যাগণের আদর্শভূতা চিরকুমারী। Romeo’র প্রেম-চক্ষে জুলিয়েট্ সেই Diana দেবী। Remeo তাই চন্দ্রদেবীকে বলিতেছে—‘ঈর্ষান্বিত’ ; কেননা, চন্দ্র দেবীর পক্ষে এটা কম লজ্জার বিষয় নহে যে, তাঁহার পরিচারিকা (অর্থাৎ Diana দেবী Juliet) তাঁহা-অপেক্ষা শত সহস্র গুণ সুন্দর।”

অতএব এটা তুমি স্থির জানিও যে, পূর্ণচন্দ্রনিভ-বিশেষণটির অর্থ

পূর্ণচন্দ্রনিভ নহে; তাহার অর্থ—অপরূপ (অর্থাৎ রূপাতীত) শ্রীসৌন্দর্য্যে শোভমান।

কাব্য-প্রণেতা কবি তোমাকে যাহা বলিবেন, তাহা বলিলাম; শাস্ত্রপ্রণেতা ঋষি যাহা বলিবেন তাহাও বলিতেছি:—বলিবেন তিনি— "উপনিষদে লেখে—

'বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতো মুখো
বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতম্পাৎ"

'সর্ব্বত্র তাঁহার চক্ষু, সর্ব্বত্র তাঁহার মুখ, সর্ব্বত্র তাঁহার বাহু, সর্ব্বত্র তাঁহার পদ, আবার, এটাও লেখে যে,—

'অপাণিপাদো জবনো গৃহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ' 'তাঁহার হস্ত নাই অথচ গ্রহণ করেন; চরণ নাই অথচ দ্রুত চলেন; চক্ষু নাই অথচ দেখেন; কর্ণ নাই অথচ শোনেন।'

উপনিষদের দুইস্থানের এই যে দুইটি শ্লোক, এ-দুইটি শ্লোকের দ্বিতীয়টিতে প্রথমটির অর্থ পরিষ্কার করিয়া ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছে; সে অর্থ এই:—

"সর্ব্বত্র তাঁহার চক্ষু"—কিনা তিনি সর্ব্বদর্শী; সর্ব্বত্র তাঁহার মুখ" কিনা তিনি সর্ব্বাধ্যক্ষ; "সর্ব্বত্র তাঁহার বাহু" কিনা তিনি সর্ব্ব-শক্তিমান্; সর্ব্বত্র তাহার পদ কিনা তিনি সর্ব্বগত; তা বই, উহার অর্থ এ নহে যে, ঈশ্বর সত্যসত্যই সহস্র মুখ-চক্ষু-হস্তপদ-বিশিষ্ট বিকটাকার পুরুষ।

প্রশ্ন॥ যদিই বা তোমার এ কথা সত্য হয় যে, গীতাশাস্ত্রোক্ত নানা মুখচক্ষুবিশিষ্ট বিরাট্ মূর্ত্তি, তথৈব চতুর্ভুজ মূর্ত্তি, একটা রূপক-প্রতিমা মাত্র; কিন্তু এটা তো আর তুমি অস্বীকার করিতে পারিবে না যে, গীতাশাস্ত্রের প্রণেতা মহাঋষি গীতাগ্রন্থের প্রতি-ছত্রে

নরমূর্ত্তিধারী শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া প্রতিপাদন করিতে একটুকুও বচন-কৌশলের ত্রুটি করেন নাই। ভগবদ্গীতার দশম অধ্যায়ের তৃতীয় চতুর্থ শ্লোক-দুইটির সঙ্গে কখনো কি তোমার সাক্ষাৎকার ঘটে নাই? সে দুইটি শ্লোক এই :—

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

"ন মে বিদুঃ সুরগণা প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদি র্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ॥
যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরং।
অসম্মূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥"

"আমার গোড়ার তত্ত্ব দেবতারাও জানেন না, মহর্ষিরাও জানেন না। দেবতাদিগেরও আমি আদিপুরুষ, মহর্ষিদিগেরও আমি আদিপুরুষ। মর্ত্ত্যের মধ্যে জ্ঞানচক্ষু লাভ করিয়া আমাকে যে-ব্যক্তি জানে "জন্ম-বিহীন অনাদি লোক-মহেশ্বর", সে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়।"

উত্তর॥ কোন্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"আমি জন্মবিহীন?" যিনি দেবকী-গর্ব্ভে জন্মিয়াছেন, সে শ্রীকৃষ্ণ যদি বলেন—"আমি জন্মবিহীন," তবে আমিও বলিতে পারি—আমি জন্মবিহীন, তুমিও বলিতে পার—তুমি জন্মবিহীন। অতএব যাঁহার কিছুমাত্র সম্ভবাসম্ভব বা সঙ্গতা-সঙ্গত বোধ আছে—নিশ্চয়ই তিনি আমার সহিত একবাক্যে বলিবেন যে, গীতা-প্রণেতা মহাঋষির মর্ম্মগত অভিপ্রায় শুধু এই যে, শ্রীকৃষ্ণের যিনি শ্রীকৃষ্ণ—আত্মার যিনি আত্মা—সর্ব্বজীবের সেই অন্তরতম আত্মা পরমাত্মা দেবকীর গর্ব্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের মধ্য দিয়া—কুন্তীর গর্ব্ভজাত অর্জ্জুনের মধ্য দিয়া, বক্তার মধ্য দিয়া—শ্রোতার মধ্য দিয়া, গুরুর মধ্য দিয়া—শিষ্যের মধ্য দিয়া, এবং সমস্ত প্রকৃতির মধ্য দিয়া—নিস্তব্ধ গম্ভীর শব্দ-হীন বাক্যে বলিতেছেন "আমি জন্মবিহীন অনাদি লোক-

মহেশ্বর।" এইরূপ যিনি জন্মবিহীন লোকমহেশ্বর—যাহার পিতা-মাতা নাই—কে তাঁহার নাম রাখিলেন "শ্রীকৃষ্ণ?" অতএব তাঁহার নাম "শ্রীকৃষ্ণ" হইতেই পারে না।

ঈশ্বরের মূর্ত্তিকল্পনা-সম্বন্ধে গীতাশাস্ত্রের মর্ম্মগত অভিপ্রায় আমার বুদ্ধিতে আমি যেরূপ বুঝি, তাহা তোমাকে পরিষ্কার করিয়া খুলিয়া খালিয়া বলিলাম। অধিকন্তু আমার বিশ্বাস এই যে, আমার বুদ্ধিতে আমি তাহা যেরূপ বুঝি, তোমার বুদ্ধিতেও তুমি তাহা সেইরূপই বোঝো; কেবল—দশজনের মন রক্ষা করিয়া তোমার প্রযত্ন-পোষিত দালপত্যের বিষ-বৃক্ষটির মূলে জলসিঞ্চন করিবার মানসে মুখে শুধু বলিতেছ এই যে, জিজ্ঞাস্য বিষয়টির সম্বন্ধে গীতাশাস্ত্রের অভিপ্রায় দশ জনে যাহা বোঝে তুমিও তাহাই বোঝো, তাহার অধিক কিছুই বোঝ না। বলিতে কি—তোমার মতো সুপণ্ডিত ও বিচক্ষণ ব্যক্তির মুখে অমন-ধারা একটা বিসদৃশ অজ্ঞতা'র ভান আমার কর্ণে পৌঁছিলে তাহার তিক্ত আস্বাদে নাকমুখ শিট্‌কাইয়া আমার মন অধীরে বলিয়া ওঠে—"এ যে বিনয়ের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি!"

প্রশ্নকর্ত্তা॥ ঈশ্বরের চতুর্ভুজ মূর্ত্তিকে তুমি যেমন বলিলে—কাব্যের অলঙ্কার, অত্যুক্তিকে আমি তেমনি বলি—ভাষার অলঙ্কার। প্রকৃত কথা এই যে, "আমি কিছুই বুঝি না" এটা যেমন অত্যুক্তি, "আমি সবই বুঝি" এটাও তেমনি অত্যুক্তি; দুইই সমান অত্যুক্তি। এটাও কিন্তু বলি যে, মনুষ্যের ন্যায় মর্ত্ত্যজীবের মুখে নরম-সুরের ঐ প্রথম অত্যুক্তিটি যেমন শোভা পায়, চড়া-সুরের ঐ দ্বিতীয় অত্যুক্তিটি তেমন শোভা পায় না।

উত্তর॥ তাহা তো শোভা পায়ই না। কিন্তু ঐ চড়াস্থরের অত্যুক্তিটা'র সঙ্গে কী-সূত্রে তুমি যে আমাকে জড়াইতেছ—তাহার বাষ্পও আমি বুঝিতে পারি না। তুমি যদি বলো যে, "হিমালয় পর্ব্বত তালগাছের মতো উচ্চ, আর, আমি যদি বলি যে, হিমালয় পর্ব্বতের সঙ্গে তালগাছের তুলনাই হয় না; তবে তাহাতে এরূপ বুঝায় না যে, আমি হিমালয় পর্ব্বতের আদি-অন্ত-মধ্যের সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানি। তেমনি, তুমি যদি বলো "ঈশ্বর সহস্রশিরোমুখ-গ্রীবাবিশিষ্ট বিরাট্‌পুরুষ," আর, আমি যদি বলি যে, "অনাদ্যনন্ত ঈশ্বরের সহিত শিরোমুখবিশিষ্ট জীবের তুলনাই হয় না," তবে তাহাতে এরূপ বুঝায় না যে, আমি সর্ব্বজ্ঞ মহাপুরুষ।

প্রশ্ন॥ তোমার প্রতি কোনো প্রকার দোষারোপ করা আমার উদ্দেশ্য নহে; আমার উদ্দেশ্য কেবল এইটি তোমাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া—যে, যে-দুই প্রকার অত্যুক্তির কথা আমি উল্লেখ করিলাম, তাহার মধ্যে যে-টি চড়াস্থরের অত্যুক্তি সেইটিই কেবল নিন্দনীয়—অন্যটি (অর্থাৎ নরম স্থরেরটি) মার্জ্জনীয়। এ সকল বৃথা বাদ-বিতণ্ডায় কালক্ষেপ না করিয়া তুমি যদি আমার প্রকৃত জিজ্ঞাস্য বিষয়টির একটা সদুত্তর দেও, তবে আমার বড়ই উপকার কর। তুমি বলিতেছ যে, যে-রকমের মুক্তি গীতাশাস্ত্রের অনুমোদিত, তাহার তুমি নিগূঢ় সন্ধান জানিতে পারিয়াছ;—জানিতে পারিয়াছ যে, তাহা ঈশ্বরের মূর্ত্তিকল্পনা-দূষিত সালোক্যাদি-সংজ্ঞক মুক্তিও নহে, আর, শূন্যাত্মবাদ-দূষিত কৈবল্য-সংজ্ঞক মুক্তিও নহে। তাহা যদি তুমি জানিতে পারিয়া থাক, তবে তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, তাহা কোন্ রকমের মুক্তি? তাহা পদার্থটাই বা কি, আর তাহার ভেদ-পরিচায়ক নামই বা কি?

উত্তর॥ গীতাশাস্ত্রের অভিপ্রায়ানুযায়ী মুক্তির নাম যদি কিছু থাকে, তবে শাস্ত্রীয় ভাষায়—তাহার নাম জীবন্মুক্তি।

প্রশ্ন॥ জলাশয় পানে চাহিয়া কী দেখিতেছ?

উত্তর॥ দেখিতেছি—রহস্য মন্দ না! মার্ত্তণ্ডদেবের কোপ-দৃষ্টিতে পড়িয়া জলাশয়ের সলিলেরও যে দশা, আর, আমার শরীরেরও সেই দশা; উভয়েরই দশা সমান; সলিল এবং শরীরের মধ্যে "ডলয়োরলয়ো রভেদঃ।" অতএব আজ এই অবধিই ভাল। বর্ষার শুভাগমন হইলে জলাশয়েরও জলপূরণ হইবে, শরীর-মনেরও বল-পূরণ হইবে, আর, গীতাশাস্ত্রের অভিপ্রায়ানুযায়ী মুক্তির সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য তাহার বাকী-পূরণের চেষ্টায় সাধ্যানুসারে প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে।

সপ্তদশ অধিবেশন।

ব্যাখ্যান।

গীতা-শাস্ত্রের গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত কোনো একটি স্থানেও কৈবল্য-মুক্তির উল্লেখ নাই। পক্ষান্তরে, গীতাপুস্তকের যে-পাতারই গায়ে আঙুল ঠ্যাকানো যায়, সেই পাতার মধ্য-হইতেই জীবন্মুক্তির সুর ঝঙ্কার দিয়া ওঠে। বিশেষতঃ, কৈবল্য মুক্তি গীতাশাস্ত্রে স্থান পাইবার কথাই নহে; কেননা, গীতাতে মহাভারতের যে-জায়গার কথা বলা হইতেছে, সে জায়গায়—অর্জ্জুনকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কায়-মনোবাক্যে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য যাহা কাজে লাগিতে পারে সেই-রকমেরই উপদেশ শোভা পায়, তা বই কৈবল্য-মুক্তির উপদেশ কোনোক্রমেই শোভা পায় না। যুধিষ্ঠির হইলে—তাঁহাকে শৌর্য্য-বীর্য্যাদি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করা শ্রীকৃষ্ণের মুখে শোভা পাইত মন্দ না। কিন্তু অর্জ্জুনকে শূরবীর হইতে বলাও যা, আর, মধ্যাহ্ন দিবাকরকে তেজঃশালী হইতে বলাও তা, দুইই সমান। শ্রীকৃষ্ণ তবে অর্জ্জুনকে কী হইতে বলিতেছেন? অর্জ্জুনকে তিনি না-হইতে বলিতেছেনই বা কি?—জ্ঞানী হইতে বলিতেছেন—কর্ম্মী হইতে বলিতেছেন—যোগী হইতে বলিতেছেন—ভক্ত হইতে বলি-তেছেন। কিন্তু এতগুলা কথার অবতারণা নিষ্প্রয়োজন;—এক কথাতেই মাম্‌লা চুকাইয়া দেওয়া যাইতে পারে; সে কথা এই যে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে জীবন্মুক্ত হইতে বলিতেছেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, জীবন্মুক্তি বলে কাহাকে? জীবন্মুক্তি যে, বলে কাহাকে, তাহার গোটা-তিনেক নমুনা গীতা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখা-ইতেছি—প্রণিধান কর:—

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের চত্বারিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে—

"যোগস্থঃ কুরুকর্ম্মাণি সঙ্গংত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥"

ইহার অর্থ এই ঃ—

যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম কর ধনঞ্জয়; আর, কর্ম্ম যাহা করিবে তাহা—অনাসক্ত হইয়া—সিদ্ধি-অসিদ্ধির মধ্যস্থলে সমভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া—করিবে। সমত্বেরই নাম যোগ।

পঞ্চম অধ্যায়ের বিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে—

"ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্‌বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ং।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্‌ব্রহ্মণি স্থিতঃ॥"

ইহার অর্থ এই ঃ—

স্থিরবুদ্ধি এবং মোহমুক্ত ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মে স্থিত হইয়া প্রিয় ঘটানাতেও হর্ষোন্মত্ত হইবেক না অপ্রিয় ঘটনাতেও উদ্বিগ্ন হইবেক না।

তৃতীয় অধ্যায়ের সার্দ্ধ ঊনবিংশ-শ্লোকে বলা হইয়াছে—

"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ।
কর্ম্মনৈব হি সংসিদ্ধি মাস্থিতা জনকাদয়ঃ॥"

ইহার অর্থ এই ঃ—

যে কর্ম্ম করিতে হয় তাহা অনাসক্ত হইয়া করিবে। আসক্তি শূন্য হইয়া কর্ম্ম করিলে কর্ত্তাপুরুষ পরম পদ প্রাপ্ত হন। জনকাদি রাজর্ষিরা কর্ম্ম দ্বারাই সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

গীতার এই সকল উপদেশের মাতৃদুগ্ধে সাধকের জীবন পরিগঠিত হইলে, তাঁহার অন্তরাকাশে সংশয় এবং কুসংস্কারের মেঘ কাটিয়া গিয়া

ব্রহ্মজ্ঞান আবির্ভূত হয়; তাঁহার মনোরাজ্য হইতে বিষয়কামনার দলবল দূরীভূত হইয়া গিয়া ব্রহ্মানন্দ আবির্ভূত হয়, এবং তাঁহার জীবন যাত্রা পথে স্বার্থপরতার কণ্টকাকীর্ণ বনজঙ্গল উন্মূলিত হইয়া গিয়া সর্ব্বলোকের হিতানুষ্ঠানপরতা আবির্ভূত হয়; আর তাহা যখন হয়, তখনই সাধক জীবন্মুক্ত হ'ন।

গীতাপুস্তকে মুক্তি বা মোক্ষ শব্দ নাই বলিলেই হয়, কিন্তু ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ শব্দ যেখানে সেখানে ছড়ানো রহিয়াছে। গীতার যে-যে স্থানে ব্রহ্মনির্ব্বাণ-শব্দের উল্লেখ আছে, সেই সেই স্থানের শ্লোকের মর্ম্মের ভিতরে প্রবেশ করিলে এটা বেস্ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, শাস্ত্রকার মহর্ষি বলিতে চাহিতেছেন আর কিছু না— যুবরাজের পিতৃবিয়োগ হইলে তাঁহার পূর্ব্বাধিকৃত যৌবরাজ্য যেমন আপনা হইতেই উত্তরাধিকৃত সাক্ষাৎ রাজ্যে পরিণত হয়, তেমনি জীবন্মুক্ত ব্যক্তির দেহত্যাগ হইলে, অথবা দেহত্যাগের পূর্ব্বে প্রাক্তন কর্ম্মের বাসনা-সংস্কারাদি নিঃশেষে ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার প্রযত্নার্জ্জিত জীবন্মুক্তিই অযত্ন-সুলভ ব্রহ্মনির্ব্বাণে পরিণত হয়। শাস্ত্রকার মহর্ষিদেবের মতে—জীবন্মুক্তি কেমন সহজে—কেমন নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে—ব্রহ্মনির্ব্বাণে পরিণত হয়, তাহার একটি সেরা নমুনা গীতা-শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—প্রণিধান কর:—

গীতা-শাস্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সর্ব্বশেষের দুইটি শ্লোকে বলা হইয়াছে—

"বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তি মধিগচ্ছতি॥
এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণ মৃচ্ছতি॥"

ইহার অর্থ এই :—[শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন]

যে সাধক সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করিয়া—স্পৃহাশূন্য হইয়া, স্বার্থশূন্য হইয়া, অহঙ্কারশূন্য হইয়া বিচরণ করেন, তিনি শান্তিলাভ করেন। ইহারই নাম পার্থ, ব্রাহ্মী স্থিতি। এ স্থিতি যিনি প্রাপ্ত হ'ন—সংসারের মায়ামোহ আর তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখিতে পারে না। অন্তকালেও এই স্থিতিতে ভর দিয়া থাকিয়া সাধক ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হ'ন।"

বলা হইয়াছে "যে সাধক ব্রাহ্মী স্থিতি প্রাপ্ত হ'ন (অর্থাৎ ব্রহ্মে স্থিত হইয়া—স্পৃহাশূন্য, স্বার্থশূন্য এবং অহঙ্কারশূন্য হইয়া বিচরণ করেন) তিনি শান্তিলাভ করেন ; সংসারের মায়ামোহ, আর তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখিতে পারে না।" ইহাতেই প্রকারান্তরে বলা হইতেছে যে, সে সাধক জীবন্মুক্ত। ইহার অব্যবহিত পরেই বলা হইয়াছে "অন্তকালেও এই স্থিতিতে ভর দিয়া থাকিয়া সাধক ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হ'ন।" ইহাতে স্পষ্ট বুঝাইতেছে যে, বৃদ্ধ পিতার দেহত্যাগ হইলে যুবরাজ যেমন যৌবরাজ্যের আধিপত্যে ভর দিয়া থাকিয়া উত্তরাধিকৃত রাজ্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় হ'ন, তেমনি, জীবন্মুক্ত পুরুষ ব্রাহ্মীস্থিতিতে ভর দিয়া থাকিয়া অন্তকালে ব্রহ্মনির্ব্বাণের কূলে উপনীত হ'ন। তবেই হইতেছে যে, রাজকুমারের যেমন পূর্ব্বাধিকৃত যৌবরাজ্যই উত্তরাধিকৃত পৈতৃক রাজ্য ; সাধকের তেমনি জীবৎকালের জীবন্মুক্তিই অন্তকালের ব্রহ্মনির্ব্বাণ-মুক্তি।

প্রশ্ন॥ আমি সোজাসুজি এইরূপ বুঝি যে, নির্ব্বাণই ব্রহ্মনির্ব্বাণের সারসর্ব্বস্ব। এ কথা যদিই বা সত্য হয় যে, গীতা-শাস্ত্রের কোনো স্থানেই কৈবল্য মুক্তির উল্লেখ নাই, কিন্তু তাহাতে এরূপ প্রমাণ হইতেছে না যে, ব্রহ্মনির্ব্বাণ—কৈবল্য-ছাড়া আর কিছু।

ফল কথা এই যে, সাংখ্যদর্শনের মতানুমোদিত কৈবল্য মুক্তিও যেমন, আর, গীতাশাস্ত্রের মতানুমোদিত ব্রহ্মনির্ব্বাণও তেমনি, দুইই মহানির্ব্বাণেরই আর এক নাম। দুয়ের মধ্যে প্রভেদ যে কোন্‌-খানটায় তাহা আমি খুঁজিয়া পাইতেছি না।

উত্তর॥ ব্রহ্মনির্ব্বাণ শব্দের অর্থ তুমি যদি এইরূপ বুঝিয়া থাকো যে, নির্ব্বাণই ব্রহ্মনির্ব্বাণের সারসর্ব্বস্ব, তবে তাহার জন্য গীতাশাস্ত্র কোনো অংশেই দায়ী নহে। তাহা দূরে থাকুক—এইমাত্র তোমাকে আমি গীতার যে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম, তাহাতে স্পষ্টই বুঝাইতেছে যে, ব্রাহ্মীস্থিতিই ব্রহ্মনির্ব্বাণের সার-সর্ব্বস্ব। এ বিষয় লইয়া তোমার সহিত বাদানুবাদের কোনো প্রয়োজন দেখি-তেছি না। আমার বিবেচনায়—ব্রহ্মনির্ব্বাণ কিসের নির্ব্বাণ এবং কিসের নির্ব্বাণ নহে—তাহা গীতা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখানোই তোমার ভুল ভাঙ্গিয়া দিবার খুব সহজ উপায়; অতএব তাহাতেই এক্ষণে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

৫ম অধ্যায় ২৪-২৫-২৬শ শ্লোক।

"যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি॥
লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণং ঋষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতেরতাঃ॥
কামক্রোধবিমুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাং।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাং॥"

ইহার অর্থ এই:—

(১)

অন্তরাত্মাতেই যাঁহার সুখ, অন্তরাত্মাতেই যাঁহার রতি, অন্ত-

রাত্মাই যাঁহার জ্ঞানের আলোক, সেই ব্রহ্মভাবাপন্ন যোগী ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হ'ন।

(২)

ব্রহ্মনির্ব্বাণ লভেন সেই সকল ঋষি-শ্রেণীর লোক যাঁহারা ক্ষীণ-পাপ, সংশয়শূন্য, সংযতাত্মা এবং সর্ব্বভূতহিতে রত।

(৩)

কামক্রোধ-বিমুক্ত সংযতচিত্ত আত্মবিৎ যতীদিগের হাতের কাছে ব্রহ্মনির্ব্বাণ বর্ত্তমান।

উদ্ধৃত শ্লোক-তিনটির প্রথমটিতে এই যে বলা হইয়াছে "অন্তরাত্মাতেই যাঁহার সুখ, অন্তরাত্মাতেই যাঁহার রতি, অন্তরাত্মাই যাঁহার জ্ঞানের আলোক, সেই ব্রহ্মভাবাপন্ন যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হ'ন" ইহাতে বুঝাইতেছে এই যে, অন্তরাত্মাতে যে প্রকার সুখের আস্বাদ পাওয়া যায় সেই সুবিমল ব্রহ্মানন্দ, আর, অন্তরাত্মা যে প্রকার জ্ঞানের জ্যোতিষ্কেন্দ্র সেই অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান, এ দুয়ের কোনোটি এক মুহূর্ত্তও ব্রহ্মনির্ব্বাণের সঙ্গ ছাড়ে না তবেই হইতেছে যে, ব্রহ্মানন্দ এবং ব্রহ্মজ্ঞানই ব্রহ্মনির্ব্বাণের ডা'ন হাত বাঁ হাত।

দ্বিতীয় শ্লোকটিতে এই যে বলা হইয়াছে "ব্রহ্মনির্ব্বাণ লভেন সেই সকল ঋষিশ্রেণীর লোক—যাঁহারা ক্ষীণপাপ, সংশয়শূন্য, এবং সর্ব্বভূত-হিতে রত" ইহাতে বুঝাইতেছে এই যে, ব্রহ্মনির্ব্বাণ-প্রাপ্ত মুক্ত পুরুষের অন্তরে—নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইতে, কেবল পাপ, সংশয়, ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য এবং হিংসাদ্বেষ প্রভৃতি দুষ্প্রবৃত্তি সকল নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, তা বই, সর্ব্বভূতের হিতকারিতা চিত্তের নির্ম্মলতা এবং সংশয়-শূন্য ব্রহ্মজ্ঞান নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় না।

তৃতীয় শ্লোকটিতে এই যে বলা হইয়াছে "কাম-ক্রোধবিমুক্ত

সংযতচিত্ত আত্মবিৎ যতীদিগের হাতের কাছে ব্রহ্মনির্ব্বাণ বর্ত্তমান, ইহাতে বুঝাইতেছে এই যে, ব্রহ্মনির্ব্বাণ কেবল কাম ক্রোধ লোভ মোহ প্রভৃতি আলেয়ার দলবল-গুলার নির্ব্বাণ; তা বই, তাহা আত্ম-জ্ঞানের নির্ব্বাণ নহে।

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, গীতা পুস্তকের যেস্থানেই যখন ব্রহ্মনির্ব্বাণের কথা প্রসঙ্গক্রমে আসিয়া পড়িয়াছে, সেইস্থানেই—জ্ঞান, আনন্দ, জগতের হিতানুষ্ঠান প্রভৃতি আত্মার মুখ্য ধর্ম্মগুলির চতুর্দ্দিকে মন্ত্রপূত গণ্ডির ঘের দিয়া সেগুলিকে নির্ব্বাণের আক্রমণ হইতে সাবধানে আগ্‌লিয়া রাখা হইয়াছে।

ব্রহ্মনির্ব্বাণ-সম্বন্ধে গীতাকার-মহর্ষিদেবের মর্ম্মগত অভিপ্রায় যে কি, তাহার সন্ধান পাইতে হইলে তিনটি বিষয় পরে পরে দ্রষ্টব্য।

প্রথম দ্রষ্টব্য।

আত্মার এই যে তিনটি স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম—জ্ঞান, আনন্দ এবং বর্ত্তিয়া থাকিবার ইচ্ছা বা কুশলেচ্ছা, এ তিনটির অপরিপক্ক অবস্থায় তিনটিই স্ব স্ব বিপরীত ধর্ম্মের সহিত ন্যূনাধিক পরিমাণে জড়ানো থাকে; জ্ঞান—সংশয় এবং কুসংস্কারের সহিত জড়ানো থাকে, আনন্দ—বিষয়তৃষ্ণার সহিত জড়ানো থাকে, কুশলেচ্ছা—হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি অসৎপ্রবৃত্তির সহিত জড়ানো থাকে।

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য।

সাধকের আত্মপ্রভাবে জ্ঞানের সংস্রব হইতে সংশয় এবং কুসংস্কার অপসারিত হইলে, ঈশ্বরপ্রসাদে সেই জায়গায় ব্রহ্মজ্ঞান আবির্ভূত হয়; আত্মপ্রভাবে আনন্দের সংস্রব হইতে বিষয় তৃষ্ণা অপসারিত হইলে, ঈশ্বরপ্রসাদে সেই জায়গায় সুবিমল সদানন্দ (সংক্ষেপে—ব্রহ্মানন্দ) আবির্ভূত হয়; আত্মপ্রভাবে কুশলেচ্ছা হইতে হিংসাদ্বেষাদি

দুষ্প্রবৃত্তি-সকল অপসারিত হইলে, ঈশ্বর-প্রসাদে সেই জায়গায় মঙ্গলকামনা এবং মঙ্গল চেষ্টা আবির্ভূত হয়।

তৃতীয় দ্রষ্টব্য।

এইরূপ ঈশ্বরপ্রসাদ-লব্ধ ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মানন্দ এবং মঙ্গলপরায়ণতার ত্রিবেণীসঙ্গম জীবন্মুক্তিরও যেমন, আর, ব্রহ্মনির্ব্বাণেরও তেমনি, উভয়েরই সার-সর্ব্বস্ব।

উপরি উদ্ধৃত গীতার শ্লোকগুলি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া দেখিয়া আমি যেরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি তাহা স্পষ্ট করিয়া ভাঙিয়া বলিলাম। মন্দ নহে রহস্য—তুমি যেখানে দেখিতেছ নির্ব্বাণের নৈশ অন্ধকার, আমি সেখানে দেখিতেছি আত্মজ্ঞানের সূর্য্যালোক!

প্রশ্ন॥ একটা কিন্তু তুমি দেখিতেছ না—এটা দেখিতেছ না যে, সকল শাস্ত্রই একবাক্যে বলে যে, ত্রিগুণের বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়ার নামই মুক্তি; আর, সেইজন্য ত্রিগুণের অন্তর্ভুক্ত তিন গুণের কোনোটিরই কোনো ধর্ম্ম মুক্তির ত্রিসীমার মধ্যে প্রবেশ পাইতে পারে না;—রজোগুণের এই যে-দুইটি ধর্ম্ম—দুঃখ এবং অশান্তি আর, তমোগুণের এই যে-দুইটি ধর্ম্ম—জড়তা এবং মোহ, এ তো প্রবেশ-পাইতে পারেই না; তা ছাড়া, সত্ত্বগুণেরও কোনো ধর্ম্ম মুক্তিরাজ্যে প্রবেশ-পাইতে পারে না; সুখও প্রবেশ-পাইতে পারে না—জ্ঞানও প্রবেশ-পাইতে পারে না। শাস্ত্রকার মহর্ষিদেব স্বয়ং কি বলিতেছেন? বলিতেছেন তিনি—

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিন মব্যয়ং॥

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশক মনাময়ং।
সুখসঙ্গেণ বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেণ চানঘ॥"

ইহার অর্থ এই :—

প্রকৃতি-সম্ভূত এই যে তিনটি গুণ—সত্ত্ব রজ তম, তিনটিই অব্যয় আত্মাকে দেহে বাঁধিয়া রাখে। তাহার মধ্যে যেটি স্বীয় নির্ম্মল স্বভাবের গুণে প্রকাশক এবং সুখাত্মক সেই প্রথম গুণটি, কিনা সত্ত্বগুণ, আত্মাকে সুখের-আর-জ্ঞানের সঙ্গসূত্রে জড়াইয়া দেহে বাঁধিয়া রাখে।

এই যে বলা হইয়াছে "সত্ত্বগুণ আত্মাকে সুখের-আর-জ্ঞানের সঙ্গসূত্রে জড়াইয়া দেহে বাঁধিয়া রাখে" ইহাতে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, সুখই বা কি, আর জ্ঞানই বা কি, দুইই আত্মার বন্ধন শৃঙ্খল; আর, তাহা হইতেই আসিতেছে যে, ও-দুইটির কোনোটিই মুক্তির ত্রিসীমা স্পর্শ করিতে পারে না।

উত্তর॥ চর্ম্মচক্ষু মেলিয়া গীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে এটা যেমন তুমি দেখিয়াছ যে, সত্ত্বগুণ আত্মাকে সুখের-আর-জ্ঞানের সঙ্গসূত্রে জড়াইয়া দেহে বাঁধিয়া রাখে; জ্ঞানচক্ষু মেলিয়া এটাও তেম্নি তোমার দেখা উচিত যে, সে যে সত্ত্বগুণ—তাহা ত্রিগুণের কোটার অন্তর্ভুক্ত মিশ্রসত্ত্ব বই ত্রিগুণের কোটার মূল-প্রদেশের শুদ্ধসত্ত্ব নহে। দুয়ের মধ্যে প্রভেদ বড় যে কম তাহা নহে;—ত্রিগুণের কোটার মূল-প্রদেশের বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ একেবারেই রজস্তমোগুণের সঙ্গবর্জ্জিত; পক্ষান্তরে, ত্রিগুণের কোটার ভিতর অঞ্চলের মিশ্রসত্ত্বগুণ রজস্তমোগুণের সহিত মাথামাথিভাবে সংশ্লিষ্ট। এখানে পাঁচটি বিষয় দ্রষ্টব্য।

প্রথম দ্রষ্টব্য।

সত্ত্বগুণের মুখ্য ধর্ম্ম দুইটি—সুখ এবং জ্ঞান।

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য।

রজস্তমোগুণের সঙ্গবর্জ্জিত শুদ্ধ সত্ত্বের বা অমিশ্র সত্ত্বগুণের মুখ্য-ধর্ম্মও দুইটি (১) অমিশ্র জ্ঞান কিনা অজ্ঞান এবং জড়তার সঙ্গবর্জ্জিত বিশুদ্ধ জ্ঞান, অথবা যাহা একই কথা—অপরোক্ষ আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্ম-জ্ঞান ; এবং (২) অমিশ্র সুখ কিনা দুঃখ এবং অশান্তির সঙ্গবর্জ্জিত সুবিমল আনন্দ, সংক্ষেপে—ব্রহ্মানন্দ।

তৃতীয় দ্রষ্টব্য।

রজস্তমোগুণের সঙ্গাশ্লিষ্ট মিশ্রসত্ত্বগুণের মুখ্য ধর্ম্মও দুইটি—(১) মিশ্রজ্ঞান কিনা অজ্ঞান-এবং-জড়তার সঙ্গাশ্লিষ্ট বিষয়জ্ঞান বা বিষয়-বুদ্ধি, (২) মিশ্রসুখ কিনা দুঃখ-এবং-অশান্তির সঙ্গাশ্লিষ্ট বিষয়সুখ।

চতুর্থ দ্রষ্টব্য।

সকল শাস্ত্রেই বলে যে, মিশ্রসত্ত্বগুণের এই যে দুইটি ধর্ম্ম—(১) বিষয়জ্ঞান বা স্বার্থপরায়ণ কর্ত্তৃত্বাভিমানী বিষয়-বুদ্ধি, এবং (২) অনিত্য বিষয়-সুখ, এ দুইটি মিশ্র সাত্ত্বিক-ধর্ম্ম আত্মার বন্ধন শৃঙ্খল তাহাতে আর ভুল নাই ; তবে কিনা উহা রাজসিক পাপপ্রবৃত্তি এবং তামসিক জড়তার ন্যায় মারাত্মক-গোচের বন্ধনশৃঙ্খল নহে। রূপকচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে, দ্বেষহিংসাময়ী রাজসিক পাপপ্রবৃত্তি নাগপাশের বন্ধন ; অজ্ঞানময়ী তামসিক জড়তা লৌহশৃঙ্খল ; আর, মিশ্রসত্ত্বের ঐ যে দুইটি ধর্ম্ম—বিষয়বুদ্ধি এবং বিষয়সুখ, উহা স্বর্ণশৃঙ্খল। পক্ষান্তরে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের এই যে দুইটি ধর্ম্ম—(১) অপরোক্ষ আত্মজ্ঞান এবং (২) সুবিমল সদানন্দ, এ দুইটি বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক ধর্ম্ম আত্মার বন্ধনশৃঙ্খল হওয়া দূরে থাকুক—উহা মুক্তির নিদান।

পঞ্চম দ্রষ্টব্য।

দৃশ্যমান জগতে বিশুদ্ধ জল কুত্রাপি নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

গঙ্গার জল ন্যূনাধিক পরিমাণে গৈরিক মৃত্তিকা মিশ্রিত, সমুদ্রের জল লবণাক্ত, সরোবরের জল হংসাদি জলচর জন্তুর মলমূত্রে ন্যূনাধিক পরিমাণে কলুষিত, এমন কি জলীয় বাষ্পও বিভিন্নজাতীয় নানা-প্রকার বাষ্পের সহিত মাখামাখিভাবে সংশ্লিষ্ট। দর্শনবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে,দৃশ্যমান জগতের চতুঃসীমার মধ্যে জলমাত্রই যেমন মিশ্রধর্ম্মী, ত্রিগুণের কোটার চতুঃসীমার মধ্যে সত্বগুণ-মাত্রই তেমনি মিশ্রসত্ব। কিন্তু তা বলিয়া কেহ যদি মনে করেন যে, বিশুদ্ধ জল বলিয়া একটা কোনো পদার্থ মূলেই নাই ; তবে সেটা তাঁহার বড়ই ভুল। তাঁহার জানা উচিত যে, দৃশ্যমান জগতে যেখানে যতপ্রকার জল আছে—বিশুদ্ধ জল তাহাদের সকলেরই মূল উপাদান ;—ত্রিগুণের কোটার ভিতরে যেখানে যত সত্বগুণ আছে—সমস্তেরই মূল উপাদান শুদ্ধসত্ব। অতএব এ কথা যেমন সত্য যে, ত্রিগুণের কোটার ভিতর অঞ্চলে মিশ্রসত্ব বই শুদ্ধসত্ব স্থান পাইতে পারে না ; এ কথাও তেমনি সত্য যে, ত্রিগুণের কোটার মূল-প্রদেশে শুদ্ধসত্ব চিরবর্ত্তমান। এখন দেখিতে হইবে এই যে, সকলেই জানে গঙ্গাজল মাত্রই ন্যূনাধিক পরিমাণে ঘোলা জল, কেন না ঝর্ঝরে পরিষ্কার গঙ্গাজলেও একটু আধটু গৈরিকমৃত্তিকা মিশ্রিত আছেই আছে ; অথচ বিচারালয়ে কোনো ব্যক্তি কোনো বিষয়ে সাক্ষ্য-দান করিতে প্রবৃত্ত হইলে বিচারপতি তাঁহাকে শুধুকেবল বলেন "গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া সত্য কথা বলো", তা বই, এরূপ বলেন না যে, "ঘোলা গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া সত্য কথা বলো।" তেমনি, আমাদের দেশের পণ্ডিত মহলে এ কথা না জানে এমন লোকই নাই যে, ত্রিগুণের কোটার অন্তর্ভুক্ত সত্বগুণ মাত্রই মিশ্রসত্ব ; অথচ, গীতাকার মহর্ষি শুধু কেবল বলিলেন যে, "ত্রিগুণের অন্তর্ভুক্ত সত্বগুণ আত্মাকে সুখ আর জ্ঞানের সঙ্গসূত্রে

জড়াইয়া দেহে বাঁধিয়া রাখে"। অনায়াসে তিনি বলিতে পারিতেন যে, "ত্রিগুণের অন্তর্ভুক্ত মিশ্রসত্ত্ব আত্মাকে বিষয় সুখ আর বিষয় বুদ্ধির সঙ্গসূত্রে জড়াইয়া দেহে বাঁধিয়া রাখে" কিন্তু তাহা তিনি বলেন নাই। কেন তিনি তাহা বলেন নাই? কেন যে, তিনি তাহা বলেন নাই, তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে। শ্রাবণ মাসে গঙ্গায় ঢল নাবিয়া সারা গঙ্গা যখন বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, তখন "গঙ্গা-জলে স্নান করিলাম" বলিলেই যেমন ঘোলা গঙ্গাজলে স্নান করিলাম" ছাড়া আর কিছুই বুঝাইতে পারে না; তেমনি, "ত্রিগুণের অন্তর্ভুক্ত সত্ত্বগুণ" বলিলেই মিশ্রসত্ত্ব ছাড়া আর কিছুই বুঝাইতে পারে না, সুতরাং তাহাকে মিশ্রসত্ত্ব বলা নিতান্তই বাড়া'র ভাগ বিবেচনায়—গীতাকার মহর্ষি উহাকে শুধু কেবল সত্ত্বগুণ মাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। সত্ত্বগুণ যেখানে মিশ্রসত্ত্ব বই শুদ্ধসত্ত্ব হইতে পারে না, সাত্ত্বিক জ্ঞান এবং সাত্ত্বিক সুখ যে, সেখানে, মিশ্র জ্ঞান এবং মিশ্র সুখ হইবে, অথবা, যাহা একই কথা—বিষয় বুদ্ধি এবং বিষয় সুখ হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? তাহা তো হইবারই কথা। এখন বক্তব্য এই যে, ত্রিগুণের কোটার অন্তর্ভুক্ত মিশ্রসত্ত্ব যেমন আত্মার বন্ধন শৃঙ্খল, তেমনি মিশ্রসত্ত্বের ধর্ম্মদুটিও আত্মার বন্ধন-শৃঙ্খল;—বিষয় বুদ্ধিও যেমন, বিষয় সুখও তেমনি, দুইই আত্মার বন্ধন-শৃঙ্খল। কিন্তু শুদ্ধসত্ত্ব তো আর ত্রিগুণের কোটার অন্তর্ভুক্ত মিশ্রসত্ত্ব নহে। শুদ্ধসত্ত্ব ত্রিগুণের কোটার সীমা ছাড়াইয়া তাহার ভিত্তিমূল প্রদেশে অবস্থান করে—ইহা আমরা একটু পূর্ব্বে দেখিয়াছি। অতএব এটা স্থির যে, পদ্মপত্র যেমন জল-বিন্দুর আধার হইয়াও জলবিন্দু কর্ত্তৃক সংস্পৃষ্ট হয় না; শুদ্ধসত্ত্ব তেমনি ত্রিগুণের মূলাধার হইয়াও ত্রিগুণ দ্বারা সংস্পৃষ্ট হয় না।

শাস্ত্রে শুধু বলে এই যে, ত্রিগুণের কোটার অন্তর্ভুক্ত সত্ত্বরজস্তমোগুণ আত্মার বন্ধন-শৃঙ্খল ; তা বই, এ কথা বলে না যে, ত্রিগুণের কোটার ভিত্তি মূল-প্রদেশের শুদ্ধ সত্ত্ব আত্মার বন্ধন-শৃঙ্খল। পঞ্চদশী নামক প্রসিদ্ধ বেদান্ত-পুস্তকের গ্রন্থকার কি বলিতেছেন শ্রবণ কর :—

"চিদানন্দময়ব্রহ্ম প্রতিবিম্ব সমন্বিতা
তমোরজঃ সত্ত্ব গুণা প্রকৃতিঃ ; দ্বিবিধা চ সা॥
সত্ত্ব শুদ্ধ্য বিশুদ্ধিভ্যাং মায়াবিদ্যে চ তে মতে ॥
মায়াবিম্বো বশীকৃত্য তাংস্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ।
অবিদ্যাবশগস্ত্বন্যঃ (অর্থাৎ জীবাত্মা)॥"

ইহার অর্থ এই :—

চিদানন্দ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব-সমন্বিতা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি দুই প্রকার—

(১) শুদ্ধসত্ত্বময়ী প্রকৃতি—যাহার আরেক নাম মায়া, আর, (২) মলিন সত্ত্বময়ী প্রকৃতি—যাহার আর এক নাম অবিদ্যা। সেই যে শুদ্ধসত্ত্বময়ী প্রকৃতি—মায়া, তিনি আপনার অধিষ্ঠাতা-পুরুষের বশবর্ত্তিনী। তাঁ[illegible]তা-পুরুষ কে ? না সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর। আর, এই যে ম[illegible]কৃতি—অবিদ্যা, ইনি আপনার অধিষ্ঠাতা পুরুষকে অধী[illegible]লে বাঁধিয়া রাখেন। ইহার অধিষ্ঠাতা কে ? না জীবাত্মা।

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগের মতে মলিন-সত্ত্বই (অর্থাৎ ত্রিগুণের কোটার অন্তর্ভুক্ত মিশ্রসত্ত্ব) স্বীয় অধিষ্ঠাতা'র (কিনা জীবাত্মার) বন্ধন-শৃঙ্খল ; তা বই, শুদ্ধ সত্ত্ব (অর্থাৎ ত্রিগুণের কোটার ভিত্তিমূল-প্রদেশের খাঁটি সত্ত্বগুণ) স্বীয় অধিষ্ঠাতার (কিনা

শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ পরমাত্মার) বন্ধন শৃঙ্খল হওয়া দূরে থাকুক, তাহা সর্ব্বতোভাবে পরমাত্মার বশবর্ত্তী !

অতএব এটা স্থির যে, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগের মতে শুদ্ধসত্ত্ব আত্মার বন্ধন-শৃঙ্খল নহে ; আর তাহা হইতেই আসিতেছে যে, শুদ্ধ সত্ত্বের এই যে দুইটি মুখ্য ধর্ম্ম—অপরোক্ষ আত্মজ্ঞান এবং সুবিমল সদানন্দ, এ দুইটির কোনটিই আত্মার বন্ধন শৃঙ্খল নহে ।

প্রশ্ন ॥ শুদ্ধ সত্ত্বেরই বা পরিচয়লক্ষণ কি, আর, মিশ্র সত্ত্বেরই বা পরিচয় লক্ষণ কি ?

উত্তর ॥ আমি অনতিপূর্ব্বে বলিয়াছি এবং এখনো বলিতেছি যে,

(১) সত্ত্বগুণের মুখ্যধর্ম্ম দুইটি—

(১) জ্ঞান এবং (২) সুখ । মিশ্রসত্ত্বের মুখ্য ধর্ম্মও দুইটি—[১] বিষয়-বুদ্ধি এবং [২] বিষয় সুখ। শুদ্ধ সত্ত্বের মুখ্য-ধর্ম্মও দুইটি—[১] অপরোক্ষ আত্মানুভূতি এবং [২] সুবিমল সদানন্দ ।

প্রশ্ন ॥ তোমার যাহা মন্তব্য কথা তাহাই তুমি পূর্ব্বেও বলিয়াছ—এখনও বলিতেছ । কিন্তু শাস্ত্রে কি বলে ?

উত্তর ॥ শাস্ত্রেও তাহাই বলে। সত্য কি মিথ্যা—তোমার জিজ্ঞাস্য বিষয়টির সম্বন্ধে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য কি বলিয়াছেন তাহা তোমাকে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি, তাহা হইলেই তোমার মনের সমস্ত ধন্দ মিটিয়া যাইবে ।

শুদ্ধ সত্ত্বের তিনি লক্ষণ-নির্দ্দেশ করিতেছেন এইরূপ :—

"বিশুদ্ধ সত্ত্বস্য গুণাঃ প্রসাদঃ
স্বাত্মানুভূতিঃ পরমা প্রশান্তিঃ ।

তৃপ্তিঃ প্রহর্ষঃ পরমাত্মনিষ্ঠা
যয়া সদানন্দ রসং সমৃচ্ছতি॥"

[বিবেক চূড়ামণি ১২১ শ্লোক]

ইহার অর্থ এই :—

বিশুদ্ধ সত্ত্বের ধর্ম্ম এই গুলি ;—প্রসাদ (কিনা প্রসন্নতা), আত্মানুভূতি, পরমা প্রশান্তি, তৃপ্তি, পুলক, আর পরমাত্মাতে সেইমতো নিষ্ঠা যাহাতে করিয়া সদানন্দের উৎস খুলিয়া যায়।

এই শ্লোকটির মধ্য হইতে সার সঙ্কলন করিয়া পাইতেছি এই যে, শুদ্ধ সত্ত্বের ধর্ম্ম প্রধানতঃ দুইটি—[১] অপরোক্ষ আত্মানুভূতি বা আত্মজ্ঞান এবং [২] পরমাত্মাতে স্থিতিজনিত সদানন্দ।

মিশ্রসত্ত্বের তিনি পরিচয় জ্ঞাপন করিতেছেন এইরূপ :—

"সত্ত্বং বিশুদ্ধং জলবৎ তথাপি
তাভ্যাং * মিলিত্বা সরণায় কল্পতে।
যত্রাত্মবিম্বঃ প্রতিবিম্বিতঃ সন্
প্রকাশয়ত্যর্ক ইবাখিলং জড়ং॥
মিশ্রস্য সত্তস্য ভবন্তি ধর্ম্মাঃ
অমানিত্বাদ্যা নিয়মা যমাদ্যাঃ।
শ্রদ্ধা চ ভক্তিশ্চ মুমুক্ষুতা চ
দৈবী চ সম্পত্তি রসন্নিবৃত্তিঃ॥"

[বিবেক চূড়ামণি ১১৯।১২০ শ্লোক]

---

* এই শ্লোকটির অব্যবহিত পূর্ব্বের গোটাছয়েক শ্লোকে রজস্তমোগুণের পরিচয় জ্ঞাপন করা হইয়াছে। অতএব এখানে, "তাভ্যাং"—রজস্তমোভ্যাং, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

ইহার অর্থ এই :—

সত্ত্বগুণ যদি চ জলের ন্যায় নির্ম্মল-স্বভাব তথাপি অপর-দুটার সহিত (অর্থাৎ রজস্তমোগুণের সহিত) মিলিয়া বন্ধনের হেতুভূত হয়। এইরকমের সত্ত্বগুণে (অর্থাৎ রজস্তমোগুণের সঙ্গাশ্লিষ্ট মিশ্র সত্ত্বগুণে) আত্মা প্রতিবিম্বিত হইয়া সূর্য্যের ন্যায় নিখিল জড়বস্তু প্রকাশ করে। ☞ [ইহাতে বুঝাইতেছে এই যে, জড়প্রকাশক বহির্ম্মুখী বিষয়জ্ঞান ভিন্ন অপরোক্ষ আত্মানুভূতি মিশ্রসত্ত্বের ধর্ম্ম নহে। অপরোক্ষ আত্মানুভূতি যে, শুদ্ধসত্ত্বেরই ধর্ম্ম তাহা অনতিপূর্ব্বে বিবেক চূড়ামণি হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখানো হইয়াছে।] মিশ্র সত্ত্বের লক্ষণ এইগুলি :—স্বমানিতা (অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাভিমানিতা), যমনিয়মাদি ব্রতপরায়ণতা, শ্রদ্ধাভক্তি, মুমুক্ষুতা (অর্থাৎ মুক্তির অভিলাষিতা), দৈবী সম্পত্তি (অর্থাৎ শমদমাদি সাধন সম্পত্তি), অসন্নিবৃত্তি [অর্থাৎ অসৎ পদার্থ হইতে কিনা অনিত্য বস্তু হইতে সরিয়া দাঁড়ানো]।

ইহার টীকা।

উদ্ধৃত শ্লোক দুইটির প্রথমটির প্রথমার্দ্ধ হইতে পাইতেছি যে, রজস্তমোগুণের সঙ্গাশ্লিষ্ট মিশ্রসত্ত্বগুণ আত্মার একপ্রকার বন্ধন শৃঙ্খল। আবার ঐ প্রথম শ্লোকটির শেষার্দ্ধ হইতে পাইতেছি যে, আত্মজ্ঞানের প্রতিবিম্বরূপী বিষয়জ্ঞানই মিশ্রসত্ত্বের ধর্ম্ম; তা বই—সাক্ষাৎ আত্মজ্ঞান মিশ্রসত্ত্বের ধর্ম্ম নহে;—সাক্ষাৎ আত্মানুভূতি শুদ্ধ সত্ত্বেরই ধর্ম্ম। (অপরোক্ষ আত্মানুভূতি যে শুদ্ধ সত্ত্বের ধর্ম্ম তাহা একটু পূর্ব্বে বিবেক চূড়ামণি হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখানো হইয়াছে)। উদ্ধৃত শ্লোকদুইটির দ্বিতীয়টির মধ্য হইতে পাইতেছি—যে, মিশ্রসত্ত্বগুণের লক্ষণ গুলির সব কটাই মুমুক্ষু সাধকের সাধনাবস্থার লক্ষণ, তা বই, তাহার

একটিও মুক্ত পুরুষের সিদ্ধাবস্থার লক্ষণ নহে। মিশ্রসত্ত্বের লক্ষণগুলির গোড়ার বৃত্তান্ত এইরূপ:—মিশ্রসত্ত্বের অবয়বীভূত বহির্মুখী জ্ঞানে একদিকে যেমন ভোগ্যবিষয় সকল প্রকাশ পায়, আর একদিকে তেমনি কোনো-না-কোনো ঘটনা গতিকে ভোগ্যবিষয় সকলের অনিত্যতা-দোষ সেই সঙ্গে ব্যক্ত হইয়া পড়ে; আর, তাহা যখন হয়, তখন দ্রষ্টা পুরুষ অসতের প্রতি (অর্থাৎ অনিত্য বস্তুর প্রতি) বীতরাগ হ'ন। মিশ্রসত্ত্বের একটি লক্ষণ তাই অসন্নিবৃত্তি। অসতের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিলেই মুক্তির অভিলাষ জাগিয়া ওঠে; মিশ্র সত্ত্বের আর একটি লক্ষণ তাই মুমুক্ষুতা। মুক্তিকামনা জাগিয়া উঠিলে মুক্তির পথপ্রদর্শক সদ্‌গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি জন্মে; মিশ্রসত্ত্বের তৃতীয় আর একটি লক্ষণ তাই শ্রদ্ধাভক্তি। গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি জন্মিলে গুরূপদিষ্ট সাধনের পথে মতিগতি হয়; মিশ্রসত্ত্বের চতুর্থ আর একটি লক্ষণ তাই শমদমাদি এবং যমনিয়মাদির সাধন। সাধক যতদিন পর্য্যন্ত সাধনের ঢেউ কাটিয়া সিদ্ধির কূলে উপনীত না হ'ন, ততদিন পর্য্যন্ত কর্তৃত্বাভিমান তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তির গলা জড়াইয়া ধরিয়া থাকে—এটা'র হাত ছাড়ানো শক্ত; মিশ্রসত্ত্বের পঞ্চম আর একটি লক্ষণ তাই কর্তৃত্বাভিমান। পরিশেষে সাধক যখন মিশ্রসত্ত্বের স্বর্ণশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া শুদ্ধ সত্ত্বের মুক্ত আকাশে সমুত্থান করেন, তখন তিনি ত্রিগুণের কোটার সীমা ছাড়াইয়া উঠিয়া গুণাতীত হন এবং অপরোক্ষ আত্মজ্ঞান সদানন্দ এবং পরমা শান্তি লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত হ'ন। পূর্ব্বে দেখা হইয়াছে যে, বৃদ্ধরাজার দেহত্যাগ হইলে যুবরাজের যৌবরাজ্য যেমন আপনা হইতেই রাজকুমারের স্বাধিকৃত রাজ্য হইয়া দাঁড়ায়, তেমনি জীবন্মুক্ত পুরুষের দেহত্যাগ হইলে, জীবন্মুক্তি আপনা হইতেই ব্রহ্মনির্ব্বাণ পদে অধিরূঢ় হয়। বেদান্তাদি শাস্ত্রের মতে পারত্রিক মুক্তি

যে কিরূপ এবং কতরূপ—আগামী অধিবেশনে তাহার গবেষণায় বিধিমতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে।

অষ্টাদশ অধিবেশন।

প্রশ্ন॥ তুমি এতক্ষণ ধরিয়া যাহা আমাকে বুঝাইলে—কথাগুলি যুক্তিসঙ্গত বটে ; তা ছাড়া, তোমার নিজের কথাগুলিকে তুমি মনোহর শাস্ত্রীয় বেশে সাজাইয়া দাঁড় করাইতেও অনুষ্ঠানের ত্রুটি কর নাই। কিন্তু এত যে তোমার যুক্তিপ্রদর্শনের এবং শাস্ত্রপ্রদর্শনের কৌশল পারিপাট্য—সবই বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইতেছে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের একটি কথার এক-ঝাপটে ! তাঁহার প্রণীত আত্মবোধনামক পুস্তিকায় স্পষ্ট লেখা আছে—

"অজ্ঞানকলুষং জীবং জ্ঞানাভ্যাসাৎ বিনির্ম্মলং ।
কৃত্বা জ্ঞানং স্বয়ং নশ্যেৎ জলং কতকরেণুবৎ ॥"

ইহার অর্থ এই :—

নির্ম্মলীফলের গুঁড়া যেমন জলের সমস্ত মলরাশি নিঃশেষে বিনাশ করিয়া সেই সঙ্গে আপনিও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, জ্ঞান তেমনি জীবের অজ্ঞানকলুষ নিঃশেষে বিনাশ করিয়া সেই সঙ্গে আপনিও বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

ইহার তুমি কি উত্তর দেও ?

উত্তর॥ শঙ্করাচার্য্যের মতো অত বড় একজন পাকা মাঝি জ্ঞান-তরী'কে অজ্ঞান-সমুদ্রের সারাপথ নির্ব্বিঘ্নে পার করাইয়া আনিয়া মোক্ষডাঙায় পৌঁছিবার সম-সম কালে যদি কিনারায় নৌকাডুবি করেন, তবে তাহাতে কী প্রমাণ হয় ? তাহাতে প্রমাণ হয় এই যে, নৌকার তলায় কোনো-না-কোনো স্থানে ছিদ্র আছে। সে ছিদ্র যে, কি, তাহা কাহারো অবিদিত নাই। সে ছিদ্র হচ্চে কঠোর অদ্বৈতবাদ। গীতাশাস্ত্রের কোথাও কিন্তু সেরূপ ছিদ্রও নাই—তাহার

কথাও নাই। এইজন্য বলি যে, শঙ্করাচার্য্যের মতামতের দায় গীতা-শাস্ত্রের স্কন্ধে চাপাইতে যাইবার পূর্ব্বে তোমার উচিত ছিল যুক্তি-বিষয়ে বেদান্তদর্শনের সহিত গীতাশাস্ত্রের কোন জায়গায় মিল এবং কোন্ জায়গায় অমিল তাহা চক্ষু মেলিয়া দেখা। তাহা যখন তুমি দেখিয়াও দেখিতেছ না, তখন আমার কর্ত্তব্য—তোমার সেই উপেক্ষিত বিষয়টিকে যবনিকার আড়াল হইতে বাহির করিয়া আনিয়া তোমার চক্ষের সম্মুখে স্থাপন করা। কেননা আমি দেখিতেছি যে, তাহা যদি আমি না করি তবে কিছুতেই তোমার ভুল ভাঙিবে না। কিন্তু তাহা করিবার পূর্ব্বে—মুক্তিবিষয়ে বেদান্ত-দর্শনের প্রকৃত মতামত কিরূপ তাহার মোট বৃত্তান্তটি সংক্ষেপে জ্ঞাপন করা নিতান্তই আবশ্যক বিবেচনায় আপাতত তাহাতেই প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

বেদান্তদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের পঞ্চদশ সূত্রের শাঙ্কর-ভাষ্যে প্রশ্ন একটী উত্থাপন করা হইয়াছে এই যে,—

"কিং সর্ব্বান্ বিকারালম্বনান্ অবিশেষেণৈব অমানবঃ পুরুষঃ প্রাপয়তি ব্রহ্মলোকং উত কাংশ্চিদেব"

ইহার অর্থ :—

যাঁহারা ঈশ্বরের স্বরূপাতিরিক্ত বিকার (অর্থাৎ ঈশ্বরের কোনো-প্রকার প্রাকৃত আবির্ভাব) অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করেন—সবাই কি তাঁহারা নির্ব্বিশেষে দিব্য পুরুষ কর্ত্তৃক ব্রহ্মলোকে নীত হ'ন অথবা—কেহ বা নীত হ'ন—কেহ বা হ'ন না?

ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে এই যে,—

"প্রতীকালম্বনান্ বর্জ্জয়িত্বা সর্ব্বান্ অন্যান্ বিকারালম্বনান্ নয়তি ব্রহ্মলোকং।"

ইহার অর্থ:—

বিকারালম্বীরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) প্রতীকোপাসক অর্থাৎ প্রতিমাদি-পূজক এবং (২) সগুণব্রহ্মোপাসক। বিকারালম্বী-দিগের মধ্যে যাঁহারা প্রতিমাদি পূজক তাঁহারাই কেবল ব্রহ্মলোকে নীত হ'ন না; পরন্তু যাঁহারা সগুণ ব্রহ্মোপাসক—সকলেই তাঁহারা ব্রহ্মলোকে নীত হ'ন।

ঐ অধ্যায়ের চতুর্থপাদের সপ্তদশ সূত্রের শাঙ্কর-ভাষ্যে আর একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়াছে এই যে,—

"যে সগুণব্রহ্মোপাসনাৎ সহৈব মনসা ঈশ্বরসাযুজ্যং ব্রজন্তি কিং তেষাং নিরবগ্রহং ঐশ্বর্য্যং ভবতি আহোস্বিৎ সাবগ্রহং।"

ইহার অর্থ এই:—

সগুণ ব্রহ্মোপাসনার প্রসাদে যাঁহারা মনকে সঙ্গে লইয়া ঈশ্বর-সাযুজ্য প্রাপ্ত হ'ন, তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য কি সর্ব্বাঙ্গীন অথবা আংশিক?

ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে এই যে,

"জগদুৎপত্ত্যাদিব্যাপারং বর্জ্জয়িত্বা অন্যৎ অণিমাদ্যাত্মকং ঐশ্বর্য্যং মুক্তানাং ভবিতুমর্হতি। জগদ্ব্যাপারস্তু নিত্যসিদ্ধস্যৈব ঈশ্বরস্য।

ইহার অর্থ:—

সৃষ্টিস্থিতি প্রভৃতি জগদ্ব্যাপার ব্যতিরেকে অণিমাদি আর আর যতপ্রকার ঐশ্বর্য্য আছে—সমস্তই মুক্ত-পুরুষে বর্ত্তিতে পারে;—জগদ্ব্যাপার কিন্তু নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরেরই অধিকারায়ত্ত, তদ্ভিন্ন আর কাহারও অধিকারায়ত্ত নহে।

এই অধ্যায়ের উনবিংশ সূত্রের শাঙ্করভাষ্যে লেখে,—

"বিকারাবর্ত্ত্যপি চ নিত্যমুক্তং পারমেশ্বরং রূপং, ন কেবলং

বিকারমাত্রগোচরং সবিতৃমণ্ডলাদ্যধিষ্ঠানং। তথাহ্যস্য দ্বিরূপাং স্থিতিমাহ আম্নায়ঃ। 'তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ!' 'পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।' ন চ তং নির্ব্বিকারং রূপং ইতরালম্বনা প্রাপ্নুবন্তীতি শক্যং বক্তুং। * * * যথৈব দ্বিরূপে পরমেশ্বরে নির্গুণং রূপং অনবাপ্য সগুণে অবতিষ্ঠতে এবং সগুণেঽপি নিরবগ্রহং ঐশ্বর্য্যং অনবাপ্য সাবগ্রহে এব অবতিষ্ঠতে।"

ইহার অর্থ :—

নিত্যমুক্ত পারমেশ্বর (অর্থাৎ পরমেশ্বরীয়) রূপ শুধুই যে কেবল সূর্য্যমণ্ডলাদিতে অধিষ্ঠান প্রভৃতি বিকারের (অর্থাৎ জগদ্ব্যাপারের) সহবর্ত্তী তা তো আর না;—একদিকে যেমন তাহা বিকারের সহবর্ত্তী, আর একদিকে তেমনি তাহা নির্ব্বিকার। বেদে তাই ইহাঁর দুইরূপ স্থিতির উল্লেখ আছে; যেমন—'ইহাঁর মহিমা এতদূর পর্য্যন্ত—মহিমান্বিত পুরুষ তাঁহার মহিমা অপেক্ষা বড়', এই বেদবচনটিতে মহিমাতে স্থিতি এবং স্বরূপে স্থিতি দুইই সূচিত হইতেছে; তথৈব 'ইহাঁর এক পাদ সমস্ত ভূত—ত্রিপাদামৃত দ্যুলোকে' এই আর-একটি শ্রুতি-বচনে জগদ্ব্যাপারের সহবর্ত্তিতা এবং অতিবর্ত্তিতা দুইই সূচিত হইতেছে। এ কথা বলিতে পার না যে, বিকারালম্বীরা (অর্থাৎ যাঁহারা ঈশ্বরের প্রাকৃত আবির্ভাব অবলম্বন করিয়া তাঁহার উপাসনা করেন তাঁহারা) পরমেশ্বরের নির্ব্বিকাররূপে স্থিতি প্রাপ্ত হ'ন। সগুণ ব্রহ্মোপাসকেরা একদিকে যেমন পরমেশ্বরের নির্গুণরূপে স্থান না পাইয়া সগুণরূপে স্থিতি করেন, আর এক দিকে তেমনি তাঁহারা পরমেশ্বরের সর্ব্বাঙ্গীন ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত না হইয়া আংশিক ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হ'ন।

[“সর্ব্বাঙ্গীন ঐশ্বর্য্য” কিনা সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তৃত্ব—“আংশিক ঐশ্বর্য্য” কিনা অণিমা লঘিমাদি অলৌকিক শক্তিসামর্থ্য]।

ঐ অধ্যায়ের ঐ পাদের একবিংশ সূত্রের শঙ্করভাষ্যে তৃতীয় আর-একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়াছে এই যে,

“ইতশ্চ ন নিরঙ্কুশং বিকারালম্বনানাং ঐশ্বর্য্যং যস্মাৎ ভোগমাত্রং এষাং অনাদিসিদ্ধেন ঈশ্বরেণ সমানং ইতি শ্রূয়তে * * * * ‘যথৈতাং দেবতাং সর্ব্বাণি ভূতানি অবন্তি এবং হৈবংবিদং সর্ব্বাণি ভূতানি অবন্তি * * *। নন্বেবং সতি সাতিশয়ত্বাৎ অন্তবত্ত্বং ঐশ্বর্য্যস্য স্যাৎ ততশ্চৈষাং আবৃত্তিঃ প্রসজ্যেত।”

ইহার অর্থঃ—

আর-একটি কারণে মুক্তিপ্রাপ্ত সগুণ ব্রহ্মোপাসকদিগের ঐশ্বর্য্যকে নিরঙ্কুশ বলিতে পারা যায় না অর্থাৎ পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্যের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে পরিপূর্ণ বলিতে পারা যায় না। সে কারণ এই যে, বেদে কেবল বলে—উহঁাদের ঐশ্বর্য্য ঈশ্বরের সহিত ভোগবিষয়েই সমান, তা বই, এরূপ বলে না যে, উহঁাদের ঐশ্বর্য্য ঈশ্বরের সহিত কর্ত্তৃত্বাদি বিষয়েও সমান। তার সাক্ষী ঃ—বেদে আছে ‘সমুদায় ভূত দেবতাকে যেমন রক্ষা করে—উপাসককেও তেমনি রক্ষা করে’ ইত্যাদি। কিন্তু এরূপ ঐশ্বর্য্য যেহেতু ভোগবিষয়ক মাত্র, এই হেতু তাহা সীমাবচ্ছিন্ন। সীমাবচ্ছিন্ন ঐশ্বর্য্যের ভোগ কিছু আর অনন্তকাল চলিতে পারে না—তাহার অন্ত অনিবার্য্য। তবে কি ভোগাবসানে মুক্তপুরুষকে পুনর্ব্বার ইহলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে?

পরবর্ত্তীসূত্রের শাঙ্করভাষ্যে ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে এই যে, “নাড়ীরশ্মিসমন্বিতেন অর্চ্চিরাদিপর্ব্বণা দেবযানেন পথা যে ব্রহ্ম-

লোকং শাস্ত্রোক্তবিশেষণং গচ্ছন্তি—যস্মিন্ অরশ্চ হ বৈ ণ্যশ্চ অর্ণবৌ ব্রহ্মলোকে তৃতীয়স্যাং ইতোদিবি, যস্মিন্ ঐরম্মদীয়ং সরো, যস্মিন্ অশ্বত্থঃ সোমসবনো, যস্মিন্ অপরাজিতা পূর্ব্রহ্মণো, যস্মিংশ্চ প্রভুবিমিতং হিরণ্ময়ং বেশ্ম যশ্চানেকধা মন্ত্রার্থবাদাদিপ্রদেশেষু প্রপঞ্চ্যতে তং তে প্রাপ্য ন চন্দ্রলোকাদিবৎ বিযুক্তভোগো আবর্ত্তন্তে। কুতঃ। 'তয়োর্দ্ধং আয়ন্ অমৃতত্বং এতি।' 'তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ।' 'এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবং আবর্ত্তং ন আবর্ত্তন্তে।' 'ব্রহ্মলোকং অভিসম্পদ্যতে ন চ পুনরাবর্ত্ততে।' ইত্যাদি শব্দেভ্যঃ। অন্তবত্বেঽপি তু ঐশ্বর্য্যস্য যথা অনাবৃত্তিস্তথা বর্ণিতং 'কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পরং' ইত্যত্র। সম্যগ্ দর্শনবিধ্বস্ততমসাং তু নিত্যসিদ্ধনির্ব্বাণপরায়ণানাং সিদ্ধা এব অনাবৃত্তিঃ। তদাশ্রয়ণেনৈব হি সগুণশরণামামপি অনাবৃত্তিসিদ্ধিঃ।"

ইহার অর্থঃ—

যাঁহারা নাড়ীরশ্মি সমন্বিত অর্চ্চি প্রভৃতি পংক্তিবিভাগের মধ্য দিয়া দেবযান পথ অতিবাহন করিয়া শাস্ত্রোক্ত লক্ষণাক্রান্ত ব্রহ্মলোকে গমন করেন;—পৃথিবী হইতে তৃতীয় স্বর্গে—যেখানে বিরাজ করিতেছে অরণ্যনামক যুগল সমুদ্র, অন্নমদময় সরোবর, অমৃতবর্ষী অশ্বত্থ, ব্রহ্মার অপরাজিতা পুরী এবং ব্রহ্মার নির্ম্মিত হিরণ্ময় প্রাসাদ—সেই ব্রহ্মলোকে যাঁহারা গমন করেন, সেখান হইতে তাঁহারা চন্দ্রলোকবাসীদিগের ন্যায় বিযুক্তভোগ হইয়া পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন না। তাহার প্রমাণ কি?—প্রমাণ তাহার—'উপাসকেরা উর্দ্ধে গমন করিয়া অমরত্ব প্রাপ্ত হন', 'তাঁহাদের পুনরাবৃত্তি হয় না' 'তাঁহারা মনুষ্যলোকে আবর্ত্তন করেন না', 'ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া আর তাঁহারা পুনরাবর্ত্তন করেন না' এই সকল বেদবাক্য। ব্রহ্ম-

লোকপ্রাপ্ত ব্রহ্মোপাসকদিগের ঐশ্বর্য্য অন্তবান্ হইলেও যে-প্রকারে তাঁহাদের পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা নিবারিত হয় সে কথা পূর্ব্বের একটি সূত্রে বলা হইয়াছে; যথা,—বর্ত্তমান অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের দশমসূত্রে, অর্থাৎ 'কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃপরং' এই সূত্রে, বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মলোকের প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে সেই স্থানে অবস্থিতি-কালেই তত্রত্য অধিবাসীদিগের সম্যক্ ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হওয়া গতিকে তাঁহাদের অধ্যক্ষ যিনি ব্রহ্মা তাঁহার সঙ্গে তাঁহারা একত্রে পরম পরিশুদ্ধ বিষ্ণুর পরম পদ অর্থাৎ পরমস্থান প্রাপ্ত হ'ন। সম্যক্-জ্ঞানের-উৎপত্তি-প্রসাদাৎ যাঁহাদের অজ্ঞানান্ধকার সমূলে বিধ্বস্ত হইয়াছে সেই নিত্যসিদ্ধনির্ব্বাণপরায়ণ মুক্ত পুরুষদিগের অনাবৃত্তি সিদ্ধই আছে; অতএব তৎপ্রসাদাৎ (অর্থাৎ সম্যক্জ্ঞানের উৎপত্তি প্রসাদাৎ) সগুণব্রহ্মোপাসকদিগেরও যে অনাবৃত্তি সিদ্ধ হইবে—তাহা তো হইবারই কথা।

মুক্তিবিষয়ে বেদান্তদর্শনের মুখ্য সিদ্ধান্তগুলি সবিস্তরে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম। তাহা সংক্ষেপে এই :—

প্রথম সিদ্ধান্ত।

পরমেশ্বরের স্থিতি দুইপ্রকার—(১) স্বরূপে স্থিতি এবং (২) মহিমাতে স্থিতি।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত।

(১) যে ভাবে তিনি স্বরূপে স্থিতি করেন সে-ভাবে তিনি নির্গুণ; আর (২) যে-ভাবে তিনি আপনার মহিমাতে স্থিতি করেন সে-ভাবে তিনি সগুণ।

তৃতীয় সিদ্ধান্ত।

প্রতীকোপাসনা অর্থাৎ প্রতিমাদি-পূজা ব্রহ্মোপাসনার কোটায় স্থান পাইবার অযোগ্য।*

চতুর্থ সিদ্ধান্ত।

নির্গুণ ব্রহ্মে স্থিতিপ্রাপ্ত সম্যক্‌জ্ঞানীদিগকে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে তো হয়ই না, তা ছাড়া—সগুণব্রহ্মের উপাসকদিগকেও পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না।

পঞ্চম সিদ্ধান্ত।

ইহলোকেই হউক্ আর পরলোকেই হউক—যখনই যাঁহাতে সম্যক্ ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হয় তখনই তিনি মুক্ত হ'ন।

ষষ্ঠ সিদ্ধান্ত।

সগুণ ব্রহ্মোপাসকেরা ব্রহ্মলোকে নীত হ'ন; আর সেখানে অবস্থিতি-কালে—একদিকে যেমন জগদ্‌ব্যাপার ব্যতীত আর আর সমস্ত ঐশ্বর্য্য (যেমন অণিমাদি ঐশ্বর্য্য) তাঁহাদের করায়ত্ত হয়; আর এক দিকে তেমনি তাঁহাদের অন্তরে সম্যক্ ব্রহ্মজ্ঞানের কপাট উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়, আর, সেইগতিকে তাঁহারা মুক্ত হ'ন।

---

* আমাদের দেশের অধম-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা বিষয়ী লোকদিগের মনস্তুষ্টি সম্পাদনের জন্য সময়ে সময়ে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া এইরূপ একটা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা লোকমধ্যে রটনা করিয়া থাকেন যে, প্রতিমাপূজাও একপ্রকার সগুণ ব্রহ্মোপাসনা। ইহাদের জানা উচিত যে, প্রতিমাপূজা ব্রহ্মোপাসনার কোটায় স্থান পাইবার অযোগ্য বলিয়া শাস্ত্রকারেরা প্রতীকোপাসনার কোটায় তাহার জন্য স্বতন্ত্র একটা স্থান পরিচিহ্নিত করিয়া দিয়াছেন।

সপ্তম সিদ্ধান্ত।

ব্রহ্মলোকের প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে তত্রত্য অধিবাসীরা তাঁহাদের অধ্যক্ষ যিনি ব্রহ্মা তাঁহার সহিত একত্রে পরম পরিশুদ্ধ বিষ্ণুর পরমপদ কিনা পরমধাম প্রাপ্ত হ'ন। *

---

* বর্ত্তমানকালের একজন মার্কিণদেশীয় যোগী ঋষি-শ্রেণীর মহাত্মা (*Andrew Jackson Davis*) *Clairvoyance* সংজ্ঞক ধ্যানযোগের প্রভাবে জগতের সৃষ্টি-স্থিতিপ্রলয়-ব্যাপারের যেরূপ সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা মোটের উপর আমাদের দেশীয় শাস্ত্রের সহিত মেলে একরকম মন্দ না, পরন্তু তাহার অবান্তর শ্রেণীর বিষয়গুলা কতক বা ভাবে-মেলে ভাষায় মেলে না—কতক বা কোনো অংশেই মেলে না। পাঠকবর্গের কৌতুহল নিবারণার্থে নিম্নে তাহার কতক কতক অংশ উদ্ধৃত করিলাম।

After the individual souls leave this planet অর্থাৎ পৃথিবী (and all planets in universal space which yield such organizations of matter) they ascend to the Second Sphere of existence. Here all individuals undergo an angelic discipline, by which every physical and spiritual deformity is removed, and symmetry reigns throughout the immeasurable empire of holy beings. When all spirits shall have progressed to the second sphere, the various earths and planets in the Universe * * * will be depopulated and not a living thing will move upon their surfaces. And so there will be no destruction of life in that period of disorganization, but the earths and suns and planets will die—their life will be absorbed by the Divine Spirit. * * * But the inhabitants of the second sphere will ultimately advance to the third, then to the fourth, then to the fifth, and lastly

বেদান্তদর্শনের শেষের এই সিদ্ধান্তটির সম্বন্ধে আমার মনে দুইটি গুরুতর প্রশ্ন সহসা উপস্থিত হইতেছে।

---

into the sixth; this sixth sphere is as near the Great Positive Mind as spirits can ever locally or physically approach. * * * It is in the neighbourhood of the divine aroma of the Deity; it is warmed and beautified infinitely by His infinite Love, and it is illuminated and rendered unspeakably magnificent by His all embracing Wisdom. In this ineffable sphere in different stages of individual progression, will all spirits dwell.

* * * *

When all spirits arrive at the sixth sphere of existence, and the protecting Love and Wisdom of the great positive Mind are thrown tenderly around them; and when not a single atom of life is wandering from home in the fields and forests of immensity; then the Deity contracts his inmost capacity, and forthwith the boundless vortex is convulsed with a new manifestation of Motion—Motion transcending all our conceptions, and passing to and fro from centre to circumference, like mighty tides of Infinite Power. * * * *

Thus God will create a new Universe, and will display different and greater elements and energies therein. And thus new spheres of spiritual existences will be opened.

There have already been developed more new

প্রথম প্রশ্ন।

ব্রহ্মনির্ব্বাণ যদি প্রকৃত পক্ষেই নির্ব্বাণ হয়, আর সেই কারণে যদি ব্রহ্মা প্রলয়কালে তাঁহার ব্রহ্মলোকবাসী সহচরদিগের সহিত একত্রে বিষ্ণুর পরমপদে উপনীত হইয়া একবারেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হ'ন, তবে ব্রহ্মার অবর্ত্তমানে প্রলয়ান্তে নূতন সৃষ্টির কার্য্য চলিবে কাঁহার অধ্যক্ষতায় ?

দ্বিতীয় প্রশ্ন।

পক্ষান্তরে এমন যদি হয় যে, ব্রহ্মনির্ব্বাণের প্রশান্ত অবস্থাতেও মুক্তপুরুষের জ্ঞান প্রেমাদি আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম অবিচ্যুত থাকে, আর, সেই কারণে যদি—প্রলয়কালে ব্রহ্মা এবং তাঁহার ব্রহ্মলোকবাসী সহচরেরা বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াও নির্ব্বাণ প্রাপ্ত না হ'ন, তবে প্রলয়ান্তে আবার যখন ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকের (অবশ্য—নূতন সৃষ্ট ব্রহ্মলোকের) আধিপত্যকার্য্যে ব্রতী হইবেন, তখন তাঁহার পুরাতন ব্রহ্মলোকবাসী সহচরেরা তাঁহার সঙ্গে একত্রে নূতন ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া অণিমাদি ঐশ্বর্য্য পুনঃপ্রাপ্ত না হইবেন যে, কেন, তাহার কোনো অর্থ থাকে না। রজনী অবসানে রাজা যেমন রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হ'ন—মন্ত্রীও তেমনি মন্ত্রণাকার্য্যে প্রবৃত্ত হ'ন—রাজদূতও তেমনি দৌত্যকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়—চাষাও তেমনি চাষ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; নচেৎ রাজ্যের প্রজারা যদি স্ব স্ব অধিকারোচিত কার্য্যে প্রবৃত্ত না হয়, তবে রাজা রাজকার্য্য করিবেন কাহাদিগকে লইয়া ? জনশূন্য রাজ্যের রাজাই বা কিরূপ রাজা ? ব্রহ্মার ব্রহ্ম-

---

Universes, in the manner described, than there are atoms in the earth.

লোকবাসী সহচরদিগের অবর্ত্তমানে ব্রহ্মলোক যদি জনশূন্য হয়, তবে সেরূপ ব্রহ্মলোকের ব্রহ্মাতেই বা কি কাজ, আর, থাকিয়াই বা কি কাজ?

প্রশ্ন। তুমি কি মনে করিয়াছ যে, দেশীয় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের নিকট হইতে তোমার প্রশ্ন-দুটার একটা সদুত্তর না পাওয়া পর্য্যন্ত আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদানে ক্ষান্ত থাকিবে? তা চেয়ে—স্পষ্ট বল না কেন যে, কোনো জন্মেই আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তোমা-কর্ত্তৃক ঘটিয়া উঠিতে পারে না। আমাদের দেশীয় বেদান্তবাগীশ মহাশয়েরা তোমার প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিবেন?—হরি হরি! তুমি কি ক্ষেপিয়াছ? হইবে যাহা—তাহা আমি স্পষ্ট দেখিতেছি;—তুমি শঙ্করাচার্য্যের মতের প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছ দেখিয়া দেশশুদ্ধ সমস্ত শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতগণ তোমার প্রতি খড়্গাহস্ত হইবেন। তবে যদি তুমি রামানুজাচার্য্য বা ঐরূপ কোনো লোকপূজ্য আচার্য্যের পক্ষ অবলম্বন করিয়া শঙ্করাচার্য্যের সহিত বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও তাহা হইলে তুমি অনেকানেক পণ্ডিতের নিকট হইতে অনেক প্রকার সাহায্য প্রাপ্ত হইতে পার—এটা সত্য।

উত্তর॥ শঙ্করাচার্য্যের মতের প্রতিবাদ করা যদি আমার উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে আমার স্বপক্ষসমর্থনের জন্য শঙ্করাচার্য্যের প্রণীত বিবেকচূড়ামণি এবং সর্ব্ববেদান্তসার হইতে গণ্ডা গণ্ডা বহুমূল্য বচন যাহা আমি ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি তাহার একটিও আমার মুখ দিয়া বাহির হইতে পারিত না। শঙ্করাচার্য্যের মতো অতবড় একজন তত্বজ্ঞ আচার্য্য কি কেহ কোথাও দেখিয়াছে না দেখিবে? কি অকৃত্রিম সত্যানুরাগী। পাণ্ডবসেনার মধ্যে যেমন অর্জ্জুন অদ্বিতীয়, সত্যের সেনার মধ্যে তেমনি শঙ্করাচার্য্য অদ্বিতীয়। আমি আবার

শঙ্করাচার্য্যের মতের প্রতিবাদ করিব? আমি তাঁহার বিন্দুমাত্র পদধূলি পাইলে বর্ত্তিয়া যাই। আমার বিশ্বাস এই যে, যাহাকে আমি বলিতেছি "কঠোর অদ্বৈতবাদ" তাহা কেবল শঙ্করাচার্য্যের মতের একটা বাহিরের পরিচ্ছদ, তা বই, তাহা শঙ্করাচার্য্যের মতের ভিতরের কথা নহে। শঙ্করাচার্য্যের ভিতরে মহা এক অদ্বিতীয় সত্য জাগিতেছে; এম্নি তাহা অপ্রতিম—এম্নি অপরিমেয়—এম্নি অতলস্পর্শ গভীর যে, তাহা মুখেও ব্যক্ত করা যায় না—লেখনীতেও ব্যক্ত করা যায় না; বলিয়াও বুঝানো যায় না, গড়িয়াও দেখানো যায় না। যাহা মুখে ব্যক্ত করা অসম্ভব সেই কথাটি পাকে প্রকারে ইঙ্গিত ইসারায় ব্যক্ত করিতে গিয়া তাহা হইয়া দাঁড়াইয়াছে কঠোর অদ্বৈতবাদ। শঙ্করাচার্য্য এই যে একটি কথা বলিয়াছেন—যে,

"অজ্ঞানকলুষং জীবং জ্ঞানাভ্যাসাৎ সুনির্ম্মলং
কৃত্বা জ্ঞানং স্বয়ং নশ্যেৎ জলং কতকরেণুবৎ ॥"

"নির্ম্মলীফলের গুঁড়া যেমন জলের সমস্ত মলরাশি নিঃশেষে বিনাশ করিয়া সেই সঙ্গে আপনিও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, জ্ঞান তেমনি জীবের অজ্ঞানকলুষ নিঃশেষে বিনাশ করিয়া সেই সঙ্গে আপনিও বিনাশ প্রাপ্ত হয়" এ কথাটির নিগূঢ় অর্থ আমি যতদূর বুঝি তাহা এই :—

শঙ্করাচার্য্যের ভিতরে যে-কথাটি জাগিতেছে তাহা যদি তিনি মুখে প্রকাশ করিয়া না বলেন, তবে তাহা তাঁহার ভিতরেই থাকিয়া যায়। যদি তাহা প্রকাশ করিয়া বলেন তবে তাহা কঠোর অদ্বৈতবাদের আকারে পরিণত হয়। সেই ভিতরের ভাবটির প্রতি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইলে অদ্বৈতবাদের নিশান খাড়া করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। লোকে কথায় বলে "নেই মামা অপেক্ষা কাণা মামা ভাল।" শঙ্করাচার্য্যের ভিতরের কথাটি একেবারেই

তাঁহার ভিতরে থাকিয়া যাওয়া অপেক্ষা অদ্বৈতবাদের আকারে তাহা লোক-মধ্যে প্রচারিত হওয়া ভাল। এখন কথা হইতেছে এই যে, অদ্বৈতবাদ দিব্য একটি চাঁচা-ছোলা বাক্য, এইজন্য তাহা লোকের জ্ঞানের উপলব্ধিগম্য; পরন্তু শঙ্করাচার্য্যের ভিতরের কথাটি যেহেতু অনির্ব্বচনীয় এই হেতু তাহা জনসাধারণের উপলব্ধিগম্য নহে। শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন যে তোমার অজ্ঞান সমূলে বিনষ্ট হইলে সেই সঙ্গে তোমার অদ্বৈতজ্ঞানও বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, বিনাশ পাইবে যেন অদ্বৈতজ্ঞান—উৎপন্ন হইবে কিরূপ জ্ঞান? যদি বলো—কিছুই উৎপন্ন হইবে না—যাহা অনাদিকাল বর্ত্তমান আছে তাহাই অবিদ্যামুক্ত হইবে, তবে জিজ্ঞাসা করি যে, সে-যাহা অবিদ্যা-মুক্ত হইবে তাহা জ্ঞান কি অজ্ঞান? তাহা যদি জ্ঞান হয়, তবে, এই যে তুমি বলিলে "জ্ঞান বিনাশ প্রাপ্ত হইবে" তোমার এ কথাটি একেবারেই নস্যাৎ হইয়া যায়। আমি তাই বলি এই যে, চরমে যেরূপ জ্ঞান অবিদ্যামুক্ত হইয়া বিরাজমান হইবে, তাহা অনির্ব্বচনীয় বলিয়া তাহা যে কিরূপ জ্ঞান, তাহা কাহাকেও বুঝানো যাইতে পারে না; আর, তাহা বুঝানো যাইতে পারে না বলিয়া শঙ্করাচার্য্য তাহা কাহাকেও বুঝাইতে চেষ্টা করেন নাই। বুঝাইতে চেষ্টা না করিবার এটাও একটা কারণ—যে, সে জ্ঞান যাঁহার যখন উৎপন্ন হইবে, তখন, তাহা যে কিরূপ জ্ঞান, তাহা তিনি আপনা হইতেই বুঝিতে পারিবেন; তাহার পূর্ব্বে তাহা অপর কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে বুঝিয়া লইতে যাওয়া নিতান্তই বিড়ম্বনা। এ যাহা আমি বলিলাম তাহার একটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা নিতান্তই আবশ্যক মনে করিতেছি; কেননা তাহা যদি আমি না করি, তবে, আমার মন বলিতেছে যে,

শ্রোতারা আমার ঐ কথাটির তাৎপর্য্য এক বুঝিতে আর বুঝিবেন।

জ্যামিতি-পুস্তকের গোড়াতেই সরল রেখার সংজ্ঞা নিরূপণ করা হইয়াছে। একটি সংজ্ঞা এই যে, যে রেখা দুই প্রান্তবিন্দুর মধ্যে সরলভাবে অবস্থিতি করে তাহাকেই বলা যায় সরল রেখা। এ সংজ্ঞা সংজ্ঞাই নহে—পুনরাবৃত্তি মাত্র। আর একটি সংজ্ঞা এই যে, দুই বিন্দুর মধ্যে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম পথ তাহাই সরল রেখা; এটা তো সংজ্ঞা নহে—এটা সিদ্ধান্তবিশেষ; কেননা দুই বিন্দুর মধ্যস্থিত হ্রস্বতম রেখা সরল কি বক্র তাহা প্রমাণসাপেক্ষ। প্রকৃত কথা এই যে, সরল রেখার সংজ্ঞা হয় না—অথচ জোর করিয়া তাহার সংজ্ঞা করা হইয়া থাকে। আর একদিকে দেখা যায় যে, সরল রেখা যে কাহাকে বলে তাহা অধম মূর্খ লোকেরাও জানে। তার সাক্ষী—কোনো একজন গাড়োয়ান্ যখন গাড়ী সজোরে ঠেলিয়া স্থানান্তরিত করিতে চেষ্টা করে—তখন সে সরল-রেখাপথে বলপ্রয়োগ করে। প্রকৃত কথা এই যে, সরল রেখা একপ্রকার মানসিক রেখা—তাহা বলস্ফূর্ত্তিরই আর এক নাম; সুতরাং তাহার দৈশিক সংজ্ঞা অসম্ভব। এখানেও নেইমামা অপেক্ষা কাণা মামা ভাল—সরল রেখার সংজ্ঞা নিরূপণ না-করা অপেক্ষা ছাত্রদিগের উপকারার্থে মোটামোটি তাহার একটা সংজ্ঞানিরূপণ করা ভাল। চরম ব্রহ্মজ্ঞান কিরূপ জ্ঞান তাহার সংজ্ঞা নির্ব্বাচন যদিচ অসম্ভব কিন্তু তাহা যে কিরূপ জ্ঞান নহে, তাহা বলিতে পারা কিছুই কঠিন নহে। শঙ্করাচার্য্য তাই বলিতেছেন যে, তাহা অদ্বৈত-জ্ঞানও নহে, দ্বৈতজ্ঞানও নহে। মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রেও শিবের মুখ দিয়া এইরূপ একটি হেঁয়ালি-ধরণের কথা বাহির করানো হইয়াছে যে,

"অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে।
মম তত্ত্বং ন জানন্তি দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিতং ॥"

"কেহ বা অদ্বৈত ইচ্ছা করেন, কেহবা দ্বৈত ইচ্ছা করেন, কিন্তু আমার এই যে তত্ত্ব—দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিত, এ তত্ত্ব কেহই জানে না"।

বেদান্তদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থপাদের শাঙ্করভাষ্যে এই যে দুইটি উপনিষদ বাক্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে—(১) "তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ" অর্থাৎ "ইহার মহিমা এতদূর পর্য্যন্ত—মহিমান্বিত পুরুষ তাঁহার মহিমা অপেক্ষা বড়", (২) "পাদোঽস্য সর্ব্বাণি ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" অর্থাৎ "ইহার একপাদ সমস্ত ভূত—ত্রিপাদামৃত দ্যুলোকে", এই দুইটি বচনের মর্ম্ম এবং তাৎপর্য্য প্রণিধানপূর্ব্বক বুঝিয়া দেখিলে—পরমেশ্বর যে সগুণ এবং নির্গুণ দুইই একাধারে তাহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে, আর, সেই সঙ্গে মুক্তি-বিষয়ক তথ্যনিরূপণের বাকি পথ সুপরিষ্কৃত হইয়া যাইবে। কিন্তু আজ আর না—মুক্তিবিষয়ে আর কয়েকটি কথা যাহা আমার বলিবার আছে—আগামী অধিবেশনে তাহার পর্য্যালোচনায় বিধিমতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে।

ঊনবিংশতি অধিবেশন।

ব্যাখ্যান।

আমাদের দেশের বৈদান্তিক আচার্য্যদিগের কঠোর অদ্বৈতবাদের চক্রে পড়িয়া সগুণ এবং নির্গুণের মধ্যে পরস্পরের সহিত মুখ-দেখা-দেখি বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হওয়াতে বেদান্তদর্শনের মুক্তিতত্ত্ব যে, কিরূপ একটা গোলমেলে কাণ্ড হইয়া দাঁড়াইয়াছে—গতবারের অধিবেশনে আমি তাহা সাধ্যানুসারে দেখাইতে ত্রুটি করি নাই। বেদান্তদর্শনের লোকপূজ্য ভাষ্যকার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য আপনিই বলিয়াছেন যে, বেদে পরমেশ্বরের একসঙ্গে দুইরূপ স্থিতির উল্লেখ আছে—(১) স্বরূপে স্থিতি এবং (২) মহিমাতে স্থিতি ; অথচ তিনি ঐ দুই সহোদরসম্পর্কীয় স্থিতির মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ ঘটাইয়া—মুক্তির পরম পবিত্র শান্তিধামে নির্গুণের সহিত সগুণের, তথৈব জ্ঞানের সহিত কর্ম্মের দেখাসাক্ষাতের পথ একেবারেই বন্ধ করিয়া দিয়াছেন ; আর তাহাতে ফল হইয়াছে এই যে, এক-মুক্তি আত্মবিস্মৃতির অগাধ জল-গর্ভে নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়া পরিশেষে তাহা তিন স্থানে তিন মুক্তি হইয়া সাজিয়া বাহির-হইয়াছে,—

(১) ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি (২) বিষ্ণুর পরম স্থানে চরম মুক্তি ; এবং (৩) ইহলোকে জীবন্মুক্তি ; এই তিন মুক্তি হইয়া সাজিয়া বাহির হইয়াছে।

প্রশ্ন ॥ অ্যাকা কেবল বেদান্তদর্শনকে দোষ দিলে কি হইবে? সব শেয়ানের একই রা! *

---

* শ্যেনপক্ষীদিগের দূরদর্শিতা জগৎময় রাষ্ট্র ; তীক্ষ্ণবুদ্ধি চতুর ব্যক্তিরা তাই লোকের নিকটে শেয়ানা নামে পরিচিত। গাধা যেমন গর্দ্দভ শব্দের অপভ্রংশ—শেয়ানা তেমনি শ্যেন-শব্দের অপভ্রংশ।

বৈদান্তিক আচার্য্যদিগের এই যে একটি কথা—যে, "নিস্ত্রৈগুণ্যে পথিবিচরতঃ কো বিধিঃ কো নিষেধঃ" যিনি নিস্ত্রৈগুণ্য-পথে বিচরণ করেন, তাঁহার সম্বন্ধে বিধিই বা কি, আর, নিষেধই বা কি? (অর্থাৎ তিনি বিধি-নিষেধের গণ্ডির সীমা-বহির্ভূত একপ্রকার বে-আইন বে-কানুন সৃষ্টিছাড়া লোক) এ কথা যে, বৈদান্তিক আচার্য্যদিগের একটা ঘর-গড়া কথা, তাহা নহে—উহা সব শাস্ত্রেরই সর্ব্ববাদিসম্মত কথা। তার সাক্ষী ঃ—গীতাশাস্ত্রের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের পঞ্চবিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে—

"মানাপমানয়োস্তুল্য স্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥"

ইহার অর্থ ঃ—:

মান-অপমান যাঁহার নিকটে সমান, শত্রু মিত্র যাঁহার নিকটে সমান, যিনি কোনো প্রকার কর্ম্ম আরম্ভ করেন না, তিনি গুণাতীত বলিয়া উক্ত হ'ন।

উত্তর॥ "সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী"
এ বচনটির অর্থ তুমি যাহা করিতেছ, কি না—যিনি কোনো প্রকার কর্ম্ম আরম্ভ করেন না তাঁহাকেই বলা যায়

"সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী"—

গীতাকার মহর্ষিদেব তাহা বলেন না; তাহার পরিবর্ত্তে তিনি আর এক কথা বলেন। তিনি বলেন

"যস্য সর্ব্বে সমারম্ভা কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥"

[৪র্থ অধ্যায় ১৯শ শ্লোক]

ইহার অর্থ :—

যাঁহার কর্ম্ম জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, যাঁহার সমস্ত আরম্ভ (অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্মোদ্যম) কামসংকল্পবর্জ্জিত (অর্থাৎ ফলকামনাশূন্য), এইরূপ জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ-কর্ম্ম সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী ব্যক্তিকে জ্ঞানিজনেরা পণ্ডিত বলেন।

তবেই হইতেছে যে, শাস্ত্রকার মহর্ষিদেবের মতে—যিনি ফল-কামনা-শূন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানপ্রেমের হস্তে মনোঅশ্বের রাশ সঁপিয়া দিয়া মঙ্গলের পথে অব্যাকুলিত-চিত্তে বিচরণ করেন, তা বই, ফলকামনার চাবুকের চোটে ব্যস্তসমস্ত হইয়া কোনো কর্ম্ম আরম্ভ করেন না, তাঁহার মতো প্রশান্তচিত্ত ধীরেরাই সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী শব্দের বাচ্য। আবার গীতাশাস্ত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকে বলা হইয়াছে

"কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ অকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃতস্নকর্ম্মকৃৎ ॥"

ইহার অর্থ :—

কর্ম্মে যিনি অকর্ম্ম দেখেন, তথৈব, অকর্ম্মে যিনি কর্ম্ম দেখেন—মনুষ্যলোকে তিনিই বুদ্ধিমান্—তিনিই যোগী—তিনিই সর্ব্বকর্ম্মকৃৎ ॥

ইহার টীকা :—

"কর্ম্মে যিনি অকর্ম্ম দেখেন" এ কথার ভিতরের ভাব এই যে, পদ্মপত্র যেমন জলে ভাসে অথচ জলে লিপ্ত হয় না—জীবন্মুক্ত পুরুষ তেমনি সমস্ত কর্ম্ম করেন অথচ কোনো কর্ম্মে লিপ্ত হ'ন না; লিপ্ত হ'ন না কেন? না যেহেতু তাঁহার মন বিষয়ে অনাসক্ত এবং ফল-কামনাশূন্য। "অকর্ম্মে যিনি কর্ম্ম দেখেন" এ কথার ভিতরের ভাব এই যে, জ্ঞানী ব্যক্তি যখন ফলকামনা-দূষিত কাম্যাদিকর্ম্ম হইতে হস্ত

অপকর্ষণ করেন তাহাও কর্ম্ম। চিত্ত-সংযমও কর্ম্ম। শক্তির প্রসারণও যেমন—শক্তির সংহরণও তেমনি—দুইই কর্ম্ম। হাতের রাশ আল্গা দিয়া অশ্বকে দৌড় দেওয়ানোও যেমন, আর, রাশ টানিয়া ধরিয়া অশ্বের দৌড় থামানোও তেমনি, দুইই কর্ম্ম। ইংরাজি বৈজ্ঞানিক ভাষায় শেষোক্ত প্রকার কর্ম্মের বিশেষণ দেওয়া হইয়া থাকে Inhibition।

আবার, গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে বলা হইয়াছে

"কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥"

ইহার অর্থ:—

কাম্যকর্ম্মের পরিত্যাগকেই কবিরা বলেন "সন্ন্যাস।" আর সর্ব্বকর্ম্মের ফলত্যাগকেই কবিরা বলেন "ত্যাগ।"

কাম্যকর্ম্মের পরিত্যাগ কিছু-আর সর্ব্বকর্ম্মের পরিত্যাগ নহে, তথৈব, কর্ম্মের ফলত্যাগ কিছু আর কর্ম্মত্যাগ নহে। এ কথা তুমি খুবই জোরের সহিত বলিতে পার যে, গীতাশাস্ত্রোক্ত গুণাতীত ভাবের সহিত ফলকামনাদূষিত কাম্যকর্ম্ম সংলগ্ন হয় না; কিন্তু এ কথা তুমি কোনো যুক্তিতেই বলিতে পার না যে, গীতাশাস্ত্রোক্ত গুণাতীত ভাবের সহিত কোনো প্রকার কর্ম্মই সংলগ্ন হয় না—নিষ্কাম কর্ম্মও সংলগ্ন হয় না। গীতাশাস্ত্রের কথাবার্ত্তার ভাবে এটা কাহারো বুঝিতে বিলম্ব হয় না—যে, গুণাতীত ভাবের সঙ্গে নিষ্কাম কর্ম্মও সংলগ্ন হয়, বিমল আনন্দও সংলগ্ন হয়, বিশুদ্ধ জ্ঞানও সংলগ্ন হয়, ভগবদ্ভক্তিও সংলগ্ন হয়—সবই সংলগ্ন হয়। তার সাক্ষী—গীতাশাস্ত্র হইতে এইমাত্র তুমি যে শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া আমাকে দেখাইলে সেই শ্লোকটির (অর্থাৎ

মানাপমানয়োস্তুল্য স্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥"

এই শ্লোকটির) অব্যবহিত পরেই রহিয়াছে

"মাংচ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥
ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহং অমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥

ইহার অর্থ :—

অব্যভিচারী ভক্তিযোগে যে আমার সেবায় রত হয়, সে গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাব-প্রাপ্তির যোগ্য হয়। ব্রহ্মের আমি প্রতিষ্ঠা—অব্যয় অমৃতের আমি প্রতিষ্ঠা—শাশ্বত ধর্ম্মের আমি প্রতিষ্ঠা—ঐকান্তিক সুখের আমি প্রতিষ্ঠা।

ইহার টীকা।

শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়া পরমপুরুষ পরমাত্মা বলিতেছেন "ব্রহ্মের আমি প্রতিষ্ঠা"—ইহার অর্থ কি? শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতমহলে এ কথা কাহারো অবিদিত নাই যে, সাংখ্যদর্শনের পারিভাষায় প্রকৃতি-শব্দের গোটা-দুইতিন সমার্থজ্ঞাপক প্রতিশব্দ আছে—তাহার মধ্যে ব্রহ্মশব্দ একটি। অতএব উদ্ধৃত ভগবদ্‌বাক্যটির, অর্থাৎ ব্রহ্মের আমি প্রতিষ্ঠা, এই বাক্যটীর অর্থ যে প্রকৃতির আমি প্রতিষ্ঠা, এ বিষয়ে আর সন্দেহমাত্র নাই।

গীতাশাস্ত্রের আর এক স্থানেও ব্রহ্মশব্দ প্রকৃতি অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে। গীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে বলা হইয়াছে—

"সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥"

ইহার অর্থ :—

নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে গর্ব্ভে গর্ব্ভে যে-সকল মূর্ত্তি সম্ভূত হয়—সমস্ত গর্ব্ভের মহাগর্ব্ভ ব্রহ্ম, আর আমি (অর্থাৎ পরমপুরুষ পরমাত্মা) বীজপ্রদ পিতা।

অতএব গীতার যে চারিছত্র শ্লোক আমি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম তাহার অর্থ ফলে দাঁড়াইতেছে এইরূপ :—

[পরম পুরুষ পরমাত্মা—শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়া বলিতেছেন]—

"আদ্যা প্রকৃতির আমি প্রতিষ্ঠা, অব্যয় অমৃতের আমি প্রতিষ্ঠা, শাশ্বত ধর্ম্মের আমি প্রতিষ্ঠা, ঐকান্তিক সুখের আমি প্রতিষ্ঠা। অব্যভিচারী ভক্তিযোগে যে আমার সেবায় রত হয়, সে গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া আদ্যা প্রকৃতির ভাব প্রাপ্ত হয়।"

এখানে কয়েকটি বিষয় পরে পরে দ্রষ্টব্য।

প্রথম দ্রষ্টব্য।

যদিচ সত্ত্ব রজ এবং তম এই তিন গুণের তিনটিই মূল প্রকৃতির অন্তর্ভূত, কিন্তু তথাপি মূল প্রকৃতিতে তিনটির কোনোটিরই অভিব্যক্তি নাই; আর, "যে ক্ষেত্রে গুণের অভিব্যক্তি নাই সে ক্ষেত্র কার্য্যত নির্গুণ" এই অর্থে ঈশ্বরের সেবাপরায়ণ প্রকৃতিভাবাপন্ন ব্যক্তি গুণাতীত শব্দের বাচ্য।

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য।

জীবাত্মা গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া প্রকৃতিভাবাপন্ন হইলে তাহাতে ফল কী হয়? না আত্মাতে পরমাত্মার আবির্ভাবের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়।

তৃতীয় দ্রষ্টব্য।

মূল প্রকৃতি যেমন একভাবে সগুণ, আর এক ভাবে নির্গুণ; পরমাত্মাও তেমনি একভাবে সগুণ—আর এক ভাবে নির্গুণ। মূল প্রকৃতিতে তিন গুণই অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে, এইভাবে মূল প্রকৃতি সগুণা; আবার, মূল প্রকৃতিতে ত্রিগুণের তিনটির কোনোটিরই অভিব্যক্তি নাই এইভাবে মূল প্রকৃতি নির্গুণা। তেমনি, পরমাত্মা বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত, অথবা যাহা একই কথা—আপনার মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত এইভাবে তিনি সগুণ; আবার, তিনি স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত এইভাবে তিনি নির্গুণ।

চতুর্থ দ্রষ্টব্য।

"ঈশ্বর বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত" সংক্ষেপে "শুদ্ধসত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত" এ কথাটা বেদান্তের কথা, তা বই, উহা সাংখ্যের কথা নহে। সাংখ্য দর্শনের মতে সত্ত্বগুণনামা'ই রজস্তমোগুণের সঙ্গাশ্লিষ্ট। পূর্ব্বে তাই আমি বলিয়াছি এবং এখনো বলিতেছি যে, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ ত্রিগুণের কোটার অন্তর্ভূত নহে।

পঞ্চম দ্রষ্টব্য।

মহাভারতের শাস্ত্রপ্রণেতা ঋষিদিগের আমলে মুখ্য সাংখ্যদর্শনের ভিত্তিমূলের উপরে কেমন করিয়া আস্তে আস্তে বেদান্তদর্শনের গোড়া-পত্তন হইতেছিল—মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের কতকগুলি বাছা-বাছা আখ্যায়িকায় তাহার সন্ধান পাওয়া যায় দিব্য সুস্পষ্ট। তাহার একটি জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত শান্তিপর্ব্বের ৩১৮শ অধ্যায়ের মধ্য হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি, প্রণিধান কর :—

"অবুধ্যমানাং প্রকৃতিং বুধ্যতে পঞ্চবিংশকঃ।

* * * *

নতু পশ্যতি পশ্যংস্তু যশ্চৈনং অনুপশ্যতি ॥
পঞ্চবিংশোঽভিমন্যেত নাঽন্যোঽস্তি পরতো মম।
ন চতুর্বিংশকো গ্রাহ্যো মনুজৈর্জ্ঞানদর্শিভিঃ ॥

* * * *

"যদা তু মন্যতেঽ নোঽহং অন্য এষ ইতি দ্বিজঃ।
তদা স কেবলীভূতঃ ষড়্‌বিংশমনুপশ্যতি ॥
অন্যশ্চ রাজন্যবর স্তথান্যঃ পঞ্চবিংশকঃ।
তৎস্থানাদনুপশ্যন্তি একএবেতি সাধবঃ ॥
তেনৈতন্নাভিনন্দন্তি পঞ্চবিংশকমচ্যুতং।
জন্মমৃত্যুভয়াদ্‌ভীতা যোগাঃ সাংখ্যাশ্চ কাশ্যপ।
ষড়্‌বিংশমনুপশ্যন্তঃ শুচয়স্তৎ পরায়ণাঃ ॥
যদা স কেবলীভূতঃ ষড়্‌বিংশমনুপশ্যতি।
তদা স সর্ব্ববিদ্‌ বিদ্বান্‌ পুনর্জন্ম ন বিন্দতি ॥"

ইহার অর্থ :—

প্রকৃতি কিছুই বোঝে না ; পঞ্চবিংশ (কিনা জীবাত্মা) প্রকৃতিকে বোঝে। পঞ্চবিংশ (কিনা জীবাত্মা) প্রকৃতিকে দেখে বটে ; কিন্তু তাহার আপনার দ্রষ্টাকে (অর্থাৎ পরমাত্মাকে) দেখে না। পঞ্চবিংশ (অর্থাৎ জীবাত্মা) মনে মনে এইরূপ অভিমান করে যে, আমার উপরে দ্রষ্টা আর কেহই নাই। তত্ত্বজ্ঞানীরা কিন্তু চতুর্বিংশকে (কিনা প্রকৃতিকে) গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন না। ব্রাহ্মণ-সন্তান যখন মনে এইরূপ বোঝেন যে, আমি স্বতন্ত্র আর এ (কিনা চতুর্বিংশ অর্থাৎ প্রকৃতি) স্বতন্ত্র, তখন তিনি কেবলীভূত হইয়া (অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে পৃথগ্‌ভূত হইয়া) ষড়্‌বিংশকে (অর্থাৎ পরমাত্মাকে) দর্শন করেন। সর্ব্বাধিপতি (অর্থাৎ পরমেশ্বর) স্বতন্ত্র, আর পঞ্চবিংশ (অর্থাৎ

জীবাত্মা) স্বতন্ত্র। এইস্থান হইতে, (ইংরাজি ভাষায়—from this stand point) সাধু ব্যক্তিরা দেখেন যে, পরমাত্মাই একমাত্র অদ্বিতীয় আত্মা ; আর সেইজন্য, যে সকল জন্মমৃত্যুভয়োদ্বিগ্ন শুচি ঈশ্বর-পরায়ণ যোগী এবং সাংখ্যজ্ঞানী ষড়বিংশকে (অর্থাৎ পরামাত্মাকে) দর্শন করেন তাঁহারা পঞ্চবিংশ'কে (কিনা জীবাত্মাকে) অভিনন্দন করেন না (অর্থাৎ আদর দেন না)। সাধক যখন সর্ব্ববিৎ এবং কেবলীভূত হইয়া (অর্থাৎ প্রকৃতিকে সম্যক্‌রূপে জ্ঞানে আয়ত্ত করিয়া প্রকৃতি হইতে পৃথক্‌ভূত হইয়া) 'ষড়্‌বিংশ'কে (অর্থাৎ পরমাত্মাকে) দর্শন করেন, তখন তিনি পুনর্জন্ম হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন।

ইহার টীকা।

সাংখ্যদর্শনের তত্ত্ব পঞ্চবিংশতি-সংখ্যক ইহা কাহারো অবিদিত নাই ; কিন্তু তথাপি "অধিকন্তু ন দোষায়" এই সাধুসম্মত পুরাতন বচনটিকে ইষ্ট-কবচ করিয়া সাংখ্যতত্ত্বাবলীর একটা তালিকা প্রদর্শন করিতেছি, প্রণিধান কর :—

পঞ্চভূত......	৫	
পঞ্চতন্মাত্র	৫	
কর্ম্মেন্দ্রিয়	৫	
জ্ঞানেন্দ্রিয়...	৫	......২০
মন.........	১	
অহঙ্কার......	১	... ৩
মহান্‌ বা প্রজ্ঞা	১	২৩
মুল প্রকৃতি		২৪শ
জ্ঞ বা আত্মা		২৫শ

সাংখ্যদর্শনের মতে পঞ্চবিংশেই সমস্ত তত্ত্বের পরিসমাপ্তি ; তাহার

ঊর্দ্ধে আর কোনো তত্ত্ব নাই—ষড়্‌বিংশ নাই। সাংখ্যকার বলেন যে, এই যে পঞ্চবিংশ তত্ত্ব—জ্ঞ, এই জ্ঞাতাপুরুষ প্রকৃতির আপাদমস্তক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জ্ঞানে আয়ত্ত করিয়া যখন দেখেন যে, "আর আমার প্রকৃতিতে কোনো প্রয়োজন নাই" তখন প্রকৃতি লজ্জিতা হইয়া তাঁহার সম্মুখ হইতে সরিয়া পলায়ন করে। এইরূপে যখন প্রকৃতির সঙ্গচ্যুত হইয়া জ্ঞাতাপুরুষ কেবলীভূত হ'ন অর্থাৎ অ্যাকলা কেবল আপনি-মাত্র হ'ন, তখন জ্ঞেয়বস্তুর অভাবে তাঁহার জ্ঞানও থাকে না, কর্ম্মও থাকে না, কিছুই থাকে না ; এমন কি—তাঁহার সত্তাও থাকে না, কেননা জ্ঞানে সত্তার প্রকাশ না-থাকাও যা, আর, সত্তা না থাকাও তা—একই। ইহার নাম সাংখ্যদর্শনের কৈবল্য মুক্তি। মহাভারতের শাস্ত্রকার পঞ্চবিংশের এই ব্যাপারটিকে ভিত্তিভূমি করিয়া তাহার উপরে ষড়্‌বিংশের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—বলিয়াছেন "জ্ঞাতাপুরুষ—প্রকৃতির মধ্যে যত কিছু জানিবার বস্তু আছে সমস্তই ধুইয়া পুঁছিয়া নিঃশেষে জানিয়া লইয়া প্রকৃতি হইতে যখন পৃথক্‌ভূত হ'ন, আর, সেই সময়ে যখন তিনি ষড়্‌বিংশকে (অর্থাৎ পরমাত্মাকে) দর্শন করেন তখন তিনি পুনর্জন্ম হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন অর্থাৎ মুক্ত হ'ন।" মহাভারত হইতে যে কয়েক ছত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম, তাহাতে সাংখ্যদর্শনের আগাগোড়া সমস্তই মানিয়া লইয়া তাহার সঙ্গে একটি নূতন কথা জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এই যে, কৈবল্য অবস্থায় জ্ঞাতাপুরুষ একদিকে যেমন প্রকৃতি হইতে অন্তশ্চক্ষু প্রত্যাকর্ষণ করেন, আর এক দিকে তেমনি প্রকৃতির অধীশ্বর পরমাত্মার প্রতি অন্তশ্চক্ষু নিবিষ্ট করেন। এ কথাটির ভিতরের ভাব এই যে, জ্ঞাতাপুরুষ যখন প্রকৃতি হইতে পৃথক্‌ভূত হ'ন, তখন একদিকে যেমন তাঁহার প্রাকৃত জ্ঞান অর্থাৎ বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইয়া

যায়, আর এক দিকে তেমনি তাঁহার পরম পরিশুদ্ধ অন্তরতম জ্ঞান বাধামুক্ত হইয়া যায়, আর, সেই অন্তরতম জ্ঞানে ষড়্‌বিংশ (অর্থাৎ পরমাত্মা) প্রকাশিত হ'ন। শেষোক্ত প্রকার মুক্তিকে কৈবল্য মুক্তি বলা শোভা পায় না এইজন্য—যেহেতু উহা কেবলমাত্র পঞ্চবিংশে পর্য্যাপ্ত নহে; তাহা দূরে থাকুক—ষড়্‌বিংশের দর্শন প্রাপ্তিই উহার মুখ্যতম অঙ্গ। গীতাশাস্ত্রে তাই যেখানেই যখন প্রসঙ্গক্রমে মুক্তির কথা আসিয়া পড়িয়াছে, সেইখানেই তখন কৈবল্য শব্দের পরিবর্ত্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণ শব্দ বসানো রহিয়াছে দেখা যায়।

প্রশ্ন। প্রকৃতির সঙ্গচ্যুত কৈবল্য অবস্থায় জীবাত্মার প্রাকৃত জ্ঞান (অর্থাৎ প্রকৃতি-সম্বন্ধীয় জ্ঞান কিনা বাহ্যজ্ঞান) তিরোহিত হইয়া যাইবারই কথা; কেননা প্রাকৃত জ্ঞান বা বাহ্যজ্ঞান প্রকৃতির সঙ্গসাপেক্ষ। কিন্তু মহাভারতের শাস্ত্রপ্রণেতা ঋষিদিগের দোহাই দিয়া তুমি বলিতেছ যে, প্রকৃতির সঙ্গচ্যুত কৈবল্য অবস্থায় একদিকে যেমন জ্ঞাতাপুরুষের বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হয়, আরএক দিকে তেমনি তাঁহার অন্তরতম বিশুদ্ধ জ্ঞান বাধামুক্ত হইয়া যায়।" কিন্তু জ্ঞানমাত্রেরই একটা-না-একটা জ্ঞেয়বস্তু থাকা চাই, যেমন—ঘট-জ্ঞানের জ্ঞেয়বস্তু ঘট, পটজ্ঞানের জ্ঞেয়বস্তু পট; সমগ্র বাহ্যজ্ঞানের জ্ঞেয়বস্তু—প্রকৃতি। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, তুমি যাহাকে বলিতেছ পরম পরিশুদ্ধ অন্তরতম জ্ঞান, তাহার জ্ঞেয়বস্তু কী? পরমাত্মা স্বয়ং কি তাহার জ্ঞেয়বস্তু? তাহা তুমি বলিতে পার না এইজন্য—যেহেতু জীবাত্মাই বা কি, আর, পরমাত্মাই বা কি—আত্মামাত্রই জ্ঞাতাপুরুষ, তা বই, কোনো আত্মাই ঘটপটাদির ন্যায় জ্ঞেয়বস্তু নহে।

উত্তর। পরে তোমাকে আমি দেখাইব যে, বিশুদ্ধ জ্ঞানের

জ্ঞেয়বস্তু বিশুদ্ধ সত্ত্ব। কিন্তু আপাতত সে কথাটা ধামা-চাপা দিয়া রাখিয়া তোমাকে আমি বলিতে চাই এই যে, ঘটপটাদি বিষয় সকলকে জ্ঞানে উপলব্ধি করিবার প্রণালী-পদ্ধতি স্বতন্ত্র এবং পরমাত্মাকে জ্ঞানে উপলব্ধি করিবার প্রণালী-পদ্ধতি স্বতন্ত্র। শারদ পূর্ণিমায় যখন চন্দ্রমণ্ডলে বিমল জ্যোৎস্নার দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায় তখন অবশ্য চন্দ্রমা প্রকাশক—পৃথিবী প্রকাশ্য বস্তু। কিন্তু নিশাবসানে সেই চন্দ্রমা যখন আপনার সমস্ত জ্যোৎস্নারাশি পৃথিবী হইতে গুটাইয়া লইয়া নবোদিত সূর্য্যকে আপনার সেই দীপ-নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া দ্যা'ন্—কে তখন প্রকাশক? রাত্রিকালে চন্দ্রই তো অধস্থ বস্তুসকলের প্রকাশক ছিলেন—কিন্তু নিশাবসানকালে চন্দ্র যখন আপনার সমস্ত জ্যোৎস্না উদ্যস্ত সূর্য্যকে নিবেদন করিয়া দিলেন, কে তখন প্রকাশক? চন্দ্র না সূর্য্য? অবশ্য সূর্য্য! চন্দ্র তখন প্রকাশক হওয়া দূরে থাকুক্—চন্দ্র তখন আকাশস্থিত শরদভ্রের ন্যায় প্রকাশ্য বস্তু মাত্র। এ যেমন দেখা গেল—তেমনি, জীবাত্মা যখন ঘটপটাদি বিচিত্র বিষয়-সকলকে জ্ঞানে উপলব্ধি করে, তখন—এ তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে যে, জীবাত্মা জ্ঞাতাপুরুষ, ঘটপটাদি বিষয়-সকল জ্ঞেয় প্রকৃতি; কিন্তু, সেই জীবাত্মা যখন ঘটপটাদি বিষয়-সকল হইতে আপনার সমস্ত জ্ঞান অপকর্ষণ করিয়া লইয়া—বুদ্ধি মন অহঙ্কারাদি চিত্তবৃত্তির নৈবেদ্যের ডালা পরমপুরুষ পরমাত্মাকে প্রীতিভক্তি সহকারে নিবেদন করিয়া দ্যায়, কে তখন জ্ঞাতাপুরুষ, আর, কে'ই বা তখন জ্ঞেয় প্রকৃতি? তখন অবশ্য পরমাত্মা জ্ঞাতাপুরুষ—জীবাত্মা জ্ঞেয় প্রকৃতি। এ যাহা আমি বলিতেছি ইহার যদি শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখিতে চাও, তবে একটু পূর্ব্বে তাহা আমি তোমাকে দেখাইতে বাকি রাখি নাই। তার সাক্ষী:—অনতিপূর্ব্বে যে একটি শ্লোক

তোমাকে আমি গীতা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি (অর্থাৎ "মাংচ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান্ সমতীত্যৈ-তান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥" গীতার এই চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের ষড়্বিং শ্লোকে বলা হইয়াছে এই যে, যে সাধু পুরুষ ঈশ্বরের সেবায় কায়মনোবাক্যে রত হ'ন তিনি গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাবাপন্ন হ'ন অর্থাৎ প্রকৃতিভাবাপন্ন হ'ন। তা ছাড়া, ভাগবত সম্প্রদায়ের ভক্তিশাস্ত্রের এ কথাটা দেশময় রাষ্ট্র যে, ভক্তেরা প্রকৃতিভাবাপন্ন হইয়া ভগবানের সমীপস্থ হ'ন। ফল কথা এই যে, ত্রিগুণ-সোপানের নীচের ধাপে যেমন জীবাত্মাই জ্ঞাতাপুরুষ—ঘটপটাদি বিষয়সকল জ্ঞেয় প্রকৃতি; ত্রিগুণ-সোপানের উপরের ধাপে তেমনি পরমাত্মাই জ্ঞাতা-পুরুষ—জীবাত্মা জ্ঞেয় প্রকৃতি। ভগবদ্গীতায় স্পষ্ট লেখা আছে,—

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেবচ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়ং; ইতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিংবিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥"

ইহার অর্থ:—

[শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়া পরমাত্মা বলিতেছেন] আমার এই যে অষ্টধা-ভিন্না প্রকৃতি—ভূমি জল অগ্নি বায়ু আকাশ মন বুদ্ধি এবং অহঙ্কার, এ প্রকৃতি অপরা প্রকৃতি; কিন্তু ইহা ব্যতীত আমার আর এক প্রকৃতি আছে—তাহা জীবভূতা পরা প্রকৃতি, আর, সেই জীব-ভূতা পরা প্রকৃতিই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এখানে পঞ্চভূত মন বুদ্ধি এবং অহঙ্কার সম্বলিত সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতিকে বলা হইতেছে অপরা প্রকৃতি, আর, জীবাত্মাকে বলা হইতেছে পরা প্রকৃতি; আবার সেই সঙ্গে এই নিগূঢ় রহস্য বার্ত্তাটিও স্পষ্টাক্ষরে

জ্ঞাপন করা হইতেছে যে, পরমাত্মার সেই জীবভূতা পরা প্রকৃতিই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

প্রশ্ন। এই অষ্টবিধ পদার্থসম্বলিত সাংখ্যের প্রকৃতিকেই বা অপরা বলা হইতেছে কেন, আর সাংখ্যের সেই যে পঞ্চবিংশ তত্ত্ব—জ্ঞ কিনা জীবাত্মা, যাহা কোনো জন্মেই প্রকৃতি নহে, তাহাকেই বা পরা প্রকৃতি বলা হইতেছে কেন? এক প্রকৃতিকে দুই করিয়া দাঁড় করাইবার অর্থ যে কি তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

উত্তর। ত্রিগুণের উপর-নীচের দুইটি ধাপের প্রতি তুমি যদি একবার মনোযোগের সহিত ঠাহর করিয়া দেখ, তাহা হইলে জিজ্ঞাসিত রহস্য-বার্ত্তাটির অর্থ বুঝিতে তোমার ক্ষণমাত্রও বিলম্ব হইবে না, অতএব প্রণিধান কর :—

ত্রিগুণের নীচের ধাপে জীবাত্মা জ্ঞাতা পুরুষ, আর, (১) ভৌতিক প্রকৃতি কিনা পঞ্চভূত, (২) মানসিক প্রকৃতি কিনা সংকল্পবিকল্পাদি, (৩) বৈজ্ঞানিক প্রকৃতি কিনা বুদ্ধি এবং কর্ত্তৃত্বাভিমান বা অহঙ্কার—এই তিন প্রকার প্রকৃতি জ্ঞেয় প্রকৃতি। পক্ষান্তরে, ত্রিগুণের উপরের ধাপে পরমাত্মা জ্ঞাতা পুরুষ, আর জীবাত্মা জ্ঞেয় প্রকৃতি।

ঐ যে অষ্টশাখান্বিতা ত্রিবিধা প্রকৃতি (কিনা ভৌতিক প্রকৃতি, মানসিক প্রকৃতি, বৈজ্ঞানিক প্রকৃতি) উহা নীচের ধাপের প্রকৃতি বলিয়া উহার ললাটে ছাপ বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে "অপরা"; আর এই যে জীবভূতা প্রকৃতি (কিনা জীবাত্মা) ইহা উপরের ধাপের প্রকৃতি বলিয়া ইহার ললাটে ছাপ বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে "পরা"।

প্রশ্ন। শ্রীকৃষ্ণ এই যে বলিতেছেন—"আমার আর এক প্রকৃতি আছে—তাহা জীবভূতা পরা প্রকৃতি, এখানে পরা প্রকৃতি যে, জীবাত্মা, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু তাহার সঙ্গে

আরেক-ধাঁচার এই যে একটি কথা জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে যে, পরা প্রকৃতি জগৎ-সংসার ধারণ করিয়া রহিয়াছে, এ কথার অর্থ আমি মূলেই বুঝিতে পারিতেছি না। প্রাণপণ যত্ন করিয়াও যে লোক আপনার ক্ষুদ্র শরীরটিকে জরামৃত্যুর আক্রমণ হইতে বাঁচাইতে পারে না—জগৎসংসার ধারণ করিয়া থাকা কি তাহার সাধ্য ?

উত্তর। গীতাতে পরা এবং অপরা এই দুইরূপ প্রকৃতিরই কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তা বই, অপরাপ্রকৃতি ৮—জীবাত্মা ১০০০০০০, একুনে ১০০০০০৮—এই দশলক্ষ-অষ্টরূপা প্রকৃতির কথা উল্লেখ করা হয় নাই। উদ্ধৃত গীতা-বাক্যটির ভাবার্থ খুবই স্পষ্ট ; তাহা এই যে, অপরা প্রকৃতিও একের অধিক নহে—পরাপ্রকৃতিও একের অধিক নহে। একই অপরা প্রকৃতির তিন মূর্ত্তি ;—তাহার ভৌতিক মূর্ত্তি হ'চ্চে ভূমি জল অগ্নি বায়ু আকাশ, মানসিক মূর্ত্তি হ'চ্চে সংকল্পবিকল্প, বৈজ্ঞানিক মূর্ত্তি হ'চ্চে বুদ্ধি এবং অহঙ্কার। তেমনি আবার, একই পরা প্রকৃতির তিন মূর্ত্তি ; পরা প্রকৃতির সত্বগুণপ্রধান মূর্ত্তি হ'চ্চে রামচন্দ্র যুধিষ্ঠির প্রভৃতি অনেকানেক ধর্ম্মপরায়ণ সাধু ব্যক্তি ; রজোগুণপ্রধান মূর্ত্তি হ'চ্চে রাবণ দুর্য্যোধন প্রভৃতি অনেকানেক অধর্ম্মপরায়ণ দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি ; তমোগুণপ্রধান মূর্ত্তি হ'চ্চে—কুম্ভকর্ণ হিড়িম্বা প্রভৃতি অধমশ্রেণীর রাক্ষসপিশাচের দল। এখন দেখিতে হইবে এই যে, যেমন ত্রিগুণ সোপানের নীচের ধাপের সমগ্র জ্ঞেয় প্রকৃতি (অর্থাৎ যে ধাপে জীবাত্মা জ্ঞাতাপুরুষ সেই ধাপের সমগ্র জ্ঞেয় প্রকৃতি) সত্বরজস্তমোগুণের সাম্যাবস্থা,—ত্রিগুণ-সোপানের উপরের ধাপের সমগ্র জ্ঞেয় প্রকৃতি (অর্থাৎ যে ধাপে পরমাত্মা জ্ঞাতা-পুরুষ সেই ধাপের সমগ্র জ্ঞেয় প্রকৃতি) শুদ্ধ সত্ব। এ যাহা আমি বলিলাম ইহার প্রকৃত মর্ম্ম এবং তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে ত্রিগুণ-

তত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে বছর-দুএক পূর্ব্বে আমি যে-কয়েকটি সার-সার কথা বিবৃত করিয়া বলিয়াছি, এইখানে তাহা আর একবার ভাল করিয়া পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা নিতান্তই আবশ্যক। তখন আমি বহুযত্নে ত্রিগুণতত্ত্বের একটা স্বচ্ছ পুষ্করিণী যাহা কাটাইয়াছিলাম, এতদিনে তাহা শ্রোতৃবর্গের বিস্মৃতিপঙ্কে ভরাট্ হইয়া যাইবারই কথা। অতএব আজ থাক্;—আগামী অধিবেশনে সেই তত্ত্ববাপীটিকে নূতন করিয়া ঝালাইয়া আমি দেখাইব যে, শুদ্ধ সত্ত্বই ত্রিগুণ-সোপানের উপরের ধাপের জ্ঞেয় প্রকৃতি, আর, তাহাই গীতা-শাস্ত্রের সেই জীবভূতা পরা প্রকৃতি যাহা-দ্বারা সমস্ত জগৎসংসার বিধৃত রহিয়াছে।

বিংশতি অধিবেশন।

ব্যাখ্যান।

কৃষক ধান্যের চাসা—ভাষক ভাষার চাসা। ভাষকের লাঙ্গল লেখনী। ধান্যের অধিদেবতা লক্ষ্মী—ভাষার অধিদেবতা সরস্বতী। সরস্বতী লক্ষ্মীর দিদি হ'ন, আর সেই সূত্রে ভাষক কৃষকের দাদা হ'ন। আমি তাই মনে করিতেছি যে, আমার সম্মুখস্থিত ভুবনডাঙ্গাগ্রামের কৃষক ভায়া'রা যেরূপ প্রণালীতে চাস-কার্য্য নির্ব্বাহ করে—আমার হস্তের চাসকার্য্যটি এবারে আমি সেইরূপ প্রণালীতে নির্ব্বাহ করিব। তাহারা যেমন বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে কর্ষিত ক্ষেত্রে ধান্যের বীজ বপন করিয়া ধান্যবৃক্ষ অঙ্কুরিত করিয়া তোলে, এবং তাহার পরে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে সেই নবাঙ্কুরিত ধান্যবৃক্ষ স্বস্থান হইতে মূলসমেত উঠাইয়া লইয়া স্থানান্তরে রোপণ করিয়া তাহাতে যথোচিত পরিমাণে ধান্য ফলাইয়া তোলে, আমি তেমনি—গীতাপাঠের উপক্রমণিকা-ভাগে ত্রিগুণতত্ত্বের ধান্যবৃক্ষটি যতটা-পর্য্যন্ত অঙ্কুরিত করিয়া তুলিয়াছিলাম—তাহা সর্ব্বসমেত সেখান হইতে উঠাইয়া আনিয়া এই উপসংহারভাগের সরস ভূমিতে রোপণ করিয়া তাহাতে অভীষ্ট ফল ফলাইয়া তুলিতে ইচ্ছা করিতেছি।

উপক্রমণিকা-ভাগে আমি ত্রিগুণতত্ত্বের গোড়া ফাঁদিয়াছিলাম এইরূপে :—

কবি-শব্দ হইতে কবিতা এবং কবিত্ব এই দুইটি শব্দ উৎপত্তিলাভ করিয়াছে—ইহা সকলেরই জানা কথা। এটাও তেমনি জানা উচিত যে, সৎশব্দ হইতে সত্তা এবং সত্ত্ব এই দুইটি শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে ;—দেখা উচিত যে, কবিতা এবং কবিত্বের মধ্যে যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ—সত্তা

এবং সত্ত্বের মধ্যেও অবিকল সেইরূপ। কবির কবিতা যখন প্রকাশে বাহির হয়, তখন তাহা-দৃষ্টে আমরা যেমন বুঝিতে পারি যে, কবির ভিতরে কবিত্ব রহিয়াছে, তেমনি যে-কোনো বস্তুর সত্তা যখনই আমাদের নিকটে প্রকাশ পায় তখনই আমরা বুঝিতে পারি যে, সে-বস্তুর ভিতরে সত্ত্ব রহিয়াছে—সে বস্তু সৎপদার্থ। অতএব এটা স্থির যে, কবিতার প্রকাশ যেমন কবিত্বগুণের পরিচয়-লক্ষণ—সত্তার প্রকাশ তেমনি সত্ত্বগুণের পরিচয়-লক্ষণ। সত্ত্বগুণের আর একটি পরিচয়-লক্ষণ আছে—সেটি হ'চ্চে সত্তা'র রসাস্বাদন-জনিত আনন্দ। কবিতার রসাস্বাদনে যখন ভাবুক ব্যক্তির আনন্দ হয়, তখন সেই আনন্দমাত্রটি যেমন কবির অন্তর্নিহিত কবিত্বগুণের পরিচয় প্রদান করে, তেমনি সত্তার রসাস্বাদনে চেতনাবান্ ব্যক্তির যখন আনন্দ হয়, তখন সেই আনন্দমাত্র-টি সদ্‌বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্ত্বগুণের পরিচয় প্রদান করে। আমরা প্রতিজনে আপনার আপনার ভিতরে মনোনিবেশ করিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, প্রকাশ এবং আনন্দ সত্তার সঙ্গের সঙ্গী। "আমি এযাবৎকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তিয়া রহিয়াছি" এই বর্ত্তিয়া-থাকা ব্যাপারটি আমি যেমন আমার মধ্যে উপলব্ধি করিতেছি, তুমিও তেমনি তোমার মধ্যে উপলব্ধি করিতেছ। ইহারই নাম আত্ম-সত্তার প্রকাশ। আবার, "আমি যেমন এ যাবৎকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তিয়া রহিয়াছি তেমনি সর্ব্বকালেই যেন বর্ত্তিয়া থাকি" আমাদের আপনার আপনার প্রতি আপনার আপনার এই যে মঙ্গল আশীর্ব্বাদ—এই আশীর্ব্বাদ আমাদের প্রতিজনের আত্মসত্তার উপরে নিরন্তর লাগিয়া রহিয়াছে। আত্মসত্তাতে যদি আমাদের আনন্দ না হইত তবে ঐ শুভ ইচ্ছাটি (অর্থাৎ বর্ত্তিয়া থাকিবার ইচ্ছা) আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে স্থান পাইতে পারিত না। এইরূপ আমরা দেখিতেছি যে,

আমাদের প্রতিজনের আপনার আপনার মধ্যেই সত্তার সঙ্গে সত্তার প্রকাশ এবং সত্তার রসাস্বাদনজনিত আনন্দ মাখামাখিভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে, আর, সেই গতিকে এটা আমরা বেস্ বুঝিতে পারিতেছি যে, আমাদের ভিতরে সত্ত্ব আছে—আমরা সৎপদার্থ। আমাদের দেশের সকল শাস্ত্রেই তাই এ-কথাটা বেদবাক্যের ন্যায় মানিয়া লওয়া হইয়াছে যে, প্রকাশ এবং আনন্দই সত্ত্বগুণের ডা'ন হাত বাঁ হাত। সত্ত্বগুণ কাহাকে বলে—এই তো তাহা দেখিলাম ;—এখন রজস্তমোগুণ কাহাকে বলে তাহা দেখা যা'ক। নানা কবির নানা কবিতা আছে কিন্তু তাঁহাদের সকলেরই কবিতা দেশকালপাত্রে পরিচ্ছিন্ন—এই অর্থে ব্যষ্টি-কবিতা। পক্ষান্তরে, কবিরা যাঁহার খাইয়া মানুষ, তাঁহার কবিতা সর্ব্বদেশের এবং সর্ব্বকালের কবিতা—এই অর্থে সমষ্টি কবিতা। কবিরা যাঁহার খাইয়া মানুষ তিনি মনুষ্য-বিশেষ নহেন—তিনি প্রকৃতি-দেবী স্বয়ং। কাব্যানুরাগী বিদ্বজ্জন-সমাজে এ কথা কাহারো নিকটে অবিদিত নাই যে, কালিদাসের কবিতাতেও শেক্সপিয়রীয় কবিত্বগুণের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না—শেক্সপিয়রের কবিতাতেও কালিদাসীয় কবিত্বগুণের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না। ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, প্রকৃতিদেবীর কণ্ঠনিঃসৃত নানারসপূর্ণ সমষ্টি-কবিতা যেমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কবিত্বরসের অভিব্যঞ্জক—ব্যষ্টি-কবিতা সেরূপ নহে ; ব্যষ্টি-কবিতা কবিত্বরসের দেশকালপাত্রোচিত ছিটাফোঁটা মাত্রেরই অভিব্যঞ্জক। কবিতা-সম্বন্ধে এ-যেমন আমরা দেখিলাম, সত্তা-সম্বন্ধেও তেমনি আমরা দেখিতে পাই এই যে, এক-শাখার পুষ্প যেমন অপর কোনো শাখার নহে, তেমনি আমার সত্তাও তোমার নহে, তোমার সত্তাও আমার নহে, আর, তৃতীয় কোনো ব্যক্তির যদি নাম কর তবে তাহার

সত্তা তোমারও নহে—আমারও নহে। ব্যষ্টি-সত্তামাত্রই এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেশকালপাত্রে পরিচ্ছিন্ন; আর সেইজন্য ব্যষ্টিসত্তা বাধাক্রান্ত সত্ত্বগুণ ব্যতীত—মিশ্রসত্ত্ব ব্যতীত—অবাধিত সত্ত্ব-গুণের, শুদ্ধসত্ত্বের, পরিচায়ক নহে। পক্ষান্তরে, যেমন সকল-শাখার পুষ্পই বৃক্ষের পুষ্প, আর সেইজন্য বৃক্ষের পুষ্পরাজিই সমষ্টি-পুষ্প, আর, সকল-শাখার সকল-পুষ্পই সেই সমষ্টি-পুষ্পের অন্তর্ভূত, তেমনি, প্রকৃতির অধীশ্বর যিনি পরমাত্মা তাঁহার সত্তাই সমষ্টি-সত্তা এবং আর আর সকল-সত্তাই সেই সমষ্টি-সত্তার অন্তর্ভূত। কাজেই দাঁড়াইতেছে যে সমষ্টিসত্তাই অবাধিত সত্ত্বগুণের—অবাধিত প্রকাশ এবং আনন্দের—অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র। ব্যষ্টিসত্তা কিন্তু সেরূপ নহে; ব্যষ্টিসত্তা বাধাক্রান্ত সত্ত্বগুণেরই অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র। পূর্ব্বে বলিয়াছি সত্ত্বগুণের পরিচায়ক লক্ষণ দুইটি—(১) প্রকাশ এবং (২) আনন্দ। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রকাশ'কে বাধাপ্রদান করে কে? অবশ্য অচৈতন্য-বা-জড়তা এবং অবসাদ-বা-স্ফূর্ত্তিহীনতা। আনন্দ'কে বাধা প্রদান করে কে? অবশ্য দুঃখ-বা-পীড়ানুভব এবং অশান্তি-বা-প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্য। সত্ত্বগুণের এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকে শাস্ত্রীয় ভাষায় যথাক্রমে বলা হইয়া থাকে তমোগুণ এবং রজোগুণ। বিশুদ্ধ প্রকাশ এবং বিমল আনন্দের আর-এক নাম যেমন সত্ত্বগুণ, অচৈতন্য এবং অব-সাদের আর-এক নাম তেমনি তমোগুণ; আবার, দুঃখ এবং প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্যের আর-এক নাম তেমনি রজোগুণ। তমোগুণ যে কী অর্থে তমোগুণ তাহা তমঃশব্দের গায়ে লেখা রহিয়াছে—তমোগুণ প্রকাশের প্রতিদ্বন্দ্বী এই অর্থেই তমোগুণ। রজোগুণ কী-অর্থে রজোগুণ তাহাও রজঃশব্দের গায়ে লেখা রহিয়াছে। পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে ধোপাদের বংশানুযায়ী কার্য্য কাপড় কাচা তো ছিলই,

তা ছাড়া তাহাদের আর একটি কার্য্য ছিল বস্ত্র-রঙানো; আর সেই-জন্য সংস্কৃত ভাষায় ধোপা'র নাম রজক—বস্ত্র রঞ্জন করে (কিনা রঙায়) এই অর্থে রজক। রঙ্ সম্বন্ধে জর্ম্মাণ দেশীয় মহাকবি গেটের একটি সুপরীক্ষিত সিদ্ধান্ত এই যে, বর্ণক্ষেত্র সামান্যত তিনভাগে বিভক্ত; সে তিন ভাগ হ'চ্চে—একদিকে সাদা, আর এক দিকে কালো, আর, দুয়ের মধ্যস্থলে রক্ত নীল পীত প্রভৃতি রঞ্জন বা রঙ। তাহার মধ্যে দেখিতে হইবে এই যে কালো রঙ্ রঙই নহে—তাহা অন্ধকারেরই আর-এক নাম। সাদা রঙ কালো রঙের ঠিক উল্টা পিঠ; সুতরাং তাহাও প্রকৃতপক্ষে রঙ নহে। সাদা রঙ বিচিত্র বর্ণ-রাজির লয়স্থান;—তাহা শুভ্র আলোক—তাহা রঙ্ নহে। বর্ণক্ষেত্র যেমন তিনভাগে বিভক্ত—গুণক্ষেত্রও অবিকল সেইরূপ। গুণক্ষেত্রের এধারে রহিয়াছে সত্ত্বগুণের নিরঞ্জন আলোক, ওধারে রহিয়াছে তমো-গুণের অঞ্জন, এবং দুয়ের মধ্যস্থলে রহিয়াছে রজোগুণের রঞ্জন। অথবা, যাহা একই কথা—একদিকে রহিয়াছে সত্ত্বগুণের প্রকাশ-জ্যোতি, আর-এক দিকে রহিয়াছে তমোগুণের জড়তান্ধকার, এবং দুয়ের মধ্যস্থলে রহিয়াছে রজোগুণের রাগদ্বেষাদি প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্য। তাহার মধ্যে দ্বেষ তমোগুণ-ঘঁ্যাসা রজোগুণ—তাই তাহা অন্ধকার ঘঁ্যাসা নীলবর্ণের সহিত উপমেয়; অনুরাগ সত্ত্বগুণ-ঘঁ্যাসা রজোগুণ—তাই তাহা আলো-ঘঁ্যাসা পীতবর্ণের সহিত উপমেয়। রূপকচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে, সদাশিব মহাদেব দ্বেষকে গিলিয়া খাইয়াছেন, তাই তিনি নীলকণ্ঠ; আর, গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের পরিধানবস্ত্রে অনু-রাগের রঙ ধরিয়াছে, তাই তিনি পীতাম্বর। রজোগুণের নিজমূর্ত্তি কিন্তু রাগ। তা'র সাক্ষী, রজোগুণের প্রধান যে-দুইটি অন্তরঙ্গ—কাম আর ক্রোধ—উভয়েই রাগধর্ম্মী। কাম তো রাগধর্ম্মী বটেই,

তা ছাড়া—বঙ্গভাষায় ক্রোধের আর-এক নাম রাগ। আত্মসত্তা যখন আত্মেতর সত্তা দ্বারা রঞ্জিত হয়, আর সেইগতিকে যখন জ্ঞাতা পুরুষ কামোন্মত্ত বা ক্রোধোন্মত্ত হইয়া পাগলের ন্যায় জ্ঞানশূন্য এবং আত্ম-বিস্মৃত হইয়া যায়, তখনকার সেই যে প্রবৃত্তি চাঞ্চল্যের অবস্থা, তাহা-রই নাম রাগাতিশয্য। রজোগুণের সাক্ষাৎ নিজমূর্ত্তি এই যে রাগ, ইহা লালরঙের সহিত উপমেয়। লাল শব্দ—আলক্ত (অর্থাৎ আল্‌তা) শব্দের অপভ্রংশ তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। আলক্তও যা—আরক্তও তা—একই। ফলে;—লাল, রক্ত, রাঙা, রাগ, রঞ্জন, রজঃ—সবাই-যে-এরা একই মূল ধাতুর সন্তান-সন্ততি, তাহা উহাদের গায়ে লেখা রহিয়াছে বলিলেই হয়। যদি মূর্ত্তিমান্ রজোগুণ দেখিতে চাও তবে একটা ঠাণ্ডা প্রকৃতির বৃষের সম্মুখে লাল রঙের নিশান ঝাঁকাইয়া চট্‌পট্ বৃক্ষারোহণ কর, তাহা হইলেই রহস্যটা দেখিতে পাইবে। অতএব, লাল রঙের সহিত রজোগুণের খুব যে নিকট সম্পর্ক, তাহাতে আর ভুল নাই। অতঃপর সত্ত্বাদি গুণ-তিনটির পরস্পরের সহিত পরস্পরের বনিবনাও কিরূপ তাহা দেখা যা'ক্। একটু পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, ব্যষ্টি-সত্তা-মাত্রই বাধাক্রান্ত সত্ত্ব-গুণের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র। তা ছাড়া, সত্ত্বগুণের বাধা জন্মায় কে কোন্ দিক্ দিয়া—তাহাও আমরা দেখিয়াছি; দেখিয়াছি যে সত্ত্বগুণের প্রধান দুইটি অবয়বের—প্রকাশ এবং আনন্দের—প্রথমটির (কিনা প্রকাশের) প্রতিদ্বন্দ্বী তমোগুণ বা অসাড়তা এবং জড়তা; দ্বিতীয়-টির (কিনা আনন্দের) প্রতিদ্বন্দ্বী রজোগুণ বা দুঃখ এবং অশান্তি। সত্ত্বগুণের সঙ্গে রজস্তমোগুণের এই যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এ তো আছেই, তা ছাড়া রজস্তমোগুণের আপনা-আপনির মধ্যে প্রতি-দ্বন্দ্বিতা যে, কম, তাহা নহে। রজোগুণের ক্ষুধাতুর ক্রোধোন্মত্ত

কুকুর-দুটার সঙ্গে তমোগুণের ভোগতৃপ্ত সুখোপবিষ্ট বিড়াল-দুটার (দুঃখ এবং অশান্তির সঙ্গে অসাড়তা এবং জড়তা'র) যে, কিরূপ আদা-কাঁচকলা সম্বন্ধ, তাহা কাহারো দেখিতে বাকি নাই। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, ব্যষ্টি-সত্তার অধিকার-ক্ষেত্রে ত্রিগুণের তিনটিই অপর দুইটির প্রতিদ্বন্দী; এক কথায়—তিনটিই তিনটির প্রতিদ্বন্দী। সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের পরস্পরের সহিত পরস্পরের প্রতিদ্বন্দিতার কথা এ যাহা বলিলাম, তাহা ব্যষ্টি-সত্তার সম্বন্ধেই খাটে—সমষ্টি-সত্তার সম্বন্ধে খাটে না। আমার ভিতরে আমার আপনার সত্তা যেরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রকাশ পায়, তোমার সত্তা সেরূপ না; তথৈব তোমার ভিতরে তোমার আপনার সত্তা যেরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রকাশ পায়, আমার সত্তা সেরূপ না। তবেই হইতেছে যে, তোমার-আমার উভয়েরই মধ্যে আত্মসত্তার খদ্যোত প্রকাশ পরসত্তার অপ্রকাশ দ্বারা বাধাগ্রস্ত—সত্ত্বগুণ তমোগুণ দ্বারা বাধাগ্রস্ত। তোমার-আমার ভিতরে সত্ত্বগুণ শুধুই যে কেবল তমোগুণ দ্বারা বাধাক্রান্ত তাহা নহে—রজোগুণ দ্বারাও তাহা পদে পদে বাধাক্রান্ত। আমাদের আত্মসত্তা যে-অংশে আমাদের জ্ঞানগোচরে লব্ধপ্রকাশ, সেই অংশে তাহা সত্ত্বগুণ; বহির্ব্বস্তুসকলের আত্মসত্তা যে-অংশে অপ্রকাশ, সে-অংশে তাহা তমোগুণ, আর, আমাদের আত্মসত্তা যে অংশে বহির্ব্বস্তুসকলের অপরিস্ফুট আত্মসত্তা-দ্বারা রঞ্জিত হয় সেই অংশে তাহা রজোগুণ। "আমি আছি" এটা যেমন আমরা অন্তরিন্দ্রিয়ে উপলব্ধি করি, "আমাদের বাহিরে নানা রঙের নানা বস্তু আছে" এটা তেমনি আমরা বহিরিন্দ্রিয়ে উপলব্ধি করি। পরন্তু তদ্ব্যতীত—বহিরিন্দ্রিয়গোচর ঐ সকল নানা রঙের নানা বস্তুর কাহার ভিতরে কী আছে না-আছে—সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহার কিছুই আমরা জানি

না। আমাদের মন কিন্তু "জানি না" বলিতে বড়ই নারাজ; মন তাই "এটা আমি জানি না" না বলিয়া অনুমানের স্কন্ধে ভর করিয়া বলে "সম্ভবত এটা এই।" অহঙ্কার কিন্তু "সম্ভবত" কথাটা পছন্দ করে না। অহঙ্কার "সম্ভবত এটা এই" না বলিয়া গায়ের জোরে বলে "নিশ্চয়ই এটা এই।" বুদ্ধি বা বিজ্ঞান অহঙ্কারের ঐ "নিশ্চয়ই" কথাটার প্রতি কর্ণপাত না করিয়া আলোচ্য সিদ্ধান্তটাকে বিচারের তুলা দণ্ডে তৌল করিয়া এবং পরীক্ষার কষ্টিপাথরে কষামাজা করিয়া বলে "এ সিদ্ধান্তটার এই অংশটুকু প্রামাণিক—বাকি অংশ আনুমানিক;—এই বাকি অংশটি যখন পরীক্ষার অনল-দহনে পরিশোধিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত স্থিরাংশের অঙ্গের সামিল হইবে, তখন আলোচ্য সিদ্ধান্তটি বিজ্ঞসমাজে নিখুঁত খাঁটি সত্য বলিয়া সমাদৃত হইবে।" বিজ্ঞান কিন্তু মনে মনে এটা বিলক্ষণই জানে যে, আলোচ্য সিদ্ধান্তটার প্রামাণিক অংশটি মুষ্টিমেয়—বাকি অংশ অগাধ এবং অপরিমেয়; সুতরাং পরীক্ষাও কোনো জন্মে শেষ হইবে না—নিখুত খাঁটি সত্যও কোনো জন্মে অনুসন্ধাতার করায়ত্ত হইবে না। তা ছাড়া বিজ্ঞানের সেবকদিগের সকলেরই এটা দেখা কথা যে, যে কোনো বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের যে কোনো অংশ যতই কেন পাকাপোক্ত প্রামাণিক সত্য করিয়া গড়িয়া দাঁড় করানো হো'ক্ না—নূতন নূতন পরীক্ষার নূতন নূতন আলোকে তাহার মধ্য হইতে নূতন নূতন গলদ্ বাহির হইয়া পড়িতে থাকা অনিবার্য্য। এই রকম অজ্ঞাতকুলশীল বহির্ব্বস্তুসকলের তমসাচ্ছন্ন আত্মসত্তা ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া আমাদের জ্ঞানোজ্জ্বল আত্মসত্তার বৈঠক-ঘরে ধূলাপায়ে আনাগোনা করিতেছে—দিন নাই, সন্ধ্যা নাই, রাত্রি নাই! আমাদের আত্মসত্তার জ্ঞানচক্ষুটিকে ধূলায়-ধূলায় অন্ধীভূত করিয়া ইহাদের কার্য্যই হ'চ্চে—পায়ে পড়িয়া কাজ গুছানো,

গায়ে পড়িয়া বন্ধুতা পাতানো, এবং দায়ে ফেলিয়া সরিয়া দাঁড়ানো। রজোগুণের এইরূপ দুর্মোচ্য মায়াজালে জড়াইয়া পড়িয়া আমাদের আত্মসত্তার বিশুদ্ধ প্রকাশ এবং বিমল আনন্দ (এককথায়—সত্ত্বগুণ) সাত হাত জলের নীচে চাপা পড়িয়া যায়। ব্যষ্টি-সত্তার অধিকার-ক্ষেত্রে সত্ত্বগুণ এইরূপ-যে রজস্তমোগুণ দ্বারা বাধাক্রান্ত হয়;—আত্মার বিমল আনন্দ দুঃখ-এবং-অশান্তি-দ্বারা—আত্মার বিশুদ্ধ জ্ঞান-জ্যোতি অজ্ঞান-অন্ধকার এবং জড়তা দ্বারা—এইরূপ যে আক্রান্ত হয়, তাহার গোড়ার কারণ এই যে, ব্যষ্টিসত্তার অধিকার ক্ষেত্রে আত্মসত্তা এবং পর-সত্তা উভয়ে উভয়ের প্রতিদ্বন্দী। পক্ষান্তরে সমষ্টি-সত্তার নিজাধিকারে, সমস্ত আত্মসত্তা এবং পরসত্তা একীভূত হইয়া এক মহতী আত্মসত্তায় পর্য্যবসিত;—সমষ্টিসত্তার পরও নাই—প্রতিদ্বন্দীও নাই। ইহা হইতেই আসিতেছে যে, সমষ্টিসত্তা পরম পরিশুদ্ধ সত্তা;—তাহা রজস্তমোগুণ দ্বারা অবাধিত বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ, এক কথায়—শুদ্ধসত্ত্ব। বেদান্তাদি শাস্ত্রের এটা একটা সুপ্রসিদ্ধ কথা যে, শুদ্ধ সত্ত্বে পরমাত্মার মহাজ্ঞান, মহাশক্তি এবং মহানন্দ নিখুঁত পরিষ্কার-রূপে প্রতিফলিত হয়।

প্রশ্নকর্ত্তার প্রতি॥ গীতাপাঠের উপক্রমণিকা ভাগে যে-রকম করিয়া আমি ত্রিগুণতত্ত্বের গোড়া ফাঁদিয়াছিলাম তাহা (কতক কতক পরিবর্ত্তন এবং কতক কতক পরিবর্দ্ধন করিয়া) দেখাইলাম; এখন, বিগত অধিবেশনে শ্রোতৃবর্গের সমক্ষে ধারাবাহিক প্রশ্নোত্তরচ্ছলে তোমার আমার মধ্যে যে-বিষয়টির বোঝাপড়া চলিতেছিল, তাহাতে প্রত্যাবর্ত্তন করা যা'ক্। কিয়ৎপূর্ব্বে মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব হইতে কয়েক ছত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তদুপলক্ষে যাহা আমি বলিয়াছিলাম তাহা তোমার স্মরণ না থাকিতে পারে—এইজন্য

এখানে তাহা আর একবার বলা শ্রেয়বোধ করিতেছি। কথাটা এই :—

শান্তিপর্ব্বের ৩১৮ অধ্যায় হইতে যে-কয়েক ছত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছিলাম, তাহার ভিতরে সাংখ্যদর্শনের সমস্ত কথাই আদ্যোপান্ত মানিয়া লইয়া তাহার সঙ্গে নূতন একটি কথা জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এই যে, জ্ঞাতা পুরুষ যখন প্রকৃতি হইতে পৃথক্‌ভূত হ'ন, তখন একদিকে যেমন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়, আর একদিকে তাঁহার পরম পরিশুদ্ধ অন্তরতম জ্ঞান বাধামুক্ত হইয়া যায় ; তাহা যখন হয় তখন সেই বাধাবিমুক্ত বিশুদ্ধ জ্ঞানে পরমাত্মা প্রকাশিত হ'ন, আর তাহাতেই জ্ঞাতা পুরুষের মুক্তি হয়। এ-প্রকার মুক্তিকে কৈবল্য মুক্তি বলা সাজে না এইজন্য—যেহেতু উহা কেবল-মাত্র পঞ্চবিংশে (অর্থাৎ জীবাত্মাতে) পর্য্যাপ্ত নহে ; তাহা দূরে থাকুক—ষড়্‌বিংশের (অর্থাৎ পরমাত্মার) দর্শনই উহার সারসর্ব্বস্ব।

আমার এই কথাটির সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন যাহা তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে তাহা এই :—

"তুমি যাহাকে বলিতেছ পরম পরিশুদ্ধ অন্তরতম জ্ঞান তাহার জ্ঞেয় বিষয় কী? পরমাত্মা স্বয়ং কি তাহার জ্ঞেয় বিষয়? তাহা তুমি বলিতে পার না এই জন্য—যেহেতু জীবাত্মা এবং পরমাত্মা উভয়েই জ্ঞাতা পুরুষ, তা বই—কোনো আত্মাই ঘটপটাদির ন্যায় জ্ঞেয় বিষয় নহেন।"

ইহার উত্তরে আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম "পরে তোমাকে আমি দেখাইব যে, বিশুদ্ধ জ্ঞানের জ্ঞেয় বিষয়—বিশুদ্ধ সত্ত্ব।" তখন তোমাকে যাহা আমি "পরে বলিব" বলিয়াছিলাম, এখন সেই কথাটি তোমাকে খোলাসা করিয়া ভাঙিয়া বলিতেছি—প্রণিধান কর।

প্রথম দ্রষ্টব্য।

স্বপ্নের কাল্পনিক সত্তার সঙ্গে জাগ্রতকালের বাস্তবিক সত্তা মিলাইয়া দেখিলে একটি বিষয়ে দুয়ের মধ্যে প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় খুবই সুস্পষ্ট; সে প্রভেদ এই যে, স্বপ্নের কাল্পনিক সত্তা জাগ্রৎকালের বাস্তবিক সত্তার উপরে একান্তপক্ষে নির্ভর করে—পরন্তু জাগ্রৎকালের বাস্তবিক সত্তা স্বপ্নের কাল্পনিক সত্তার উপরে মূলেই নির্ভর করে না। ইহা হইতে আসিতেছে এই যে, জাগ্রৎকালের বাস্তবিক সত্তাই জ্ঞানের মুখ্য জ্ঞেয় বিষয়—স্বপ্নকালের কাল্পনিক সত্তা বাস্তবিক সত্তার ছায়া মাত্র, আর সেই জন্য—যেখানে পৃথিবী জল বায়ু অগ্নি প্রভৃতি জ্ঞেয়বস্তুসকলের কথা হইতেছে—সেখানে স্বপ্নের জ্ঞেয় বস্তুসকল ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। এখন আমি বলিতে চাই এই যে, বাস্তবিক সত্তাই সমস্ত জ্ঞেয় পদার্থের অন্তরতম সারাংশ বা সত্ত্ব, আর, সেইজন্য তাহার নাম হইয়াছে "সত্ত্বগুণ।"

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য।

কোনো একটি গোষ্পদে যদি কর্দ্দমাক্ত জলও থাকে, তবে সে জলেরও যেমন অন্তরতম সারাংশ—বিশুদ্ধ জল, তেমনি, কোনো একটি অজ্ঞ বালকের মনোমধ্যে যদি ভ্রমসংকুল জ্ঞানও থাকে তবে সে-জ্ঞানেরও অন্তরতম সারাংশ—বিশুদ্ধ জ্ঞান। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই যে বিশুদ্ধ জ্ঞান—যাহা আপামর-সাধারণ সকল-মনুষ্যেরই মনে অন্তর্নিগূঢ় রহিয়াছে, তাহার জ্ঞেয় বিষয় কী? এটা যখন স্থির যে, বাস্তবিক সত্তা সকল-জ্ঞানেরই মুখ্য জ্ঞেয় বিষয়, তখন তাহা হইতেই আসিতেছে যে, বিশুদ্ধ বাস্তবিক সত্তা বিশুদ্ধ জ্ঞানের জ্ঞেয় বিষয়। বাস্তবিক সত্তাতে বিশুদ্ধ জ্ঞান ওতপ্রোত ভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে; তাহা সত্যং জ্ঞানমনন্তং পরমাত্মার সুমঙ্গল জ্যোতি; তাহা

সত্য মঙ্গল এবং আনন্দের নিদান! তাহার উপরে কাহারো কোনো তর্ক বিতর্ক চলিতে পারে না—কেন না তাহা সমস্ত বুদ্ধি বৃত্তির গোড়া'র প্রতিষ্ঠা ভূমি। তুমি যতবড় মহা পণ্ডিত হওনা কেন—সহস্র চেষ্টা করিলেও বাস্তবিক সত্তাকে তুমি স্বস্থান হইতে একপদও টলাইতে পারিবে না। মনে কর যেন তুমি তর্ক বিতর্কের চোটে, বাস্তবিক সত্তাকে উড়াইয়া দিয়াছ—তবে জানিও যে তোমার বুদ্ধি-বৃত্তিও সেই সঙ্গে উড়িয়া গিয়াছে; হাবেলক্ (Havelock) যেমন বারুদখানা উড়াইয়া দিয়া আপনিও উড়িয়া গিয়াছিলেন—তুমি তেমনি বাস্তবিক সত্তা উড়াইয়া দিয়া আপনিও উড়িয়া গিয়াছ; তখন কোথায় বা তোমার তর্ক—কোথায় বা তোমার যুক্তি—কোথায় বা তুমি—কোথায় বা কে? নাস্তিই তখন সর্ব্বেসর্ব্বা!

তৃতীয় দ্রষ্টব্য।

স্বপ্নের জ্ঞেয় বিষয়সকলের সত্তা যতই কেন কাল্পনিক হউক্ না, তাহা বাস্তবিক সত্তার খাইয়াই মানুষ; আর সেইজন্য তাহার অস্থি মজ্জা যে, বাস্তবিক সত্তার মাতৃদুগ্ধে পরিগঠিত, সে বিষয়ে আর সন্দেহ মাত্র নাই। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, স্বপ্নের কাল্পনিক সত্তা এক হিসাবে যেমন বাস্তবিক—জাগ্রৎকালের বাস্তবিক সত্তা এক হিসাবে তেমনি কাল্পনিক। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য কি বলিতেছেন শ্রবণ কর:—

"যদুপতেঃ ক্বগতা মথুরাপুরী
রঘুপতেঃ ক্বগতোত্তরকোশলা!
ইতি বিচিন্ত্য কুরু স্বমনঃ স্থিরং
ন সদিদং জগদিত্যবধারয়॥"

ইহার অর্থ।

যদুপতির মথুরাপুরী কোথায় গেল! রঘুপতির অযোধ্যাপুরী কোথায়

গেল! এই সকল কাণ্ডকারখানা দেখিয়া শুনিয়া মনকে স্থির কর;—এটা জানিও নির্ঘাৎ বেদবাক্য যে, জগৎ অসৎ! তুমি হয়তো বলিবে যে, "মায়াবাদের আদিগুরু শঙ্করাচার্য্য তো তাহা বলিবেনই!" তা যদি বলো—তবে সেক্সপিয়র তো আর মায়াবাদী ছিলেন না—তিনি কি বলিতেছেন শ্রবণ কর ঃ—

ঝটিকা নাটকের প্রধান নায়ক প্রস্পেরো মায়াবলে তাঁহার স্নেহের বর-কন্যা-দুজনাকে গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় একটা অদ্ভুত নাট্যলীলার দৃশ্য দেখাইয়া, দৃশ্যটার অন্তর্ধান কালে বলিতেছেন—

Our revels are now ended, These our actors,
As I foretold you, were all spirits and
Are melted into air, into thin air
And, like the baseless fabric of the vision,
The cloud-capped towers, the gorgeous palaces,
The solemn temples, the great globe itself,
Yea, all which it inherit, shall dissolve
And, like this insubstantial pageant faded,
Leave not a rack behind. We are such stuff
As dreams are made of.

ইহার অর্থ।

আমাদের উৎসবামোদ এখন ফুরাইল। এই যে সব নট-নটী দেখিলে (পূর্ব্বে যেমন আমি তোমাদিগকে বলিয়াছিলাম) ও'রা গন্ধর্ব্ব-অপ্সরার জাত।—দেখিতে দেখিতে বাতাসে মিলাইয়া গেল। এই মূলশূন্য ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারটার ন্যায়—অভ্রলিহ প্রাসাদশৃঙ্গসকল, জাঁকালো ঢঙের রাজঅট্টালিকা সকল—ধীর গম্ভীর দেবালয়-সকল,

এমন কি—সসাগরা পৃথিবী স্বয়ং, হাঁ, পৃথিবীর যাঁরা রাজ-রাজেশ্বর তাঁরা সুদ্ধ—সবই লয় পাইবে ; ঐ অন্তঃসার শূন্য বহিঃশোভন দৃশ্যটার মতো পরিক্ষীণ হইয়া অবসান প্রাপ্ত হইবে—বাষ্পটুকুও কাহারো অবশিষ্ট থাকিবে না। যাহা-দিয়া স্বপ্ন পরিগঠিত হয়, সেই রকমের আমরা পদার্থ।

উদয়গিরির তত্ত্বজ্ঞকেশরী এবং অস্তগিরির কবিকেশরীর দোঁহার সঙ্গে দোঁহার এইরূপ যখন কোলাকুলির ঘটা, তখন অন্যে পরে কা কথা! এটা তুমি অস্বীকার করিতে পারিবে না যে, যে-ব্যক্তি ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া ইন্দ্রের অমরাপুরীর স্বপ্ন দেখিতেছে, তাহার জ্ঞানে দৃশ্যমান্ অমরাপুরীটা যেমন জলজ্যান্ত বাস্তবিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়—রামচন্দ্রের আমলে অযোধ্যাবাসীদের জ্ঞানে রামরাজ্য তেমনি জলজ্যান্ত বাস্তবিক বলিয়া প্রতীয়মান হইত ; আবার এটাও তুমি অস্বীকার করিতে পারিবে না যে, নিদ্রাবসানকালে অমরাপুরীর স্বপ্নদর্শক যেমন "কোথায় গেল সে অমরাপুরী" বলিয়া হায় হায় করিতে থাকে—অধুনাতনকালে তেমনি অযোধ্যাবাসীরা (বিশেষতঃ তুলসীদাসের চেলারা) "কোথায় গেল সে রামরাজ্য" বলিয়া হায় হায় করিতেছে। আমি তাই বলি যে, স্বপ্নের অমরাপুরী যেমন স্বপ্নকালে বাস্তবিক, আর, জাগরণকালে যেহেতু কোথাও তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, এইজন্য জাগরণকালে তাহা অবাস্তবিক ; তেমনি, ত্রেতাযুগের রামরাজ্য ত্রেতাযুগে বাস্তবিক, আর, কলিযুগে যেহেতু কোথাও তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, এইজন্য কলিযুগে তাহা অবাস্তবিক। প্রকৃত কথা যাহা তাহা এই :—

এটা খুবই সত্য যে, স্বপ্নের জ্ঞেয় বিষয়সকলের সত্তার তুলনায় জাগ্রৎকালের জ্ঞেয় বিষয়সকলের সত্তা যার পর নাই বাস্তবিক ;—

এটাও কিন্তু উহা অপেক্ষা বেশী বই কম সত্য নহে যে, জাগ্রৎকালের জ্ঞেয় বিষয়সকলের সত্তার তুলনায় যেমন স্বপ্নের জ্ঞেয় বিষয়সকলের সত্তা অবাস্তবিক, তেমনি, বিশুদ্ধ বাস্তবিক সত্তার যে একটি আদর্শ আপামর সাধারণ সকল মনুষ্যেরই অন্তরতম বিশুদ্ধ জ্ঞানে বিদ্যমান আছে, তাহার তুলনায় জাগ্রৎকালের জ্ঞেয় বিষয় সকলের সত্তা অবাস্তবিক। এখন এটা বলিবামাত্রই বুঝিতে পারা যাইবে যে, জাগ্রৎকালের মিশ্রজ্ঞানের মুখ্য জ্ঞেয়বিষয় যেমন মিশ্র বাস্তবিক সত্তা, অন্তরতম বিশুদ্ধ জ্ঞানের মুখ্য জ্ঞেয় বিষয় তেমনি বিশুদ্ধ বাস্তবিক সত্তা; আর, এই বিশুদ্ধ বাস্তবিক সত্তার নামই—রজোস্তমোগুণ দ্বারা অবাধিত শুদ্ধ সত্ত্ব।

বেশী কচলাইলে মিষ্ট বস্তুও তিক্ত হইয়া যায়; তাই সংস্কৃতজ্ঞ ভট্টাচার্য্যমহলে এইরূপ একটি প্রবাদ বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে যে, যৎ স্বল্পং তন্মিষ্টং, যাহা স্বল্প তাহাই মিষ্ট। এই সাধুসম্মত পাকা কথাটি শ্রদ্ধার সহিত শিরোধার্য্য করিয়া আজ আমি এইখানেই পাঠ বন্ধ করিলাম। আগামী অধিবেশনে দেখাইব যে, বিশুদ্ধ জ্ঞানের ঐ যে মুখ্য জ্ঞেয় বিষয়—শুদ্ধ সত্ত্ব, উহা সামান্য বস্তু নহে, উহা গীতাশাস্ত্রোক্ত সেই পরা প্রকৃতি যাহা বিশ্বসংসার ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

একবিংশতি অধিবেশন।

ব্যাখ্যান।

অতঃপর বাস্তবিক সত্তার সহিত জ্ঞান-প্রেম এবং আনন্দের সম্বন্ধ কিরূপ তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা আবশ্যক বিবেচনায় তাহাতেই এক্ষণে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

প্রথম দ্রষ্টব্য।

প্রথম দ্রষ্টব্য এই যে, বাস্তবিক সত্তাই বস্তুসকলের জ্ঞেয়ত্বের নিদান। "জ্ঞেয়ত্ব" কিনা জ্ঞান-গোচরে প্রকাশ যোগ্যতা। জ্ঞান-গোচরে যাহা যখন প্রকাশ পায়—তাহার বাস্তবিক সত্তার গুণেই তাহা প্রকাশ পায়। স্বপ্নে আমরা যে সকল বস্তু প্রত্যক্ষ করি তাহা তো একপ্রকার কিছুই না; প্রকাশ পায় তবে তাহা কিসের জোরে? সেই মিথ্যা বস্তুগুলার কাল্পনিক সত্তার মূলে জাগ্রৎকালের বাস্তবিক সত্তা গূঢ়ভাবে কার্য্য করে অবশ্য, নতুবা আর-কিসের জোরে তাহা প্রকাশ পাইবে? বাস্তবিক সত্তা যদি তলে তলে কার্য্য না করিত, তবে এ তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে যে, স্বপ্নের কাল্পনিক সত্তা মুহূর্ত্তকালের জন্যও প্রকাশ পাইতে পারিত না। বাস্তবিক সত্তার কার্য্যই হ'চ্চে বিদ্যমান হওয়া। বিদ ধাতুর অর্থ—জ্ঞান; "বিদ্যমান" কিনা জ্ঞান-গোচরে প্রকাশমান।

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য।

জ্ঞানের অসাক্ষাতেও বাস্তবিক সত্তা বিদ্যমান হইতে পারে না, আর, বাস্তবিক সত্তার অবর্ত্তমানেও জ্ঞান স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না। জ্ঞান না থাকিলে বাস্তবিক সত্তা নিষ্ফল হয়; বাস্তবিক সত্তা না থাকিলে জ্ঞান নিষ্ফল হয়। বাস্তবিক সত্তা চায় জ্ঞান'কে—জ্ঞান চায় বাস্তবিক

সত্তাকে—দোঁহার প্রতি দোঁহার এইরূপ মর্ম্মান্তিক প্রেম ; আর, সেই জন্য দোঁহার সম্মিলন অতিশয় আনন্দের ব্যাপার। খুবই তো তাহা আনন্দের ব্যাপার—কিন্তু তাহা ঘটে কই? সর্ব্বত্রই তো এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, চখাচখীর ন্যায়—জ্ঞান রহিয়াছে ভবনদীর ওপারে, সত্তা রহিয়াছে ভবনদীর এপারে, আর, দোঁহার মধ্যে ডাকাডাকি চলিতেছে সারারাত্রি অবিরাম! এরূপ যে হয়—তাহার অবশ্য একটা নিগূঢ় অর্থ আছে। দাঁত থাকিতে যেমন দাঁতের মর্য্যাদা জানা যায় না—তেম্নি মিলনই যদি কেবল একটানা স্রোতের ন্যায় ক্রমাগত সমভাবে চলিতে থাকে তবে মিলনের মর্য্যাদা লোপ পাইয়া যায়। মিলনও চাই—বিচ্ছেদও চাই। কিন্তু সেই সঙ্গে আরেকটি যাহা চাই সেইটিই হ'চ্চে সেরা জিনিস। বিচ্ছেদ এবং মিলনের মাত্রা তালমান-সঙ্গত হওয়া চাই। বিচ্ছেদ যদি মাত্রা অতিক্রম করিয়া মারাত্মক হইয়া ওঠে, তবে তাহার মতো শোচনীয় বস্তু ত্রিজগতে নাই;—তা'চেয়ে আমি বলি মৃত্যু ভাল! চখাচখীর মধ্যে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা তো আর তাহা নহে! তাহাদের বিচ্ছেদ—মিলনেরই একপ্রকার অনুপান। ডাকাডাকিতেই তাহাদের ভরপুর আনন্দ; এমন কি সেই আনন্দে তাহারা বাঁচিয়া রহিয়াছে বলিলেই হয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—জ্ঞান এবং সত্তার বিচ্ছেদ-মিলনের বিশাল রঙ্গশালা কী চমৎকার! বাস্তবিক সত্তা কোথাও বা তমোগুণের অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকা দিয়া মান-ভরে ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছে; কোথাও বা রজোগুণের নেশার ঘোরে সোণা মনে করিয়া মাটির ঢ্যালা স্তূপাকারে গাদা করিতেছে—সূর্য্যকান্ত মণি মনে করিয়া প্রস্তরখণ্ড মস্তকে ধারণ করিতেছে—আর, আপনার মন হইতে একটা মায়ামূর্ত্তি গড়িয়া দাঁড় করাইয়া সেই অবিদ্যাটাকে

বলিতেছে "তুমিই আমার পরম জ্ঞান—আমার মস্তকে পদধূলি প্রদান কর।" আবার—কোথাও বা বাস্তবিক সত্তা এবং জ্ঞানের মধ্যে ডাকাডাকি চলিতেছে প্রেমপূর্ণ মধুরস্বরে। কিন্তু তা বলিয়া—এটা ভুলিলে চলিবে না যে, বাস্তবিক সত্তা যে-অবস্থাতেই থাকুক না কেন—কোনো অবস্থাতেই তাহার গভীর অন্তরে জ্ঞানের প্রতি মনের লক্ষ্য এবং প্রাণের টান চুপিচুপি কার্য্য করিতে এক মুহূর্ত্তও বিরত হয় না। দেখিতেও তো পাওয়া যাইতেছে যে, বাস্তবিক সত্তা জ্ঞানের অসাক্ষাতেও বিদ্যমান হইতে পারে না—আনন্দের সঙ্গচ্যুত হইয়াও বর্ত্তিয়া থাকিতে পারে না। জ্ঞানই বাস্তবিক সত্তার চক্ষের জ্যোতি—আনন্দই বাস্তবিক সত্তার প্রাণের সম্বল। পূর্ব্বতন ঋষিমনীষীদিগের কণ্ঠ হইতে গদ্‌গদ স্বরে এই যে একটি হৃদয়ের মর্ম্মগত আকিঞ্চন উদ্‌গীত হইয়া উঠিয়াছিল—

"অসতো মা সদ্‌গময়" "তমসো মা জ্যোতির্গময়"
"মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়"—

"অসৎ হইতে আমাকে সতে পৌঁছাইয়া দেও" "অন্ধকার হইতে আমাকে আলোকে পৌঁছাইয়া দেও" "মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে পৌঁছাইয়া দেও" ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, বাস্তবিক সত্তা সৎ'কে চায়, তমোগুণের অজ্ঞানান্ধকার জ্ঞানজ্যোতিকে চায়, রজোগুণের বিষজ্বালা আনন্দামৃত চায়।

প্রশ্ন। তুমি বলিতেছ যে, বাস্তবিক সত্তা সৎ'কে চায়। আবার, একটু পূর্ব্বে তুমি বলিয়াছ যে, বাস্তবিক সত্তা সত্ত্বগুণেরই আর এক নাম। এটাও তুমি বলিয়াছ যে, সত্ত্বগুণের প্রধান দুইটি ধর্ম্ম জ্ঞান এবং আনন্দ। ইহাতে ফলে এইরূপ দাঁড়াইতেছে, যে, সত্ত্বগুণ

আত্মারই আর এক নাম। তা ছাড়া—বেদান্ত শাস্ত্রে বলে আত্মাই সৎশব্দের বাচ্য। সৎ এবং সত্ত্বের মধ্যে প্রভেদ তবে যে কোন্‌খানটিতে তাহা তো আমি খুঁজিয়া পাইতেছি না।

উত্তর। এটাও আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি তোমার স্মরণ থাকিতে পারে যে, কবি এবং কবিত্বের মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ—সৎ এবং সত্ত্বের মধ্যেও অবিকল সেইরূপ সম্বন্ধ। এ কথা খুবই সত্য যে, কবিত্ব যেমন কবির মর্ম্মগত ভাবের আবির্ভাব—সত্ত্বও তেম্নি সতের মর্ম্মগত ভাবের আবির্ভাব; কিন্তু তা'-বলিয়া—কবিত্বও কবি নহে, সত্ত্বও সৎ নহে। কবির হৃদয়ে যখন কবিত্বের ঢেউ খেলিতে থাকে তখন তাহা হইতে আনন্দজ্যোতি ফুটিয়া বাহির হয় বটে, কিন্তু কবির মনোমধ্যে আনন্দের যে-এক বাঁধা রোসনাই গোড়া হইতে বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহারই তাহা প্রতিবিম্ব বই স্বতন্ত্র কোনো কিছুই নহে। তেম্নি, সত্ত্বগুণের এই যে দুইটি ধর্ম্ম—জ্ঞান এবং আনন্দ, যাহার কথা এক্ষণে হইতেছে, তাহা সৎস্বরূপ আত্মার চিরন্তন জ্ঞান এবং আনন্দের প্রতিবিম্ব বই স্বতন্ত্র কোনো-কিছুই নহে। বেদান্তশাস্ত্রে অন্তঃকরণের প্রধান দুইটি পীঠস্থানকে বিজ্ঞানময় কোষ এবং আনন্দময় কোষ বলা হইয়াছে ইহা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে কাহারো অবিদিত নাই, আর তাঁহাদের মধ্যে এটাও কাহারো অবিদিত নাই, যে, বেদান্তদর্শনের মতে ও-দুইটি কোষ আত্মার দুইটি উপাধি বই ও-দুটার কোনোটাই সাক্ষাৎ আত্মা নহে। আনন্দময় কোষ আনন্দ"ময়" বই না—কিন্তু আত্মা আনন্দ-স্বরূপ; বিজ্ঞানময় কোষ বিজ্ঞানময় বই না—কিন্তু আত্মা জ্ঞান"স্বরূপ"। চন্দ্র যেমন সূর্য্যের গুণেই জ্যোতির্ম্ময়—নিজ গুণে নহে, সত্ত্বগুণ তেম্নি আত্মার গুণেই বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময়—তাহার নিজগুণে নহে।

সত্ত্বগুণ যদিচ সাক্ষাৎ আত্মা নহে, কিন্তু তাহা প্রকৃতির আত্মা-ঘ্যাঁসা সারাংশ এ বিষয়ে সকল শাস্ত্রই এক-বাক্য।

কালিদাস কেমনতর কবি ছিলেন তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইতে হইলে—শকুন্তলা নাটকের কোন্ স্থানে কিরূপ কবিত্ব আছে—মেঘদূতের কোন্ স্থানে কিরূপ কবিত্ব আছে—কুমারসম্ভবের কোন্ স্থানে কিরূপ কবিত্ব আছে—তাহার প্রতি যেমন মনঃসমাধান করা আবশুক হয়, সৎস্বরূপ আত্মার পরিচয় প্রাপ্ত হইতে হইলে, তেম্নি, অন্তর্জগৎ এবং বহির্জগতের কোন্ কোন্ স্থানে সত্ত্বগুণের অভিব্যক্তি কী কী প্রকার তাহার প্রতি মনোযোগের সহিত প্রণিধান করা আবশ্যক হয়। কিন্তু এটাও দেখা চাই যে, শকুন্তলা মেঘদূত কুমারসম্ভব প্রভৃতি কালিদাস-প্রণীত কাব্যগ্রন্থ সকলের মধ্যে যেখানে যত সুন্দর সুন্দর কবিত্ব ছড়ানো রহিয়াছে সমস্ত এক জায়গায় জড়ো করিলেও তাহা দৃষ্টে কালিদাসের মর্ম্মস্থানীয় কবিত্বরসের উপরের-উপরের তরঙ্গলীলার রসগ্রহণই এক-যা-কেবল সম্ভবে, তা বই, তাহার গভীর প্রদেশের অন্ধিসন্ধি তলাইয়া পাওয়া সম্ভবে না। কিন্তু যাহাই হউক্ না কেন—এটা সত্য যে, কালিদাসের লেখনী দিয়া সেরা সেরা কবিত্ব যাহা শকুন্তলাদি পুস্তকে বাহির হইয়াছে তাহা কালিদাসের মর্ম্মস্থানীয় কবিত্ব রসের বিমল দর্পণ। সেই দর্পণে কালিদাস নিজেও তাঁহার সেই মর্ম্মস্থানীয় অকথিত কবিত্ব যাহা লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না তাহার আভাস উপলব্ধি করিয়া আনন্দ লাভ করিতেন, আর, তাঁহার পাঠকবর্গেরাও সেই দর্পণেই সেই-তাঁহার-অকথিত-কবিত্বের যথাসম্ভব আভাস উপলব্ধি করিয়া আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। সত্ত্বগুণ আত্মার সেই রকমের দর্পণ। রূপকচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে "এক" আত্মার "দুই" পৃষ্ঠ; এক পৃষ্ঠ জ্ঞাতা, আর এক পৃষ্ঠ জ্ঞেয়,

সত্ত্বগুণের দর্পণে আত্মার দুই পৃষ্ঠই কিছু আর প্রতিবিম্বিত হয় না; প্রতিবিম্বিত হইতে—আত্মার জ্ঞেয় পৃষ্ঠই কেবল প্রতিবিম্বিত হয়—আত্মার জ্ঞাতৃ-পৃষ্ঠ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে। পাতঞ্জল দর্শনের দ্বিতীয় পাদের ২০ সূত্রে প্রকারান্তরে বলা হইয়াছেও তাই; তা'র সাক্ষী :—

"দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ" ॥ ২০ ॥

ভোজরাজকৃত টীকায় ইহার অর্থ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে এইরূপ :—

"দ্রষ্টা পুরুষঃ। দৃশিমাত্রশ্চেতনামাত্রঃ। স শুদ্ধোঽপি—পরিণামিত্বাদ্যভাবেন স্বপ্রতিষ্ঠোঽপি—প্রত্যয়ানুপশ্যঃ। প্রত্যয়া বিষয়োপরক্তানি জ্ঞানানি। তানি স্বাব্যবধানেন প্রতিসংক্রমাদ্যভাবেন পশ্যতি। এতদুক্তং ভবতি—জাতবিষয়োপরাগায়ামেব বুদ্ধৌ সন্নিধানমাত্রেণৈব পুরুষস্য দ্রষ্টৃত্বমিতি"

ইহার অর্থ।

"দ্রষ্টা" কিনা পুরুষ অর্থাৎ আত্মা। "দৃশিমাত্র" কিনা চেতনামাত্র। আত্মা পরমপরিশুদ্ধ, পরিণামরহিত, এবং স্বপদে স্থিরপ্রতিষ্ঠ হইলেও প্রত্যয়ের যোগে জ্ঞেয় বস্তুসকল উপলব্ধি করেন। "প্রত্যয়" কিনা বিষয়োপরক্ত জ্ঞান। * আত্মা স্বস্থান হইতে না নড়িয়া বিষয়োপ-

---

* প্রত্যয় শব্দের মুখ্য অর্থই হ'চ্চে ঐ—কি না "বিষয়োপরক্ত" জ্ঞান। তবেই হইতেছে যে, প্রত্যয় শব্দের প্রকৃত অর্থ হ'চ্চে—ইংরাজীতে যাহাকে বলে *idea*। যে-জ্ঞান বস্তুদ্বারা উপরক্ত তাহাকেই বলা যায় বস্তুপ্রত্যয় কি না *idea of substance*। তেম্নি কারণ-প্রত্যয়কে ইংরাজীতে বলা যাইতে পারে *idea of cause*। আত্মপ্রত্যয়কে বলা যাইতে পারে *idea of self*। যদি বলা যায় যে, আমরা আত্মপ্রত্যয়দ্বারা আপনা-আপনাকে জ্ঞানে উপলব্ধি করি তবে তাহার অবিকল ইংরাজি অনুবাদ হ'চ্চে "*we cognize our individual selves through the idea of self*। শঙ্করাচার্য্য-কৃত বেদান্তভাষ্যে উপক্রমণিকার গোড়াতেই আছে যে, বিষয়ী (কি না আত্মা) অস্মৎপ্রত্যয়ের কি না *idsa of self*এর গোচর কি না

রক্ত জ্ঞান সকল (বা প্রত্যয়সকল) সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপলব্ধি করেন। [ভাব এই যে, আত্মা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঘটপ্রত্যয় (কিনা idea of ঘট) উপলব্ধি করেন, আর, ঘটপ্রত্যয়ের দ্বার দিয়া (through the idea of ঘট) দৃশ্যমান ঘট উপলব্ধি করেন।] কথা হ'চ্চে এই যে, বুদ্ধি যখন বিষয় দ্বারা উপরক্ত হয়, তখন সেই বিষয়োপরক্ত বুদ্ধির (কিনা প্রত্যয়ের) সন্নিধানমাত্রেই আত্মার জ্ঞাতৃত্ব সিদ্ধ হয়। [ইহাতে প্রকারান্তরে বলা হইতেছে যে, আত্মা বিষয়োপরক্ত বুদ্ধিরই—প্রত্যয়েরই—সাক্ষাৎ জ্ঞাতা।]

আমি তাই রূপকচ্ছলে বলিতেছি যে, আত্মার জ্ঞাতৃপৃষ্ঠ (বৈদান্তিক ভাষায়—কূটস্থ চৈতন্য) স্বরূপে স্থিরপ্রতিষ্ঠ, আর, আত্মার জ্ঞেয়পৃষ্ঠ (বৈদান্তিক ভাষায়—আভাস চৈতন্য) সত্ত্বগুণপ্রধান বুদ্ধির দর্পণে—আত্মপ্রত্যয়ের দর্পণে—প্রতিবিম্বিত। আমি দেশকালপাত্র বিবেচনা করিয়াই রূপকের ভাষা ব্যবহার করিতেছি—সাধ করিয়া তাহা করিতেছি না ইহা বলা বাহুল্য।)

প্রশ্ন। একটু পূর্ব্বে সত্তা এবং জ্ঞানের বিচ্ছেদমিলনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তুমি যাহা বলিয়াছিলে, আর, তাহার পরে রূপকচ্ছলে আত্মার দুই পৃষ্ঠের কথা এখন এই যাহা বলিলে এই দুই কথার এটার সঙ্গে ওটা মিলাইয়া দেখিয়া আমার মনে হইতেছে এই যে, সত্তা এবং জ্ঞানের বিচ্ছেদ-মিলনের নাট্যলীলা আত্মার জ্ঞেয়পৃষ্ঠ-ঘঁ্যাসা প্রকৃতি-

---

বিষয়ীভূত। ইহাতে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, অস্মৎপ্রত্যয় কি না *idea of self* আত্মোপরক্ত জ্ঞান। বৈদান্তিক পণ্ডিতেরা বলিবামাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে, অস্মৎপ্রত্যয়ের বিষয় আভাস চৈতন্য আর, অস্মৎপ্রত্যয়ের জ্ঞাতা হচ্চে কূটস্থ চৈতন্য। অর্থাৎ *self as it appears to itself is the phenomenal object of the idea of self; self as the knower is the noumenal subject of the idea of self.*

রাজ্যে অভিনীত হওয়া যে-কারণে আবশ্যক—আত্মার জ্ঞাতৃপৃষ্ঠ-ঘ্যাঁসা স্বরূপ-রাজ্যে তাহা অভিনীত হওয়াও সেই কারণে আবশ্যক। সে কারণ এই যে, সত্তা এবং জ্ঞানের মিলনের আনন্দ একটানা স্রোতের ন্যায় ক্রমাগত সমভাবে চলিতে থাকিলে তাহা একঘেয়ে হইয়া গিয়া বিষাদেরই আলয় হইয়া ওঠে। আমি তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করি যে, আত্মার জ্ঞাতৃপৃষ্ঠ-ঘ্যাঁসা স্বরূপ-রাজ্যেও সত্তা এবং জ্ঞানের বিচ্ছেদ-মিলনের নাট্যলীলা অভিনীত না হয় কেন?

উত্তর॥ যদি বলা যায় যে, সত্তা এবং জ্ঞানের মধ্যে এম্নি ঘোরতর মর্ম্মান্তিক রকমের পার্থক্য যে, কোনো জন্মেই দোঁহার সহিত দোঁহার দেখা-সাক্ষাৎ ঘটেও নাই—ঘটিতে পারেও না; তবে তাহা বলা'ও যা, আর, জ্ঞানও নাই—সত্তা'ও নাই—কিছুই নাই, তাহা বলা'ও তা, একই; কেননা, জ্ঞানের অসাক্ষাতে সত্তা বিদ্যমানই হইতে পারে না, আর, পাতঞ্জল দর্শনে এইমাত্র দেখিলাম যে, সত্তাগর্ভ বিষয়োপরক্ত বুদ্ধির অসাক্ষাতে জ্ঞানের জ্ঞাতৃত্বই সিদ্ধ হয় না। তবেই হইতেছে যে, জ্ঞান-বিরহে সত্তা সত্তাই হয় না—সত্তা-বিরহে জ্ঞান জ্ঞানই হয় না। পক্ষান্তরে যদি বলা যায় যে, জ্ঞান এবং সত্তার মধ্যে অবশ্য কিছু-না কিছু যোগ গোড়া হইতেই আছে, তবে সেরূপ একটা স্তোক-বাক্যে জিজ্ঞাসু ব্যক্তির মনের আকাঙ্ক্ষা মিটিতে পারে না। তাহা হইলে জিজ্ঞাসু ব্যক্তির মনে অগত্যা এইরূপ একটি প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, যাহাকে তুমি বলিতেছ "কিছু-না-কিছু যোগ" তাহা কোথা হইতে আসিল? তাহা কি উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে—অথবা তাহা ভিতর হইতে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে? শেষোক্ত কথাটাই যুক্তিসঙ্গত ইহা বলা বাহুল্য। এটা যখন স্থির যে, সত্তা এবং জ্ঞানের ভিতর হইতেই তাহা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে,

তখন তাহা হইতেই আসিতেছে যে, সত্তা এবং জ্ঞান যেখানে একীভূত সেইখান হইতেই তাহা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। এইরূপে আমরা পাইতেছি যে, সকলের মূলে সত্তা জ্ঞান এবং উভয়ের মিলনজনিত আনন্দ তিনই একসঙ্গে একীভূত; আর, সেই যে সকলের মূল তিনি সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা। পরমাত্মাতে সত্তা জ্ঞান এবং আনন্দ একীভূত ভাবে পরিপূর্ণ মাত্রায় চিরবর্ত্তমান। যিনি সৎস্বরূপ তিনিই চিৎস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ; যিনি চিৎস্বরূপ তিনিই সৎস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ; যিনি আনন্দস্বরূপ তিনিই সৎস্বরূপ এবং চিৎস্বরূপ। গীতাশাস্ত্রে আছে যে, পঞ্চভূত মন বুদ্ধি এবং অহঙ্কার আমার অপরা প্রকৃতি; তা ছাড়া, জীবভূতা আর এক প্রকৃতি আছে, তাহা আমার পরা প্রকৃতি। তবেই হইতেছে যে, প্রকৃতি পরমাত্মার পর নহে; প্রকৃতি পরমাত্মার আপনারই প্রকৃতি; তা ছাড়া, জীবভূতা পরা প্রকৃতি, সংক্ষেপে—জীবাত্মা, পরমাত্মার দ্বিতীয় আত্মা। প্রকৃতিরাজ্যে সত্তা এবং জ্ঞানের বিচ্ছেদমিলনের নাট্যলীলা যাহা অভিনীত হয়, তাহা তাঁহারই ইচ্ছায় অভিনীত হয়। তিনিই তাঁহার এই নানা রসযুক্ত প্রকৃতিসঙ্গীতে চিরমিলনের সদানন্দকে বিচ্ছেদের তালমানসঙ্গত মাত্রা সংযোগে নিত্য নিত্য নূতন নূতন করিয়া ফুটাইয়া তোলেন।

অতঃপর প্রকৃতিরাজ্যের কোন্‌খান দিয়া কিরূপে সত্তা জ্ঞান এবং আনন্দের—এক কথায় সত্ত্বগুণের—অভিব্যক্তি সংঘটিত হয়, তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যা'ক্।

তৃতীয় দ্রষ্টব্য।

আমাদের এই সাগর বেষ্টিত, বায়ুগর্ভস্থিত, চন্দ্রসূর্য্য-তারকাপ্রদীপিত আশ্চর্য্য বাস-দ্বীপে, অর্থাৎ পৃথিবীমণ্ডলে, সত্ত্বগুণের অভি-

ব্যক্তি-সোপানের প্রথম ধাপ হ'চ্চে জীবের উৎপত্তি। সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যাদির অধিকার-প্রদেশে সত্বশব্দে জীব-অর্থেই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তা'র সাক্ষী—শকুন্তলা নাটকের যে-শ্লোকটিতে দুষ্মন্ত রাজা তাঁহার মৃগয়া-প্রেয়সীর গুণ গাহিতেছেন তাহার প্রথমার্দ্ধ এই :—"মেদশ্ছেদ কৃশোদরং লঘু ভবত্যুত্থানযোগ্যং বপুঃ সত্বানামপি লক্ষ্যতে বিকৃতিমচ্চিত্তং ভয়ক্রোধয়োঃ।" ইহার অর্থ এই যে, মেদ-হ্রাসে শরীর কৃশোদর লঘু এবং উদ্যমশীল হয়, আর তা' ছাড়া—ভয় ক্রোধের আবির্ভাবে সত্বদিগের, কিনা জীবদিগের, চিত্ত কিরূপ বিকৃতি ভাবাপন্ন হয় তাহা চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাওয়া যায়। তা ছাড়া, মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের ২৫২ অধ্যায়ে—স্থূলশরীরী মনুষ্যের ভিতরে যে-এক সূক্ষ্মশরীরী মনুষ্য আছে সেই সূক্ষ্ম শরীরী পারলৌকিক জীবও সত্ব-নামে অভিহিত হইয়াছে; বলা হইয়াছে এইরূপ :—

শরীরাদ্ বিপ্রমুক্তং হি সূক্ষ্মভূতং শরীরিণং
কর্ম্মভিঃ পরিপশ্যন্তি শাস্ত্রোক্তৈঃ শাস্ত্রবেদিনঃ ॥
যথা মরীচ্যঃ সহিতাশ্চরন্তি
সর্ব্বত্র, তিষ্ঠন্তি চ দৃশ্যমানাঃ।
দেহৈর্বিমুক্তানি চরন্তি লোকান্
তথৈব সত্বান্যতিমানুষাণি ॥

ইহার অর্থ :—

শাস্ত্রজ্ঞেরা, শাস্ত্রোক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা, স্থূলশরীর হইতে বিমুক্ত সূক্ষ্মশরীরী মনুষ্য দর্শন করেন। এই যে সকল ভূপতিত সূর্য্যরশ্মি যাহা আমাদের প্রত্যক্ষ গোচরে ভাসমান, এই সকল সূর্য্যরশ্মি যেমন অদৃশ্যভাবে আকাশে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে, তেমনি স্থূলদেহ হইতে বিমুক্ত অতিমানুষ সত্বেরা (অর্থাৎ ইহলোকে যাহারা অন্তর্মানুষ ছিল—

এখন অতিমানুষ হইয়াছে—সেই সকল সত্ত্বেরা) লোকে লোকে বিচরণ করে। *

প্রশ্ন॥ কিন্তু তুমি বলিয়াছ সত্ত্বের আর এক নাম বাস্তবিক সত্তা। তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—বাস্তবিক সত্তা নাই কা'র? ঐ অচেতন দেয়ালটারও তো বাস্তবিক সত্তা আছে। সংস্কৃত ভাষায় তবে অ্যাকা কেবল জীবকেই সত্ত্ব বলা হয় কেন? জড়বস্তু কী অপরাধ করিল? এ যে দেখিতেছি এক যাত্রায় পৃথক ফল!

উত্তর॥ তুমি তো দেখিতেছ এক যাত্রা—আমি যে দেখিতেছি দুই যাত্রা!

দেখিতেছি যে জীবের বাস্তবিক সত্তা যাত্রা করিয়া বাহির হয় আগে; আর, তাহা অভিব্যক্তি-পথে কিয়ৎদূর অগ্রসর হইলে দৃশ্যমান জড়বস্তু সকলের যাত্রারম্ভ হয় পরে। তুমি যে বলিতেছ—ঐ দেয়ালটারও বাস্তবিক সত্তা আছে, কিসের জোরে বলিতেছ? দেয়ালটার রূপ তুমি চক্ষে দেখিতেছ—অতএব তুমি বলিতে পার দেয়ালটার রূপ চৌকণ শ্বেতবর্ণ; দেয়ালটার গাত্র তুমি স্পর্শ করিতেছ—অতএব তুমি বলিতে পার দেয়ালটার গাত্র কঠিন। কিন্তু দেয়ালটার বাস্তবিক সত্তা তুমি চক্ষেও দেখিতে পাইতেছ না—হস্তেও ধরিতে ছুঁ'তে পাইতেছ না। তাই আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—কিসের জোরে তুমি বলিতেছ যে, দেয়ালটার বাস্তবিক সত্তা আছে?

প্রশ্ন। তা যদি বলো তবে উভয়তই গতির্নাস্তি! আমারও যে দশা—তোমারও সেই দশা! তুমিও তো জীবের বাস্তবিক সত্তা চক্ষেও দেখিতে পাইতেছ না—হস্তেও ধরিতে ছুঁতে পাইতেছ না—

* অধুনাতন কালের *spiritualist* সম্প্রদায়ের লোকেরা ঠিক ঐরূপ কথা বলিয়া থাকেন।

অথচ বলিতেছ যে, জীবের বাস্তবিক সত্তা আছে ;—কিসের জোরে বলিতেছ ?

উত্তর। উপলব্ধির জোরে। আমার আত্মসত্তা যেমন আমি জ্ঞানে উপলব্ধি করিতেছি, তোমার আত্মসত্তাও তেম্নি তুমি জ্ঞানে উপলব্ধি করিতেছ ; আর তাহারই জোরে তোমাতে আমাতে দুজনায় মিলিয়া সমস্বরে বলিতেছি যে, আমাদের উভয়েরই আত্মসত্তা জাগ্রত জীবন্ত জ্ঞানের সত্য সুতরাং তাহা বাস্তবিক।

প্রশ্ন। তুমি কি বলো যে, ঐ দেয়ালটার—মূলেই বাস্তবিক সত্তা নাই ?

উত্তর। না, আমি তাহা বলি না। তা'ছাড়া—সাংখ্যাদি কোনো শাস্ত্রেই এ কথা বলে না যে ঐ দেয়ালটার ভিতরে সত্ত্বগুণ মূলেই নাই। সাংখ্যাদি শাস্ত্রে উল্টা আরো বলে এই যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যত বস্তু আছে সমস্তই ত্রিগুণাত্মক ; আর সেই সঙ্গে এ-কথাও বলে যে, মনুষ্যজাতির মনোমধ্যে সত্ত্বগুণ তমোগুণের অন্ধকারময় পাতাল-গর্ত্ত হইতে অভিব্যক্তি-সোপানের অনেক ধাপ উচ্চে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে ; পক্ষান্তরে জড়বস্তু-সকলের ভিতরে সত্ত্বগুণ তমোগুণের গুরুভারে আক্রান্ত হইয়া তমসাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। অত কথায় কাজ কি ? এই সোজা কথাটি আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি যে, জগতে যদি জীব না থাকে তবে জ্ঞান দাঁড়াইবে কোথায় ? জ্ঞানের যদি দাঁড়াইবার স্থান না থাকে, তবে বাস্তবিক সত্তা দাঁড়াইবে কোথায় ? আমি তাই বলি যে, পৃথিবীমণ্ডলে জীবের অভিব্যক্তি হয় আগে—বাস্তবিক সত্তা জ্ঞানে বিদ্যমান হয় পরে।

প্রশ্ন। পৃথিবীস্থ জীবেরা তো সে-দিনের জীব বলিলেই হয়। তাহাদের জন্মিবার পূর্ব্বে পৃথিবী যে, কতশত যুগযুগান্তর ধরিয়া জীব-

শূন্য অবস্থায় বর্ত্তমান ছিল তাহার ইয়ত্তা হয় না। তুমি কি বলো যে ততটা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর বাস্তবিক সত্তা ছিল না?

উত্তর। দীর্ঘ কাল! তোমার আমার মতো অজ্ঞানান্ধ জীব-দিগের নিকটেই উহা দীর্ঘ কাল। ব্রহ্মার নিকটে উহা পৃথিবীমাতার দশমাস দশদিন; আর, সেইজন্য, ততটা কাল পর্য্যন্ত সত্ত্ব (কিনা জীব) তাঁহার গর্ত্তমধ্যে প্রসুপ্ত ভাবে বা অনভিব্যক্ত ভাবে বর্ত্তমান থাকিবারই কথা। তা' শুধু না—ভূগর্ত্ত হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার পরেও—বৈজ্ঞানিক ভাষায় যাহাকে বলে protoplasm সেই সমুদ্রগর্ত্তস্থিত সূতিকাগারে সত্ত্ব গোকুলে বাড়িতেছিল।* তোমার প্রশ্নের সীধা উত্তর এই যে, পৃথিবীমণ্ডলে জীবের উৎপত্তির পূর্ব্বে পৃথিবীর বাস্তবিক সত্তা ছিলই না যে, তাহা আমি বলি না; ছিল—কিন্তু তাহা না থাকিবারই মধ্যে। রাজা যুধিষ্ঠির যেমন বলিয়াছিলেন "অশ্বত্থামা হতো ইতি গজো" †, আমি তেম্নি বলি যে, পৃথিবীর তখন সত্তাও ছিল, চেতনাও ছিল, আনন্দও ছিল—

---

* পিতা-বাসুদেব সদ্য প্রসূত শ্রীকৃষ্ণকে যশোদা রাণীর নিকটে রাখিয়া আসিয়া যশোদা রাণীর নবপ্রসূত কন্যাটিকে দেবকীর অষ্টম গর্ত্তজাতা কন্যা বলিয়া কংশরাজার নিকটে পরিচয় দেওয়ায় কংশরাজা সেই কন্যাটিকে বধ করিতে উদ্যত হইলে কন্যাটি শঙ্কর চিল হইয়া আকাশে উড়িয়া গিয়া তথা হইতে কংশরাজাকে বলিল—

"আমাকে মারিছ তুমি!
তোমাকে মারিবে যে,
গোকুলে বাড়িছে সে।"

এই পৌরাণিক উপাখ্যানটির সহিত তান মিলাইয়া আমি তাই বলিলাম যে, পৃথিবীর সেই আদিমকালে—তমোরাজার দোর্দণ্ডপ্রতাপকে যে-করিবে পদতলে দলিত, সেই সত্ত্বমহাপুরুষ সমুদ্রগর্ত্তে গোকুলে বাড়িতেছিল।

† আমাদের দেশের কথক-মহলে "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ" এই সংস্কৃত বোল্'টির পরিবর্ত্তে "অশ্বত্থামা হতো ইতি গজো" এই বাংলা বোল্'টি এযাবৎকাল পর্য্যন্ত অবিতর্কিতভাবে চলিয়া আসিতেছে। বাঙালীর মুখে শেষোক্ত বোলটিই

ছিল সবই—কিন্তু অনভিব্যক্ত।

এটা বোধ করি তুমি দেখিয়াছ যে, দুর্বিণের সোজা দিক দিয়া দেখিলে ছোটো জিনিস্ যেমন বড় দেখায়—দুর্বিণের উল্টা দিক দিয়া দেখিলে বড় জিনিস্ তেম্নি ছোটো দেখায়। মনো-দুর্বিণেরও তেম্নি উল্টা দিক দিয়া দেখিলে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের একটা বৃহৎ কথা আবালবৃদ্ধ বণিতার চিরপরিচিত ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের একটি ক্ষুদ্র কথার সামিল হইয়া দাঁড়ায়। তার সাক্ষী:—দ্বিপ্রহর রাত্রে আমি যখন প্রগাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন, তখন আমার সন্নিধানে—আমিও আছি—আমার মুখ চক্ষু হস্ত পদও আছে—খাট পালঙ্গও আছে—বিছানা বালিশও আছে;—আছে সবই—কিন্তু অনভিব্যক্ত। তুমি হয় তো বলিবে "পৃথিবী জড়বস্তু বই আর তো কিছু না! একটা মশার শরীরে যতটুকু প্রাণ আছে—পৃথিবীর শত সহস্র যোজনব্যাপী দিগ্‌গজ শরীরে তাহার সিকির সিকির সিকি মাত্রাও প্রাণ নাই; যাহার প্রাণই নাই, তাহার আবার চেতনা—তাহার আবার আনন্দ!" তাহা যদি বলো, তবে তাহার উত্তরে আমি বলি এই যে, চেতনাবান্ দ্বিপদ জীবেরা বোল আওড়াইতে শিখিয়াছে বলিয়া তাহারা যে-বস্তুকে যে-নামে সংজ্ঞিত করে, তাহাই যে অকাট্য বেদবাক্য বলিয়া শিরোধার্য্য করিতে হইবে, এমন কোনো কথা নাই। ঐ স্তব্ধ দেয়ালটার ভিতরেও আকর্ষণ-বিকর্ষণ

শুনায় ভাল। শুনায় তো ভালই, তা ছাড়া—"অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ" এটা যেমন শুদ্ধ সংস্কৃত, "অশ্বত্থামা হতো ইতি গজো" এটা তেমনি শুদ্ধ বাংলা। কেননা বাংলাভাষা প্রাকৃত ভাষারই সহোদর। প্রাকৃত ভাষায় সংস্কৃত ভাষার বিভক্তিঘটিত বিসর্গের স্থানে ওকার হয়, তার সাক্ষী—"ইতঃ" সংস্কৃত, "ইদো" প্রাকৃত। এই জন্য বলি যে, "অশ্বত্থামা হতো ইতি গজো" এইটেই শুদ্ধ বাংলা, আর, "অশ্বত্থামা হত ইতি গজ" এটা না সংস্কৃত না বাংলা—আর তাহারই নাম অশুদ্ধ বাংলা বা ভ্রষ্ট বাংলা।

ক্রিয়া নিরন্তর স্পন্দিত হইতেছে; আর, আকর্ষণ-বিকর্ষণ-ক্রিয়ার সে যে স্পন্দন তাহা প্রাণস্পন্দনেরই পূর্ব্বলক্ষণ। প্রাণস্পন্দন তেম্নি-আবার মনঃস্পন্দনের বা আনন্দের পূর্ব্বলক্ষণ; এমন কি প্রাণস্পন্দন এক প্রকার আনন্দের নৃত্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমি তাই বলিতে চাহিতেছি এই যে, ঐ দেয়ালটার মর্ম্মস্থানীয় আকর্ষণ-বিকর্ষণ-ক্রিয়ার ভিতরে প্রাণক্রিয়া চাপা দেওয়া রহিয়াছে। কিন্তু তাও বলি—নিতান্তই চাপা দেওয়া রহিয়াছে বলা এখন আর চলে না! কেন যে বলিতেছি "এখন আর চলে না" তাহার ভিতরের কথাটা তোমাকে তবে বলি:—

পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা পূর্ব্ববঙ্গ কামিখ্যার অনেকটা নিকটবর্ত্তী তাহা তুমি অবশ্য জানো। সেই পূর্ব্ববঙ্গ হইতে কামিখ্যাদেশীয় বিদ্যার যে-এক মহাপণ্ডিত মন্ত্রতন্ত্রযন্ত্র-সহ বাহির হইয়া সম্প্রতি আমাদের মধ্যে দেখা দিয়াছেন, তাঁহার অসাধ্য কার্য্যই নাই! তিনি সোণার কাটি ছোঁআইলেই * নির্জীব ধাতু প্রস্তরাদি সজীব হইয়া ওঠে—রূপার কাটি ছোঁআইলে আবার-তাহারা যেমন-কে-তেম্নি অসাড় হইয়া মরিয়া পড়িয়া থাকে। এইমাত্র আমি তোমার নিকটে যে-একটি রহস্য-কাহিনীর ইঙ্গিত করিলাম সেই কথাটি—অর্থাৎ "দেয়ালটার মর্ম্ম-স্থানীয় আকর্ষণ-বিকর্ষণ-ক্রিয়ার ভিতরে প্রাণস্পন্দন চাপা দেওয়া রহিয়াছে" এই কথাটি—ঐ মায়াবিদ্যা-বিশারদ মহাত্মাটির মন্ত্রতন্ত্রযন্ত্রের খোঁচাখুঁচির জ্বালায় প্রকাশ্যে বাহির হইয়া পড়িয়া বিজ্ঞানের বাঁধা রাস্তায় ধীরে ধীরে পায়চালি করিতে আরম্ভ করিয়াছে; তাহার জন্য এখন আর ভাবনা নাই। কিন্তু এই সঙ্গে আর একটি পরমাশ্চর্য্য রহস্যকাহিনী যাহা আমি তোমাকে চুপি চুপি বলিতে ইচ্ছা করিতেছি

* ছোঁয়া—ছোঁ*ya* সুতরাং অশুদ্ধ। ছোঁআ—ছোঁ*a* সুতরাং শুদ্ধ।

তাহা বিজ্ঞানের বাজারে চলিতে পারিবার মতো জিনিসই নহে; কেননা তাহা একেবারেই যন্ত্রতন্ত্রাদির আয়ত্ত-বহির্ভূত। সে কথা এই যে, ধাতু প্রস্তরাদির প্রাণস্পন্দনের ভিতরে চেতনা এবং আনন্দ চাপা দেওয়া রহিয়াছে। যদি বলো "কেমন করিয়া তুমি তাহা জানিলে?" তবে বলি শোনো—কেমন করিয়া আমি তাহা জানিলাম। এটা যখন স্থির যে, কেহই মরিতে চাহে না—সকলেই বাঁচিতে চাহে, তখন কাজেই বলিতে হয় যে, বড় হো'ক—ছোটো হো'ক, মানুষ হো'ক্—জন্তু হো'ক্, ধাতু হো'ক্—পাষাণ হো'ক্, যেমনই যে-কোনো পদার্থ হো'ক্ না, যাহার শরীরে প্রাণ আছে—সেই প্রাণের প্রতি তাহার প্রাণের টানও আছে; কেননা প্রাণের প্রতি যাহার প্রাণের টান নাই—প্রাণে তাহার প্রয়োজনও নাই। যাহাকে বলে প্রাণের টান তাহাকেই বলে ভালবাসা। যেখানে আনন্দের আস্বাদ পাওয়া যায়, সেইখানেই ভালবাসার আসন জমে। ধাতুপ্রস্তরের প্রাণ আছে যদি সত্য হয়, তবে এটাও সত্য যে, তাহাদের প্রাণের প্রতি তাহাদের প্রাণের টান আছে; তাহাদের প্রাণের প্রতি প্রাণের টান আছে যদি সত্য হয়, তবে এটাও সত্য যে, প্রাণের স্ফূর্ত্তিতে তাহাদের আনন্দের অনুভব হয়; আর, আনন্দের অনুভব বিনা-চেতনে তো হইতেই পারে না। দৃশ্যমান বস্তু সকলের যবনিকার ভিতরে উঁকি দিয়া দেখিলেই যাঁহার চক্ষু আছে তিনি দেখিতে পা'ন যে, সেই যবনিকার আড়ালে জীবনীশক্তি হ্লাদিনীশক্তি এবং চেতনাশক্তি এই তিন মহাশক্তি সখীত্বের প্রেমসূত্রে গাঁথা। আমার ভয় হইতেছে—পুঙ্খানুপুঙ্খ যুক্তিপরম্পরার সহিত দৌড়িয়া চলিতে পাছে আমার সহযাত্রীরা হাঁপাইয়া যা'ন! দুর্দ্দমনীয় যুক্তির অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নাবিয়া—আমি তাই শাস্ত্রের পথ ধরিয়া চলিয়া গম্যস্থানাভিমুখে

ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয় বোধ করিতেছি; অথচ আবার রাজ্যের পুঁথি ঘাঁটিয়া পুঁথি বাড়াইতে মূলেই আমার ইচ্ছা নাই। এইরূপ যখন উভয়-সঙ্কট, তখন, কর্ত্তব্য হ'চ্চে আমার—মধ্যপথ অবলম্বন করা; অর্থাৎ সাংখ্যাদি শাস্ত্রের মুখ্য মন্তব্য কথাটি পরিষ্কার করিয়া ভাঙিয়া বলিতে, যত সংক্ষেপে পারা যায়, তাহারই চেষ্টা দেখা। তাহাতেই এক্ষণে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

চতুর্থ দ্রষ্টব্য।

সঙ্গীত-স্বরের গতিপদ্ধতির ক্রম যেমন অবরোহী এবং আরোহী এই দুই খণ্ডে বিভক্ত, সাংখ্যাদি শাস্ত্রের মতে তেম্নি সমগ্র প্রকৃতির গতি-পদ্ধতির ক্রম অনুলোম এবং প্রতিলোম এই দুই খণ্ডে বিভক্ত। তাহার মধ্যে—পৃথিবীর উৎপত্তি অনুলোম সোপানের শেষের ধাপ; জীবের উৎপত্তি প্রতিলোম সোপানের প্রথম ধাপ। ব্রহ্মাণ্ডচক্রের প্রথম খণ্ডে, কিনা অনুলোম খণ্ডে, রজস্তমোগুণের বন্ধন ক্রমশঃ ঘনীভূত এবং দৃঢ়ীভূত হইয়া তমপ্রধান পৃথিবীতে পর্য্যবসিত হয়। দ্বিতীয় খণ্ডে—কিনা প্রতিলোম খণ্ডে—রজস্তমোগুণের বন্ধন ক্রমশঃ আলগা আলগা হইয়া খুলিয়া খুলিয়া গিয়া মনুষ্যজাতীয় মহাপুরুষদিগের অন্তঃকরণে সত্ত্বগুণের উৎকৃষ্টতম অভিব্যক্তি সংঘটিত হয়। তবে কিনা নীচের ধাপের সাধারণ শ্রেণীর মনুষ্যদিগের পক্ষে রজস্তমোগুণের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ ন্যূনাধিক পরিমাণে দীর্ঘকালসাপেক্ষ। কিন্তু এটা সত্য যে, চেষ্টার অসাধ্য কার্য্যই নাই। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার বিবেক চূড়ামণি গ্রন্থে বলিয়াছেন—

"তস্মান্ মনঃ কারণমস্য জন্তোঃ
বন্ধস্য মোক্ষস্য চ বা বিধানে।

বন্ধস্য হেতুর্মলিনং রজোগুণৈ
মোক্ষস্য শুদ্ধং বিরজস্তমস্কং ॥”

ইহার অর্থ এই যে মনই জীবের বন্ধ-মোক্ষের কারণ। রজস্তমোগুণে মলিনীভূত মন বন্ধের কারণ, আর রজস্তমোবিমুক্ত বিশুদ্ধ মন মুক্তির কারণ। শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় মহাপুরুষদিগের কথার ধারাই এইরূপ। ইঁহাদের অন্তঃকরণের ভিতরকার অভিসন্ধি আর কিছু না—সংসারের বাধাবিঘ্নের প্রতিস্রোতে যাঁহারা প্রাণপণ চেষ্টায় মুক্তিপথে অগ্রসর হইতেছেন তাঁহাদিগকে এইরূপ অভয় বাক্যে উৎসাহিত করা—যে, “তোমার আপনারই মন তোমার বন্ধের কারণ, সুতরাং বন্ধ টুটিয়া ফ্যালা তোমার আপনারই হস্তে। অতএব অবিদ্যা-রাক্ষসীর মায়ামন্ত্র-সকল তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া মুক্তিপথে নির্ভয়ে অগ্রসর হও।” শঙ্করাচার্য্যের ঐ শ্লোকটি শুনিয়া কোনো অভিনব ব্রতী যদি মনে করেন যে, বন্ধ-মোক্ষের কারণ আপনারই তো মন, তবে আর ভাবনা কি ?” তবে তিনি তাঁহার মন'কে এখনো পর্য্যন্ত চিনিতে পারেন নাই; যদি চিনিতে পারিতেন তাহা-হইলে তাঁহার বুলি ফিরিয়া যাইত! মাছিরা যদি মাকড়্সার জাল চক্ষে দেখিতে পাইত, তবে মাছিদের মুখে এ কথা কতকটা শোভা-পাইত যে, মাকড়্সা তো আমাদেরই এক সম্পর্কে বড় দাদা—উহাকে ভয় কিসের? কিন্তু কোনো জালান্ধ মাছির আসন্ন কালে যদি এইরূপ বিপরীত বুদ্ধি হয় যে, “আমি মাকড়্সার চক্ষের সম্মুখ দিয়া উড়িয়া গেলেও সে আমাকে ধরিতে পারিবে না—যে হেতু তাহার পাখা নাই!” তবে তাহার মরণ ঘুনাইয়া আসিয়াছে। অর্জ্জুন কিন্তু তাঁহার মনকে ভাল-মতে চিনিয়াছিলেন, তাই শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—

"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্ দৃঢ়ং।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করং॥"

ইহার অর্থ ঃ—

"মন, কৃষ্ণ, [illegible]ই চঞ্চল, বিষম দুর্দ্দান্ত এবং শক্ত বলবান্। বায়ুকে যেমন হাতের মুঠার মধ্যে ধরিয়া রাখা দুঃসাধ্য—মনকে তেমনি বশে রাখাও দুঃসাধ্য।" অর্জ্জুনের মুখ দিয়া এইরূপ একটি কথা যাহা মনের খেদে বাহির হইয়াছিল তাহাতে প্রমাণ হইতেছে এই যে, মনকে বিধিমতে চিনিতে পারিলেও তাহার হস্ত হইতে পার পাওয়া সুকঠিন। আমার বাল্যকালে, আমার মনে পড়ে, প্রতিমা বিসর্জ্জন দেখিবার জন্য আমরা যখন সকল ভ্রাতায় একত্রে মিলিয়া সাজিয়া গুজিয়া বাহির হইতাম, তখন আমাদের চাকর-বাকরেরা পথের মধ্য হইতে আর-পাঁচরকম খ্যালনার সঙ্গে আমাদের জন্য মুখোস কিনিয়া আনিত। তাহার পরে আমরা নানাবিধ খ্যালনা হাতে করিয়া মহোল্লাসে গৃহে প্রত্যাগমন করিলে কিঙ্করশ্রেণীর কোনো কোনো ব্যক্তি যখন মুখোস্ মুখে দিয়া আমাকে ভয় দেখাইত তখন আমার মন'কে আমি যতই বলিতাম "ও তো অমুক—ওকে কী ভয়!" আমার মন ততই ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া যাইত, আর তাহার কিয়ৎ পরেই আমি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া ফেলিতাম। আমি বেস্ জানিতাম যে, মুখোসের আড়ালে অমুকের হাস্যমুখ ঢাকা দেওয়া রহিয়াছে—কিন্তু তাহা জানা-তে করিয়া আমার ভয়ের স্বল্পমাত্রও লাঘব হইত না। প্রকৃত কথা এই যে একটা প্রবল সংস্কার-সিংহ যখন মনের গুহার মধ্যে প্রসুপ্ত থাকে তখন জ্ঞান-ধনুর্দ্ধর তাহার প্রতি কটাক্ষ করিয়া আপনার মনকে এইরূপ প্রবোধ দ্যান যে, ওটা একটা অমূলক সংস্কার বই আর কিছুই না—যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান! কিন্তু সেই সিংহটার নিদ্রা ভাঙিয়া

গেলে সে যখন পা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া গুহার মধ্য হইতে বাহির হয়, তখন জ্ঞান তাহার কাছে এগোবে কি—তাহাকে দূর হইতে দেখিয়াই জ্ঞানের বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইয়া যায়। আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, ঐ, দেয়ালটা-বটে একটা সত্যিকের জিনিস কিন্তু মনের সংস্কার-গুলা মিথ্যা মায়া বই আর কিছুই না। কিন্তু ফলে কী দেখা যায়? ফলে দেখা যায় ঠিক তাহার বিপরীত! রাজমজুর ডাকাইয়া আনিয়া দেয়ালটার মধ্য হইতে উহার ইষ্টকাদি সমস্ত গঠনোপকরণ বাহির করাইয়া লইয়া সেই রাশীকৃত ইষ্টকাদি গাড়ী বোঝাই করিয়া স্থানান্তরে পাঠানো অতি সহজে হইতে পারে; কিন্তু তুখোড় বিষয়ী ব্যক্তি-দিগের মনের এই যে একটি দৃঢ় সংস্কার যে, ধনমান প্রতিপত্তিই সমস্ত মঙ্গলের মূলাধার, অথবা স্বেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিদিগের মনের এই যে একটি দৃঢ় সংস্কার যে, কাম ক্রোধ লোভ মোহাদির চরিতার্থ-তাই মনুষ্যজীবনের সার-সর্ব্বস্ব; এই সকল অমূলক সংস্কার মনকে যখন রীতিমত পাইয়া বসে তখন সেগুলাকে মন হইতে নড়ানো কঠিন হইতেও কঠিন। আকর্ষণ-বিকর্ষণাদি ভৌতিক শক্তি যেমন জড়পরমাণুগণের উপরে নিরন্তর কার্য্য করে, তেমনি—সাংখ্যদর্শনে যাহাকে বলে "আকুতি" অর্থাৎ বাছুর আসিতেছে দেখিয়া যেমন গোরুর বাঁট হইতে দুগ্ধ ক্ষরণ হইতে থাকে সেইসব-রকমের সংস্কারমূলক প্রবৃত্তিস্রোত—আমাদের প্রাণের উপরে নিরন্তর কার্য্য করিতেছে; আবার, পুরাতন গ্রীক দর্শনকারেরা যাহাকে বলিতেন পরমাণুগণের পরস্পর "sympathy antipathy" সম্বেদ নির্বেদ বা অনুরাগ-বিরাগ তাহা আমাদের মনের উপরে নিরন্তর কার্য্য করিতেছে; আবার, বেদান্ত-দর্শনে যাহাকে বলে "মায়া" (অর্থাৎ অসত্যকে সত্য মনে করা—ক্ষণস্থায়ী সুখকে স্থায়ী সুখ মনে

করা—সংসারকে সার মনে করা—ইত্যাদি) তাহা আমাদের বুদ্ধির উপরে নিরন্তর কার্য্য করিতেছে। এইরূপে আমরা রজস্তমোগুণের বন্ধনে আপাদমস্তক জড়িত হইয়া রহিয়াছি।

ধরিতে গেলে—আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা যাহাকে বলেন "আকর্ষণ-বিকর্ষণ" তাহাও "মায়া" "আকৃতি" অনুরাগ-বিরাগ প্রভৃতির শ্রেণীভুক্ত এক-রকম সংস্কার-মূলক শক্তি। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের এটা একটা স্থির-সিদ্ধান্ত যে, অনবগাহ্যতা (Impenitrability)* জড়পদার্থের একটি অপরিহার্য্য ধর্ম্ম। তাঁহাদের মতে অন্তরীক্ষ প্রদেশে বায়ু এবং জলীয় বাষ্প পরস্পরের যতই গা ঘেঁসিয়া অবস্থিতি করুক্ না কেন—সমুদ্র অঞ্চলে লবণ এবং জল পরস্পরের সহিত যতই মাখামাখি-ভাবে সংলিপ্ত থাকুক না কেন—তথাপি দোঁহার মধ্যে একটু না একটু ব্যবধান থাকিতেই চায়। তবেই হইতেছে যে, জড়বস্তু সকল যখন আকর্ষণ বিকর্ষণ শক্তি-যোগে পরস্পরের উপরে কার্য্য করে, তখন পরস্পরের মধ্যগত ব্যবধানের মধ্য দিয়াই কার্য্য করে, তা বই পরস্পরের সহিত সংলিপ্ত হইয়া কার্য্য করে না। কাজেই বলিতে হয় যে, আকর্ষণ-বিকর্ষণশক্তি একপ্রকার মায়ামন্ত্র—একপ্রকার "আকৃতি"—একপ্রকার sympathy antipathy—একপ্রকার অনুরাগ বিরাগ। সাংখ্যদর্শনের মতে—সূক্ষ্ম আকাশ যখন অনুলোম-ক্রমে অনিলানিল-সলিলের মধ্য দিয়া পৃথিবী-

---

* *Impenitrability* শব্দের অবিকল অনুবাদ "অনবগাহ্যতা" তাহাতে আর ভুল নাই। তা ছাড়া—*Impenitrability* কথাটার শব্দার্থ এবং ভাবার্থের মধ্যে যেরূপ প্রভেদ অনবগাহ্যতা কথাটারও শব্দার্থ এবং ভাবার্থের মধ্যে অবিকল সেইরূপ প্রভেদ। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের নামকরণে ঐরূপ প্রভেদকে ঘাড়ে করিয়া লওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

রূপে পিণ্ডীভূত হয়, তখন তাহা-সে-হয় একপ্রকার আকৃতির প্রবর্ত্তনায়। "আকৃতি" আর কিছু না—মেঘ ডাকিলে যেমন ময়ূর না-নাচিয়া থাকিতে পারে না, তেম্নি কতকগুলি পরমাণু যখন একসঙ্গে নৃত্য করিতে থাকে, তখন পার্শ্বস্থ পরমাণুরা তাহাদের সহিত নৃত্যে যোগ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না ;—ইহারই নাম "আকৃতি", ইহারই নাম Sympathy ইহারই নাম মায়ামন্ত্র।

পঞ্চম দ্রষ্টব্য।

অনুলোম-পদ্ধতির প্রধান অধিনায়ক যেমন আকৃতি, বা অবিদ্যা-মূলক সংস্কার—প্রতিলোম-পদ্ধতির প্রধান অধিনায়ক তেম্নি প্রেম। জীবজগতের উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে রজস্তমো গুণের মায়াহ্রদের মধ্য হইতে সত্ত্বগুণ যতই উচ্চে মস্তক উত্তোলন করিতে থাকে, ততই আকৃতির বা অন্ধসংস্কারের কার্য্য ফুরাইয়া যাইতে থাকে, আর সেই সঙ্গে প্রেমের কার্য্য আরম্ভ হইতে থাকে। আকৃতি এবং প্রেমের মধ্যে প্রধান প্রভেদ এই যে, আকৃতি অবিদ্যার রাজসী শক্তি, প্রেম আত্মার সাত্বিকী শক্তি বা দৈবী শক্তি। অবিদ্যার সম্মোহনী শক্তি রূপার কাটি, প্রেমের উদ্বোধনী শক্তি সোণার কাটি। অবিদ্যার সংস্পর্শে চক্ষুষ্মান্ জীবের চক্ষু অন্ধ হইয়া যায়—প্রেমের সংস্পর্শে অন্ধজীবের চক্ষু প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। নেপোলিয়নের রাক্ষসী মায়াশক্তি তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যসামন্তের উপরে কিরূপ প্রবল পরাক্রমের সহিত কার্য্য করিত তাহা কাহারো অবিদিত নাই, আর, চৈতন্য-মহাপ্রভুর দৈবী মায়াশক্তি নবদ্বীপের অধিবাসীদিগের উপরে কেমন স্বর্গীয় মাধুর্য্যের সহিত কার্য্য করিয়াছিল তাহাও কাহারো অবিদিত নাই। দুয়ের মধ্যে কত না প্রভেদ! নেপোলিয়নের অধীনস্থ সৈন্যেরা "Glory" নামক একটা মিথ্যা প্ররোচনা-

বাক্যের ভেরী-নিনাদে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া দিগ্‌বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইয়া গিয়াছিল, চৈতন্য-মহাপ্রভুর ভক্তেরা হরিনাম-কীর্ত্তনের মধুর সঙ্গীতধ্বনিতে মৃত শরীরে প্রাণ পাইয়া মোহনিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রেম জীবকে রজোগুণ হইতে সত্ত্বগুণে উঠাইয়া দ্যায়, অবিদ্যা জীবকে রজোগুণ হইতে তমোগুণে নাবাইয়া দ্যায়। প্রেম-সোপানের দুইটি ধাপ। নীচের ধাপটি রজোগুণ ঘ্যাঁসা—এটি হ'চ্চে সকাম প্রেম; উপরের ধাপটি সত্ত্বগুণ ঘ্যাঁসা—এটি হ'চ্চে নিষ্কাম প্রেম। নিষ্কাম প্রেম মুক্তির দ্বার-স্বরূপ। উপনিষদে আছে—"তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।" ইহার অর্থ এই যে, অন্তরতর এই যে আত্মা ইনি পুত্র হইতে প্রিয়—বিত্ত হইতে প্রিয়—সকল হইতে প্রিয়।" প্রিয় কেন? ইহার উত্তর এই যে, যেখানে যত কিছু প্রিয় বস্তু আছে সবই আত্মার কারণেই প্রিয়; কিন্তু আত্মা, আর কোনো বস্তুর কারণে প্রিয় নহে—আত্মা স্বতই প্রিয়; আত্মা প্রেম স্বরূপ। এরূপ যদি দেখ যে, একজনের মুখ-চক্ষুর ভিতরে আত্মা সাতহাত জলের নীচে চাপা পড়িয়া রহিয়াছে—আর-একজনের মুখচক্ষুর মধ্য দিয়া আত্মা উঁকি দিতেছে, তবে সে-দুজনের কাহাকে তুমি সুন্দর বলিবে—কাহাকে তুমি সুবুদ্ধিমান বলিবে—কাহার সহিত তোমার প্রথম-পরিচয় হইবামাত্র তুমি বলিবে "আজ আমার শুভদিন?" শেষোক্ত ব্যক্তিকে অবশ্য! রত্ন যেমন রত্ন'কে চেনে—আত্মা তেম্নি আত্মাকে চেনে। পূর্ব্বতন কালের যোগিঋষি মহাপুরুষেরা আত্মাকে চিনিতেন বলিয়া—প্রস্তর পাষাণের সাতপুরু অন্ধকারাবগুণ্ঠন ভেদ করিয়া তাহার মধ্যেও তাঁহারা আত্মাকে দেখিতেন, আর সেইজন্য তাঁহাদের প্রেম কোনো-কিছুরই অবরোধ মানিত না।

চৈতন্য মহাপ্রভু জগাই-মাধাইকে ক্রোড় পাতিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলেন—ইহা সকলেরই জানা কথা। এইরূপে আমরা পাইতেছি :—

(১) জীবের উৎপত্তিই প্রতিলোম-পদ্ধতির প্রথম সোপান।

(২) প্রতিলোম-পদ্ধতির প্রধান অধিনায়ক প্রেম।

(৩) নিষ্কাম প্রেম প্রতিলোম-পদ্ধতির চরম সোপান।

(৪) নিষ্কাম প্রেমের দৈবীশক্তির প্রভাবেই সত্ত্বগুণের অন্তর্নিগূঢ় সুবিমল জ্ঞান এবং আনন্দের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়।

(৫) নিষ্কাম প্রেমের দ্বার দিয়া যখন সত্ত্বগুণের রীতিমত অভিব্যক্তি হয়, তখন তাহাই মুক্তির সোপান।

ষষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

অতঃপর ব্যক্তব্য এই যে, প্রকৃতির গতি-চক্রের দ্বিতীয় খণ্ডই—প্রতিলোম খণ্ডই—গীতাশাস্ত্রে পরা প্রকৃতি বলিয়া উদ্‌গীত হইয়াছে। আর, প্রতিলোম-সোপানের প্রথম ধাপ যেহেতু জীবের উৎপত্তি—এই হেতু সেই পরা প্রকৃতিকে বিশেষ মতে ফুটাইয়া বলা হইয়াছে "জীবভূতা" পরাপ্রকৃতি। এই জীবভূতা পরাপ্রকৃতিই অপরা প্রকৃতির নিগূঢ়তম ভিতরের কথা ; আর, সত্ত্বগুণের চরম উৎকর্ষই—শুদ্ধ সত্ত্বই—পরা প্রকৃতির মস্তকের মণি।

পাতঞ্জল দর্শনের প্রথম পাদের ২৪শ সূত্রের ভোজরাজকৃত টীকায় একটি নিগূঢ়তম তত্ত্বের সন্ধান যাহা অতীব সংক্ষেপে দুইচারি কথায় বলিয়া দেওয়া হইয়াছে—সেইটি এখানে সবিশেষ দ্রষ্টব্য। তাহা এই :—

"তস্য চ (অর্থাৎ ঈশ্বরস্য চ) তথাবিধং ঐশ্বর্য্যং অনাদেঃ সত্ত্বোৎকর্ষাৎ। সত্ত্বোৎকর্ষশ্চ প্রকৃষ্ট জ্ঞানাদেব। ন চানযো র্জ্ঞানৈশ্বর্য্যয়োরিতরেতরাশ্রয়ত্বং পরস্পরানপেক্ষত্বাৎ।

ইহার অর্থ ঃ—

ঈশ্বরের সেই যে ঐশ্বর্য্য তাহার গোড়ার কথা হ'চ্চে অনাদি সত্ত্বোৎকর্ষ ; আর, অনাদি সত্ত্বোৎকর্ষের গোড়া'র কথা হ'চ্চে প্রকৃষ্ট জ্ঞান। এই যে জ্ঞান এবং ঐশ্বর্য্য উভয়ে পরস্পর হইতে নির্লিপ্ত।

রূপকচ্ছলে আমি যাহাকে বলিলাম জীবভূতা পরাপ্রকৃতির মস্তকের মণি—পাতঞ্জল দর্শনের টীকাকার মহাত্মা-ভোজরাজ তাহাকে বলিতেছেন ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য, অথবা যাহা একই কথা—ঈশ্বরের মহিমা। তিনি বলিতেছেন "অনাদি সত্ত্বোৎকর্ষ ঈশ্বরের মহিমা।" ভোজরাজ যাহাকে বলিতেছেন "অনাদি সত্ত্বোৎকর্ষ",—গীতাশাস্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৫শ শ্লোকে তাহাকেই বলা হইয়াছে নিত্যসত্ত্ব; আর, শঙ্করাচার্য্যের প্রণীত নানা পুস্তকের নানা স্থানে তাহাকেই বলা হইয়াছে শুদ্ধ সত্ত্ব। পাতঞ্জলের টীকাকার মহাত্মা-ভোজরাজ আরো বলিতেছেন এই যে, ঈশ্বরের সেই যে মহিমা—কি না শুদ্ধ-সত্ত্ব—ঈশ্বরের জ্ঞান তাহা হইতে নির্লিপ্ত। নির্লিপ্ত কেন? না ঈশ্বরের জ্ঞান যেহেতু তাঁহার স্বরূপের অন্তঃপাতী, আর তাঁহার মহিমা যেহেতু প্রকৃতির অন্তঃপাতী, সেইজন্যই উভয়ে পরস্পর হইতে নির্লিপ্ত। কিয়ৎ পূর্ব্বে যেমন আমরা দেখিয়াছি যে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত-মতে জড়পরমাণু সকল পরস্পরের মধ্যগত ব্যবধানের মধ্য দিয়া পরস্পরের উপরে কার্য্য করে, অথবা, যাহা একই কথা—পরস্পর হইতে নির্লিপ্ত থাকিয়া আকর্ষণাদি-শক্তি-যোগে পরস্পরের উপরে কার্য্য করে ; এক্ষণে তেম্নি আমরা দেখিতেছি যে, পাতঞ্জল দর্শনের সিদ্ধান্ত মতে স্বয়ং ঈশ্বর তাঁহার মহিমা হইতে নির্লিপ্ত থাকিয়া শক্তিযোগে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপরে কার্য্য করিতেছেন। আবার উপনিষদে আছে "স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি—স্বে মহিম্নি"

ইহার অর্থ এই যে, যদি জিজ্ঞাসা কর ভগবান্-তিনি কিসে 'প্রতিষ্ঠিত' তবে তাহার উত্তর এই যে, তিনি তাঁহার আপন মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত উপনিষদের এই কথাটির সঙ্গে পূর্ব্বপ্রদর্শিত পাতঞ্জল দর্শনের ঐ কথাটীর তান মিলাইয়া রূপকচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে, পদ্মপত্র যেমন নির্লিপ্ত ভাবে সরোবরের নীরাসনে অধিষ্ঠান করে—পরমাত্মা তেম্নিতর-নির্লিপ্তভাবে আপনার মহিমাতে—জীবভূতা পরাপ্রকৃতির হিরণ্ময় পরম কোষে—পরম পরিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের দিব্য জ্যোতির্মণ্ডলে—অধিষ্ঠান করিতেছেন। উপনিষদে এ কথাও বলে যে,

"তাবানস্য মহিমা ততো
জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ"

ইহার অর্থ এই :—

তাঁহার মহিমা যতই বড় হউক্ না কেন—পুরুষ-তিনি তাহা অপেক্ষাও বড়।

এই উপনিষদ্-বাক্যটিকে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিয়া বেদান্ত-দর্শনের ৪র্থ অধ্যায়ের ৪র্থ পাদের ১৯শ সূত্রের শাঙ্করভাষ্যে লিখিত হইয়াছে

"তথাহ্যস্য দ্বিরূপাং স্থিতি মাহ আম্নায়ঃ"

ইহার অর্থ এই যে, পরমেশ্বরের দুইরূপ স্থিতির কথা বেদে উল্লিখিত হইয়াছে।

সে দুইরূপ স্থিতি যে, কী, তাহা বেদান্তাদি শাস্ত্রের মর্ম্মের ভিতরে কিঞ্চিন্মাত্র প্রণিধান করিয়া দেখিলেই কাহারো নিকটে গোপন থাকিতে পারে না। তাহা এই :—

☞ (১) স্বরূপে স্থিতি।
(২) মহিমাতে স্থিতি।

শাস্ত্রোক্ত এই সকল নিগূঢ় কথার প্রকৃত মর্ম্ম এবং তাৎপর্য্য যাহা খুব ঠিক্ বলিয়া আমার মনে লাগিতেছে তাহা সংক্ষেপে এই :—

পরমাত্মা একদিকে আপনার মহিমাতে নির্লিপ্ত ভাবে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, আর, তাঁহার স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়ার প্রভাবে—তাঁহার অভিপ্রায়ের ইঙ্গিতমাত্রে—কোটি কোটি জগৎ মহাব্যোমে ভ্রাম্যমান হইতেছে; আর-একদিকে তিনি আপনার শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত অনাদি অনন্ত এবং অপরিবর্ত্তনীয় স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন।

বিষয়টি অত্যন্ত নিগূঢ় এবং গভীর। একটি উপমার অবতারণা করিতেছি—তাহা দৃষ্টে বোধ করি বা উহার মর্ম্ম এবং তাৎপর্য্য কথঞ্চিৎ প্রকারে শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে।

(১) সমুদ্রের গভীর অন্তস্তল নিস্তরঙ্গ।

(২) সমুদ্রের উপরের তল তরঙ্গসঙ্কুল।

(৩) সমুদ্রের ঐ দুই তলের মাঝের জায়গায় আর-একটি তল আছে যাহা তরঙ্গিত প্রদেশের সমাপ্তি-স্থান এবং নিস্তরঙ্গ প্রদেশের আরম্ভ-স্থান।

(৪) সমুদ্রের গভীর অন্তস্তল যেমন নিস্তরঙ্গ—তাহার ঐ মাঝের তলটিও তেম্নি নিস্তরঙ্গ; অথচ সেই মাঝের তল হইতেই তরঙ্গ সকল উত্থান করিতেছে—উত্থান করিয়া আবার সেই মাঝের তলেই বিলীন হইতেছে।

(৫) সমুদ্রের মাঝের তলটি-যে বড় ছোটো-খাটো জিনিস্—তাহা নহে। সমুদ্রের যেমন কোথাও কূলকিনারা নাই, তাহার মাঝের তলটিরও তেম্নি কোথাও কূলকিনারা নাই। অথচ সেই মাঝের তলটি সমুদ্রের একাংশ বই নহে। এই গেল উপমা। প্রকৃত কথা যাহা—তাহা এই :—

(১) বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এপারে সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়ের তরঙ্গ উত্থান-পতন করিতেছে।

(২) ওপারে বুদ্ধি-মনের অগম্য প্রদেশে শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত পরমাত্মা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন।

(৩) এপার এবং ওপারের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে ঈশ্বরের ঐশী শক্তি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। সেই মধ্যবর্ত্তী প্রদেশটিই সৃষ্টির উত্থান-স্থান, স্থিতির আশ্রয়-স্থান এবং প্রলয়ের বিরাম স্থান। এই মধ্যস্থানটি ঈশ্বরের মহিমা। তাঁহার এই মহিমার মধ্যেই ঐশীশক্তি নিরন্তর কার্য্য করিতেছে। নিপুণ অশ্বারোহী যেমন অশ্বে অধিষ্ঠিত—কিন্তু অশ্বের বশীভূত নহে; অশ্বই অশ্বারোহীর বশীভূত;—তেমনি ঈশ্বর ঐশীশক্তির বশীভূত নহেন—প্রত্যুত ঐশীশক্তি ঈশ্বরের সম্পূর্ণ বশবর্ত্তিনী; আর, তাহা হইতেই আসিতেছে যে, ঈশ্বর আপনার মহিমাতে (কি না ঐশীশক্তিতে) নির্লিপ্ত ভাবে অধিষ্ঠান করিতেছেন। সমুদ্রের নিস্তরঙ্গ মাঝের তলটি যেমন সমুদ্রের একাংশ—তেমনি ঐশীশক্তি ঈশ্বরের একাংশমাত্র; অথচ সেই ঐশী-শক্তির যোগে তিনি সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

সপ্তম দ্রষ্টব্য।

প্রকৃত পক্ষে জীবাত্মার অংশ যদিচ নাই, অথচ যেমন একভাবে বলা যাইতে পারে যে, মানব-দেহের মস্তিষ্কের সারাংশই জীবাত্মার জ্ঞানাংশ, তেম্নি অখণ্ড পরমাত্মার প্রকৃত পক্ষে যদিচ অংশ নাই, তথাপি একভাবে বলা যাইতে পারে যে, পরমাত্মার ঐশ্বর্য্য বা বিভূতি বা মহিমা তাঁহার একাংশ মাত্র। গীতাশাস্ত্রে বলা হইয়াছেও তাই। তার সাক্ষী গীতাশাস্ত্রের দশম অধ্যায়ের সর্ব্বশেষের শ্লোক-দুটিতে বলা হইয়াছে—

"যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিত মেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশ সম্ভবং॥
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নং একাংশেন স্থিতো জগৎ॥"

ইহার অর্থ ঃ—

যেখানে যত কিছু ঐশ্বর্য্যবান্ শ্রীমান্ এবং বলবীর্য্যবান্ সত্ত্ব আছে সমস্তই জানিও আমার তেজাংশ * হইতে সমুদ্ভূত। অথবা অত কথা কী হইবে তোমার জানিয়া অর্জ্জুন—আমি আমার একাংশের ঠেকো দিয়া সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছি।

সে একাংশ যে, কি, তাহার সন্ধান সপ্তম অধ্যায়ে জ্ঞাপন করা হইয়াছে এইরূপ ঃ—

"ভূমি রাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেবচ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়ং, ইতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥"

ইহার অর্থ ঃ—

আমার এই যে অষ্টধাভিন্না প্রকৃতি—ভূমি জল অনল বায়ু আকাশ মন বুদ্ধি এবং অহঙ্কার, ইহা অপরা প্রকৃতি ; এতদ্ব্যতীত আর এক প্রকৃতি আছে যাহা জীবভূতা, তাহাই জানিও আমার পরা প্রকৃতি ; সেই-পরাপ্রকৃতি—যাহা সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

পূর্ব্বপ্রদর্শিত শ্লোকদুটির শেষে রহিয়াছে "আমি আমার একাংশের ঠেকো দিয়া সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছি" ; আর, অত্র-

---

* বাংলা ভাষায় তেজ্রাংশই ভাল।

প্রদর্শিত শ্লোকদ্বটির শেষে রহিয়াছে "আমার জীবভূতা পরাপ্রকৃতিই সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছে।"

ইহাতে এইরূপ বুঝাইতেছে যে, জীবভূতা পরাপ্রকৃতিই পরমাত্মার সেই একাংশ যাহাতে-করিয়া তিনি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

অতঃপর বক্তব্য এই যে, বাল্মীকি মুনির রামায়ণ-গান প্রথম উপক্রমে যদিচ অবরোহি-ক্রমে রামের রাজ্যচ্যুতি হইতে ক্রমশ নীচে নামিয়া সীতাহরণের হাহাকারে পরিসমাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ঠিক তাহার বিপরীত; তাহা কী? না রাক্ষসদিগের হস্ত হইতে সীতা দেবীকে উদ্ধার করিয়া তাঁহাকে অযোধ্যার সিংহাসনে রামের বাম পার্শ্বে বসানো। সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য, তেম্নি, সত্ত্বগুণের দৈবী শক্তিকে রজস্তমোগুণের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া জীবরাজ্যের সিংহাসনে আত্মার বাম পার্শ্বে বসানো। ষষ্ঠ দ্রষ্টব্যের গোড়াতেই আমি তাই বলিয়াছি এবং এখানে আরেক-বার বলা আবশ্যক মনে করিতেছি যে, প্রকৃতির গতিচক্রের দ্বিতীয় খণ্ডই—প্রতিলোম খণ্ডই—গীতাশাস্ত্রে পরাপ্রকৃতি বলিয়া উদ্‌গীত হইয়াছে। আর, প্রতিলোম-সোপানের প্রথম ধাপ যে হেতু জীবের উৎপত্তি—এই হেতু সেই পরাপ্রকৃতিকে বিশেষ মতে ফুটাইয়া বলা হইয়াছে "জীবভূতা পরাপ্রকৃতি।" এই জীবভূতা পরাপ্রকৃতিই অপরা প্রকৃতির নিগূঢ়তম ভিতরের কথা; আর, সত্ত্বগুণের চরম উৎকর্ষই—শুদ্ধ সত্ত্বই—পরাপ্রকৃতির মস্তকের মণি।

গীতাশাস্ত্রের অন্ধি-সন্ধির মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানের যে সকল নিগূঢ় কথা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা আমি সাধ্যানুসারে বিবৃত করিলাম। কিন্তু আমার সাধ্যই বা কতটুকু—আর যাহা আমি বিবৃত করিলাম তাহাই

বা কতটুকু! সবই সমুদ্রে অর্ঘ্য দান! তত্ত্বানুসন্ধানে আমি যতই অগ্রসর হইতেছি ততই দেখিতেছি যে, সকলই অকূল অপার, অনির্ব্বচনীয়, এবং আশ্চর্য্য হইতেও আশ্চর্য্য। বহুপূর্ব্বে ঝিঁঝিঁটের সুরে আমি একটি গীত বাঁধিয়াছিলাম—এইখানে তাহার কয়েকটি ছত্র আমার মনে পড়িতেছে। সে কয়েকটি ছত্র এই :—

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল ঠুংরি।

কর তাঁর নাম গান। যত দিন রহে দেহে প্রাণ।
যাঁর হে মহিমা জ্বলন্ত জ্যোতি জগত করে রে আলো,
স্রোত বহে প্রেম-পীযূষ-বারি সকল জীব-সুখকারী হে।
করুণা স্মরিয়ে তনু হয় পুলকিত, বাক্যে বলিতে কি পারি।
যাঁর প্রসাদে এক মুহূর্ত্তে সকল শোক অপসারি, হে।
উচ্চে নীচে, দেশ দেশান্তে, জলগর্ভে কি আকাশে—
অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর, এই সদা, সবে জিজ্ঞাসে হে।

উপসংহার।

গীতার শাস্ত্রকার মহর্ষিদেব সুমধুর কবিতার ভাষায় তত্ত্বজ্ঞানের সার সত্য, অধ্যাত্মযোগের সহজ পদ্ধতি, এবং ভগবৎপ্রেমের অমৃত উপদেশ সুগারোহ সোপান-পরম্পরা-ক্রমে অল্প পরিসরের মধ্যে একত্র সন্নিবেশিত করিয়া ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়-গণের কী-যে উপকার করিয়াছেন তাহা বলিবার নহে! ভগবদ্‌গীতার ভাষা দেব-ভাষা! তাহার কোনো স্থানে কোনোপ্রকার জটিলতার পাকচক্র নাই—কোনোপ্রকার কৃত্রিমতার নামগন্ধ নাই; সকলই উদার—সকলই সরল—সকলই সুধাময়! কল্যাণের যেন প্রমুক্ত স্বর্গগঙ্গা—এমনি স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার যে, তাহার কোনো একটি স্থানে দর্শকের চক্ষু পড়িলে তাহার সুগভীর অন্তস্তল পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচরে ভাসমান হইয়া ওঠে। গীতার ক্ষুদ্রায়তন পুঁথি-খানির মূলের শ্লোকগুলি যখনই যখন আদ্যোপান্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করা যায়, তখন, শ্রীকৃষ্ণ শুধুই যে কেবল পুরাণের শ্রীকৃষ্ণ নহেন—অর্জ্জুন শুধুই যে কেবল ইতিহাসের অর্জ্জুন নহেন—যজ্ঞানুষ্ঠান শুধুই যে কেবল অগ্নিতে আহুতি-প্রদান নহে—তাহা বেস্ বুঝিতে পারা যায়। বেস্ বুঝিতে পারা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ শব্দের ভিতরের অর্থ জীবাত্মার প্রিয়তম পরমাত্মা, অর্জ্জুন-শব্দের ভিতরের অর্থ পরমাত্মার প্রিয়তম জীবাত্মা; যজ্ঞানুষ্ঠান-শব্দের ভিতরের অর্থ লোকহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান। শ্রীকৃষ্ণকে যদি মূর্ত্ত শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া মনে ভাবা

যায়, আর সেই সঙ্গে অর্জ্জুনকে যদি মূর্ত্ত অর্জ্জুন বলিয়া ভাবা যায়, তবে আমরা বলিতে পারি শুধু এই পর্য্যন্ত যে, ভগবদ্‌গীতা মহাভারতের অন্তর্গত একটি মনোহর খণ্ড-মহাকাব্য। পক্ষান্তরে, শ্রীকৃষ্ণকে যদি জীবাত্মার পরম সহায় এবং পরম সুহৃৎ পরমাত্মার আর এক নাম বলিয়া গ্রহণ করা যায়, আর সেই সঙ্গে যদি অর্জ্জুনকে পরমাত্মার পরম ভক্ত জীবাত্মার আর এক নাম বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি যে, ভগবদ্‌গীতা ভারতবর্ষের সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রের, অথবা, যাহা একই কথা—বেদান্ত-উপনিষদের, মথিত সারাংশ।

প্রশ্ন॥ তা তো বুঝিলাম! কিন্তু তাহা পদার্থটা কি? "ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের মথিত সারাংশ" বলিতেছ তুমি কাহাকে?

উত্তর॥ ভোজের সময় তিক্ত রস দিয়া অনুষ্ঠিতব্য কার্য্যের গোড়া পত্তন করা আমার বিবেচনায় কাজটা খুব ভাল, আর সেই জন্য বেদান্ত সাংখ্য পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্রের পুঁথির পাতা কচ্‌লাইয়া তিক্ত রসের পরিবেশন যতদূর করিবার তাহা আমি পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনে সাধ্যমতে করিয়া চুকিয়াছি—অতএব আজ আর না! দর্শনশাস্ত্র ছাড়া আরো শাস্ত্র আছে—আস্বাদনশাস্ত্রও শাস্ত্র! শেষোক্ত শাস্ত্রের "মধুরেণ সমাপয়েৎ" বচনটির সম্মানরক্ষা আমাকর্ত্তৃক যতদূর সম্ভবে তাহার কোনো প্রকার ত্রুটি না হয় সেই চিন্তা এক্ষণে আমার মনোমধ্যে বলবতী; তাই গীতাদি প্রাচীন শাস্ত্রের সাঁশালো এবং রসালো প্রদেশ গুলি আদ্যোপান্ত মনোযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়া আমি যাহা সার বুঝিয়াছি তাহাই আজ আশ্রমবাসী সুধীজনের সেবায় সঁপিয়া দিয়া গীতাপাঠের উপসংহার-কার্য্যটি মধুরেণ সমাপন করিব মনে করিয়াছি; আর তাহাতে যদি আমি কৃতকার্য্য

হই, তবে তোমার প্রশ্নের মীমাংসা আমার বিদ্যাবুদ্ধির উপরে যতদুর নির্ভর করে তাহা আপনা হইতেই সহজে নিষ্পন্ন হইয়া যাইবে, তা বই—তাহার জন্য আমাকে উপরন্তু কোনো প্রকার প্রয়াস পাইতে হইবে না। অতএব প্রণিধান কর ঃ—

আমি যখন নিদ্রায় অচেতন ছিলাম, তখন আমিই বা কিরূপ, তুমিই বা কিরূপ, জগৎই বা কিরূপ—কিছুই তাহা জানি না; ভাবি-ও না যে, আমি বলিয়া বা তুমি বলিয়া বা জগৎ বলিয়া একটা-কোনো পদার্থ কোনো স্থানে আছে বা কোনো কালে ছিল। যখন জাগিয়া উঠিয়া চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম—দেখিলাম এক অনির্ব্বচনীয় অদ্ভুত ব্যাপার! দেখিলাম **সত্য** আমাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে! দেখিলাম সত্য আমার বাহির হইতে বাহিরে প্রসারিত রহিয়াছে—আমার অন্তর হইতে অন্তরে প্রবিষ্ট রহিয়াছে! সত্যকে ছাড়িয়া আমি একতিলও কোথাও নড়িয়া বসিতে পারি না—এক মুহূর্ত্তও কোনো কিছু ভাবিতে চিন্তিতে পারি না। এক অদ্বিতীয় সত্য বিশুদ্ধ এবং উদয়াস্তবিহীন অটল জ্ঞানের আলোকে নিরন্তর স্বপ্রকাশ! আমাতেও স্বপ্রকাশ—তোমাতেও স্বপ্রকাশ! ক্ষুদ্রাৎ ক্ষুদ্র বালুকণাতেও স্বপ্রকাশ—সূর্য্যাতিসূর্য্যেও স্বপ্রকাশ! আজিও স্বপ্রকাশ—কালিও স্বপ্রকাশ! দেশ-নির্বিশেষে, কাল-নির্বিশেষে, পাত্র-নির্বিশেষে, সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতের অন্তরে বাহিরে স্বপ্রকাশ! **সত্য** যদি আপনার বলে আপনি বর্ত্তমান না হইতেন—আপনার জ্যোতিতে আপনি প্রকাশ না পাইতেন—তবে তোমার-আমার অপেক্ষা শতসহস্র গুণে বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন শতসহস্র মহা মহা পণ্ডিত একযোট হইয়া শতসহস্র বৎসর বংশপরম্পরা ক্রমে প্রাণপণ চেষ্টা করিলেও বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোথাও কোনো

স্থানে সত্যের যৎস্বল্প আভাস-মাত্রও হৃদয়ঙ্গম করিয়া সুখী হইতে পারিতেন না। এই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বান্তর্যামী স্বয়ম্ভু স্বপ্রকাশ একমাত্র অদ্বিতীয় অখণ্ড সত্যকে আমরা যখন আমাদের বুদ্ধির আয়ত্তের মধ্যে ধরিয়া পাইতে চেষ্টা করি, তখন আমাদের স্ব স্ব বিদ্যা-বুদ্ধির আপাত-সুলভ ধারণার উপযোগী নানাপ্রকার খণ্ড-সত্যকে অখণ্ড সত্যের স্থলাভিষিক্ত করিয়া ভ্রান্তি-চক্রে ঘূর্ণায়মান হই। অল্প-দর্শী বুদ্ধিবিদ্যার যুক্তিপ্রণালীর সিঁড়ির ধাপ প্রধানতঃ দুইটি :—

প্রথম ধাপ।

যুক্তি-সোপানের সবে-মাত্র প্রথম ধাপে পদার্পণ করিয়াই আমরা একমাত্র অদ্বিতীয় অখণ্ড সত্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলি;—ইন্দ্রিয়াতীত এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য—এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলি; আর সেই দুই ভাগের একভাগ-মাত্রকে—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়-সমষ্টিকে—পরিপূর্ণ সত্যের স্থলাভিষিক্ত করি। বিপথ-গমনের এই-আরম্ভ-স্থানটির যুক্তি প্রণালী এইরূপ :—

আমি আমার জন্মাবধি এ-যাবৎকাল পর্য্যন্ত আমার অধিকারস্থ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুগুলিকে আমার জ্ঞানের বিষয়-ক্ষেত্রে আসা-যাওয়া করিতে দেখিতেছি প্রতিদিন সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দণ্ডে দণ্ডে, ঘণ্টায় ঘণ্টায়, পলকে পলকে। ও-গুলি আমার চির-কেলে বন্ধু;—কাজেই ও-গুলিকে আমি কোনো হিসাবেই সত্য ছাড়া মিথ্যা বলিতে পারি না। আমার জ্ঞানটি'কে কিন্তু আমার জন্মাবধি এ-যাবৎকাল পর্য্যন্ত তাহার নিজের বিষয়ক্ষেত্রে ভুলক্রমেও পদার্পণ করিতে দেখিলাম না! দৃশ্য বস্তু সাদা বা কালো বা পাণ্ডুর বা রঙ্গীন—জ্ঞান সাদাও না কালোও না পাণ্ডুরও না রঙ্গীনও না! দৃশ্য দেহ স্থূল বা কৃশ বা দুয়ের মাঝামাঝি—জ্ঞান স্থূলও না, কৃশও না, দুয়ের মাঝা-

মাঝিও না! স্পৃশ্য বস্তু কঠিন বা কোমল বা দুয়ের মাঝামাঝি—জ্ঞান কঠিনও না, কোমলও না, দুয়ের মাঝামাঝিও না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু-সকল জ্ঞানের বিষয়—জ্ঞান জ্ঞানের অবিষয়! জ্ঞানের সুবিজ্ঞাত বিষয়-সমূহ'কে আমরা সত্য বলি বলিয়া—যাহাকে আমরা চক্ষে দেখি না, কর্ণে শুনি না, ধরিতে ছুঁতে পাই না, তাহাকেও যে সত্য বলিতে হইবে—জ্ঞানের মতো একটা ফাঁকা অবস্তুকেও যে সত্য বলিতে হইবে—তাহার কোনো অর্থ নাই। এই প্রকার প্রথম ধাপের যুক্তির বশবর্ত্তী হইয়া দুই শতাব্দী পূর্ব্বে ফরাসীস-দেশীয় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়-সকলকেই সত্যের সার-সর্ব্বস্ব বলিয়া অবধারণ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় ধাপ।

যুক্তির প্রথম ধাপ হইতে দ্বিতীয় ধাপে উত্থান করিয়া আমরা যখন সত্যের মধ্যে আর একটু তলাইয়া দেখি তখন দেখিতে পাই যে, আলোককে চক্ষুর সম্মুখ হইতে সরাইয়া দিলে সেই সঙ্গে যেমন দৃশ্য-বস্তু-সকলও চক্ষুর সম্মুখ হইতে সরিয়া পলায়, তেমনি জ্ঞাতাপুরুষের সম্মুখ হইতে জ্ঞানকে সরাইয়া দিলে জ্ঞেয় বস্তুসকলও জ্ঞাতাপুরুষের সম্মুখ হইতে সরিয়া পলায়। অতএব, এই কাগজটার এ পৃষ্ঠা হইতে ওপৃষ্ঠা ছাঁটিয়া ফ্যালা যেমন অসম্ভব, জ্ঞেয়-বস্তুসকলের গাত্র হইতে জ্ঞানকে ছাঁটিয়া ফ্যালা তেমনি অসম্ভব। ফল কথা এই যে, সূর্য্যালোকে-আলোকিত দৃশ্যমান বস্তুসকলের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যালোক নিজেও যেমন আমাদের নেত্রগোচরে প্রকাশ পায়—দৃশ্যমান লাল বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে লাল আলো প্রকাশ পায়—নীল বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে নীল আলো প্রকাশ পায়—পীত বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে পীত আলো প্রকাশ পায়, তেমনি জ্ঞানালোকিত জ্ঞেয়বস্তুসকলের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানালোক নিজেও আমা-

দের জ্ঞান-গোচরে প্রকাশ পায়; আমাদের জ্ঞান-গোচরে—বিস্তৃত বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে আকাশ-জ্ঞান প্রকাশ পায়, দৃশ্য বস্তুর স্থান-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কাল-জ্ঞান প্রকাশ পায়, পরিমিত বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে পরিমাণ-জ্ঞান প্রকাশ পায়, সম্বদ্ধ বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে সম্বন্ধ-জ্ঞান প্রকাশ পায়। এইরূপ যখন আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে, জ্ঞেয় বস্তু সকল আমার সম্মুখে প্রকাশ পাইতে থাকিলে সেই সঙ্গে আমার জ্ঞানালোকও আমার সম্মুখে প্রকাশ পাইতে ক্ষান্ত থাকে না, তখন, জ্ঞেয়-বস্তু সকলকে আমি যে-হিসাবে সত্য বলিয়া অবধারণ করি, জ্ঞানকেও আমি সেই হিসাবে সত্য বলিয়া অবধারণ করিতে কাজে-কাজেই বাধ্য। অতএব এ কথা আমি খুবই মানি যে, জ্ঞেয়-বস্তু-সকল যে-হিসাবে সত্য—জ্ঞানও সেই হিসাবে সত্য। কিন্তু তা' বলিয়া এ কথায় মাথা নোয়াইতে আমি প্রস্তুত নহি যে, একজন কেহ আমার মস্তিষ্কের আড়ালে দাঁড়াইয়া পৃথিবীর জ্ঞানালোকিত রঙ্গশালায় জ্ঞেয়-বস্তুসকলের নাট্যলীলা দর্শন করিতেছে। জ্ঞানের পশ্চাতে যদি সত্য-সত্যই কোনো জ্ঞাতাপুরুষ দণ্ডায়মান থাকে তবে তাহাকে জ্ঞানের আশ্রয় (Subject) মাত্র বলিয়া ক্ষান্ত থাকাই আমাদের উচিত; তাহার ঊর্দ্ধে তাহাকে জ্ঞানের বিষয় Object বলা উচিত হয় না এইজন্য—যেহেতু আমার মস্তক যেমন আমার হস্তপদের ন্যায় আমার চক্ষুগোচরে প্রকাশ পাইতে পারে না, জ্ঞানের আশ্রয় (subject) তেমনি জ্ঞানের বিষয়ের (object এর) ন্যায় জ্ঞানগোচরে প্রকাশ পাইতে পারে না; আর, প্রকাশ পাইতে যখন পারে না, তখন, কাজেই বলিতে হয় যে, জ্ঞাতা পুরুষকে সত্য বলিয়া অবধারণ করা মনুষ্যবুদ্ধির অধিকার-বহির্ভূত। এই দ্বিতীয় ধাপের যুক্তির বশবর্ত্তী হইয়া বিগত শতাব্দীর জর্ম্মাণ দেশীয় দার্শনিক পণ্ডিতগণের অগ্রণী

মহাত্মা কাণ্ট জ্ঞেয় বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়োপরক্ত জ্ঞানকেই (সংক্ষেপে বিষয়-জ্ঞানকেই) সত্যের সারসর্ব্বস্ব বলিয়া অবধারণ করিয়াছিলেন, তা বই—আত্মজ্ঞানকে সত্যের কোটায় আমল দ্যা'ন নাই। রূপকচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে, বিশুদ্ধজ্ঞান-রূপী শিব-চরিত্রের সমালোচক জর্ম্মানদেশীয় দক্ষ-বিদ্যাধিপতি কাণ্ট তাঁহার দার্শনিক মহাযজ্ঞে রাজ্যশুদ্ধ দেবতাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন—আকাশের দেবতা দেবরাজ, কালের দেবতা যমরাজ, বুদ্ধির দেবতা বৃহস্পতি, মনের দেবতা চন্দ্র, এই সকল যজ্ঞ-মধুলিহ দেবতাগণের একজনও-কাহুকে নিমন্ত্রণ করিতে বাকি রাখেন নাই—অ্যাকা কেবল মঙ্গল যিনি মূর্ত্তিমান্ সেই আত্মার অধিদেবতা শিবকে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই ধরেন নাই!

আদিম ব্রহ্মবাদিগণের

প্রদর্শিত

শ্রেয়ের পথ।

আমাদের দেশের কিন্তু পুরাকালের ব্রহ্মবাদী আচার্য্যগণ সকল-সত্যের শীর্ষস্থানে—ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার কৈলাশ-শিখরে—আত্মজ্ঞানের আসন-প্রতিষ্ঠা করিতে সাধ্য-সাধনার ক্রটি করেন নাই। ইঁহাদের শিষ্যানুশিষ্য-শ্রেণীর কোনো মহাত্মা তাঁহার পরিপক্ব চিন্তার ফল সুন্দর একটি শ্লোকের স্বর্ণপাত্রে যত্নপূর্ব্বক গুছাইয়া রাখিয়াছেন এইরূপ :—

ঘনাচ্ছন্নদৃষ্টি র্ঘনাচ্ছন্নমর্কং যথা নিস্প্রভং মন্যতে চাতিমূঢ়ঃ।
তথা বদ্ধবদ্ ভাতি যো মূঢ়দৃষ্টেঃ স নিত্যোপলব্ধি স্বরূপোঽহমাত্মা॥"

ইহার অর্থ :—

মেঘাচ্ছন্ন-দৃষ্টি মূঢ় ব্যক্তি যেমন মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যকে প্রভাহীন মনে করে, সেইরূপ মূঢ়জনের দৃষ্টিতে যে-আমি মোহাচ্ছন্নের ন্যায় প্রতিভাত হই, সে-আমি নিত্যজ্ঞান স্বরূপ আত্মা।

আমাদের দেশের আদিম ঋষিরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দুইটি মুখ্যস্থানে পরম সত্য পরমাত্মার মঙ্গলময় মুখজ্যোতি দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন—ভয়াবহ সংসারে অভয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—মৃত্যুময় সংসারে অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন—দুঃখ-শোকময় সংসারে পরমানন্দের খনি পাইয়াছিলেন; সেই ধন পাইয়াছিলেন—যাহা পাইলে তাহা অপেক্ষা অধিক আর-যে-কিছু পাইবার আছে তাহা মনে হয় না, আর, যাহাতে ভর করিয়া দাঁড়াইলে গুরু বিপদেও মন বিচলিত হয় না—

"যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাঽপি বিচাল্যতে॥"

ভগবদ্‌গীতা। অধ্যায় ৬। শ্লোক ২২॥

সে দুইটি মুখ্যস্থানের একটি হ'চ্চে বৃহদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের হিরণ্ময় কোষ—যাহাকে বলা যাইতে পারে প্রকৃতি পুরুষের অভেদস্থান, এবং আর-একটি হ'চ্চে ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডের হিরণ্ময়-কোষ—যাহাকে বলা যাইতে পারে জীবাত্মা-পরমাত্মার অভেদ-স্থান।

প্রশ্ন॥ কাহাকেই বা তুমি বৃহদ ব্রহ্মাণ্ডের হিরণ্ময় কোষ বলিতেছ—কাহাকেই বা তুমি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের হিরণ্ময় কোষ বলিতেছ, আর সে দুইটি কোষের কাহাকেই বা কী-অর্থে মুখ্যস্থান বলিতেছ তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না; অতএব তোমার বক্তব্য কথাটা তুমি আমাকে আর-একটু স্পষ্ট করিয়া ভাঙিয়া বলো।

উত্তর॥ মুখ-শব্দের শেষাক্ষরে য-ফলা দিলেই তাহা মুখ্য-শব্দে পরিণত হয়। তোমার মুখমণ্ডলটাই তোমার শরীরের মুখ্য স্থান; আর, তোমার শরীরের সেই মুখ্যস্থানটিতে তোমার আত্মার ছবি অঙ্কিত রহিয়াছে। আর সেইজন্য—তুমি যখন আমার নিকটে আগমন কর, তখন আমি তোমার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলি যে, "ইনি আমার পরম বন্ধু দেবদত্ত", তা বই—এ কথা বলি না যে "এটা দেবদত্তের মুখমণ্ডল"। তুমি আমার সমীপস্থ হইলেই তোমাকে আমি আমার প্রত্যক্ষের আয়ত্তের মধ্যে ধরিয়া পাই বলিয়া তোমার মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে আমার এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হয় না; পক্ষান্তরে যিনি যত বড়ই জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিত হউন্ না কেন—সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আয়ত্তের মধ্যে ধরিয়া পাইতে তাঁহার মহা দুর্বীণেরও সাধ্যে কুলায় না—মহা বিজ্ঞানেরও সাধ্যে কুলায় না; আর যিনি যত বড় কবি হউন্ না কেন—তাঁহার স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল-ভেদী মহা কল্পনারও সাধ্যে কুলায় না। কিন্তু তাহা সত্বেও—নব্যযুগের নব্যতম জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতেরা বহুতর অনুসন্ধানের দুর্বীণ কসিয়া এবং বহুবিধ পরীক্ষার ফাঁদ পাতিয়া এইরূপ একটা জগৎজোড়া সিদ্ধান্ত তাঁহাদের নবীন বিজ্ঞানের আয়ত্তাধীনে বাগাইয়া আনিতে পিছ্‌পাও হ'ন নাই যে, অমুক নক্ষত্র-রাশির অমুক স্থানে সূর্য্যের সূর্য্য অধিষ্ঠান করিতেছে, আবার সে সূর্য্যেরও সূর্য্য—দ্বিতীয় সূর্য্যেরও সূর্য্য—আকাশের সুদূরতম আর এক স্থানে অধিষ্ঠান করিতেছে! অতএব যদি বলা যায় যে, মনুষ্যের মুখমণ্ডল যেমন ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের (অর্থাৎ মানবদেহের) মুখ্যতম স্থান—সর্ব্বজগতের কেন্দ্রস্থিত অন্তরতম সূর্য্য তেমনি বৃহদ্ ব্রহ্মাণ্ডের মুখ্যতম স্থান, তবে তাহা নিতান্তই একটা ছেলে-ভুলানিয়া আরব্য উপন্যাস বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিবার কথা নহে।

আমাদের দেশের প্রাচীন উপনিষদাদি শাস্ত্রকে সহায় করিয়া আমি তাই বলিতে সাহসী হইতেছি যে, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের মুখ্যস্থান—কিনা ভগবৎ-প্রেমী পুণ্যাত্মার প্রসন্ন মুখমণ্ডল—যেমন তাঁহার আত্মজ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের মুখ্য স্থান—কিনা বিশাল বিশ্বভুবনের অন্তরতম সূর্য্য—তেমনি পরমাত্মার অপ্রতিম দিব্য জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্! আরো আমি বলি এই যে, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের সেই অন্তরতম সূর্য্যের বরণীয় ভর্গের প্রতি—পরমাত্মার মঙ্গলময় মুখজ্যোতির প্রতি—ধ্যান-চক্ষু নিবিষ্ট করিবার পক্ষে গায়ত্রীমন্ত্র বিশিষ্টরূপে ফলদায়ক বলিয়া আমাদের দেশের সাধকগণের নিকটে গায়ত্রী মন্ত্রের এতাধিক মর্য্যাদা-মাহাত্ম্য। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরতম কেন্দ্র—যাহা ভগবৎপ্রেমী মহাপুরুষগণের বিমল মুখজ্যোতির মূল আকর—তাহাকে আমাদের দেশের সাধক-মণ্ডলী সহস্র-রশ্মির সহিত উপমা দিয়া গুরূপদিষ্ট তান্ত্রিকী ভাষায় সহস্রদলপদ্ম বলিয়া রূপকচ্ছলে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; আর ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত এই যে সহস্র-রশ্মি—ইহা তাঁহাদের বোধে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরতম সূর্য্যের সংক্ষিপ্ত প্রতিকৃতি (miniature)। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের মুখ্য স্থানের অন্তর্নিগূঢ় আধ্যাত্মিক জ্যোতিষ্কেন্দ্রকে যে-নামেই যিনি নির্দ্দেশ করুন্ না কেন—নামে কিছুই আইসে যায় না। প্রকৃত কথা এই যে, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের হিরণ্ময় কোষে, অথবা—যাহা একই কথা—সর্ব্ব জগতের অন্তরতম সূর্য্যমণ্ডলে, পরমপুরুষ পরমাত্মার সহিত অভিন্ন-ভাবে সেই জগৎপ্রসবিত্রী প্রকৃতি, সেই সাবিত্রীশক্তি, বিরাজমানা—গায়ত্রীতে যাহাকে বলা হইয়াছে "বরণীয় ভর্গ"; আবার, তেম্নি-ধারা অভিন্ন ভাবে, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের হিরণ্ময় কোষে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মা নিগূঢ়তম প্রেমানন্দে ভাসমান। উপনিষদে স্পষ্ট লিখিত আছে "হিরণ্ময়ে পরে কোষে

বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং। তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ॥”

ইহার অর্থ :—

“হিরণ্ময় পরম কোষে নিষ্কলঙ্ক এবং নিষ্কল ব্রহ্ম প্রকাশ পা'ন ;—সেই শুভ্র জ্যোতির জ্যোতি প্রকাশ পা'ন—যাঁহাকে আত্মজ্ঞানীরা জানেন।”

আমাদের দেশের আদিম ঋষিতপস্বীরা অধ্যাত্ম যোগের সাধনদ্বারা মনকে নির্ম্মল এবং পবিত্র করিয়া—শান্ত দান্ত সমাহিত হইয়া—ঐ দুই হিরণ্ময় কোষে পরম সত্য পরমাত্মার মঙ্গলময় মুখজ্যোতি দর্শন করিয়া পরম কৃতকৃতার্থতা লাভ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বতন কালের সাধু মহাত্মারা একদিকে যেমন ধ্যান-যোগে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আর কোনো লাভকেই তাহা অপেক্ষা অধিক লাভ মনে করিতেন না, আর-এক দিকে তেমনি তাঁহারা পরমাত্মাকে স্মরণপূর্ব্বক তাঁহাতে কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেন। তার সাক্ষী—ভগবদ্‌গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ে স্পষ্ট লেখা আছে—

“ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণা স্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা।
তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদান তপঃ ক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাং॥
তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃ ক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ॥
সদ্‌ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে॥

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥”

গীতার এই বচন-গুলির তাৎপর্য্য সংক্ষেপে এই :—

ক্রিয়াকর্ম্মের অনুষ্ঠানকালে অনুষ্ঠাতা ওঁতৎসৎ উচ্চারণ পূর্ব্বক অনুষ্ঠিতব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হ'ন। তৎ শব্দের উচ্চারণ দ্বারা ব্রহ্মে লক্ষ্য স্থির করিয়া ফলাভিষন্ধি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কর্ত্তব্য সাধনে তৎপর হ'ন। সৎশব্দ উচ্চারণ-পূর্ব্বক সৎস্বরূপ পরমাত্মাকে কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া সদ্‌ভাবে এবং সাধুভাবে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন।

কিয়ৎমাস পূর্ব্বে ওঁতসৎ মন্ত্রের অর্থ আমি যাহা বুঝি তাহা সাহিত্য সম্মিলনী সভার কোনো একটি বিশেষ অধিবেশনে সংক্ষেপে বলিয়া চুকিয়াছিলাম এইরূপ :—

“পারমার্থিক সত্যের মূলমন্ত্র ওঁতৎসৎ। তৎশব্দের সামান্য অর্থ— ঘটি বাটি চেয়ার টেবিল্ প্রভৃতি যা তা জ্ঞেয়বস্তু; আর তাহার বিশেষ অর্থ—পরম জ্ঞেয় বস্তু অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট জানিবার বস্তু; তার সাক্ষী—উপনিষদে আছে “তদ্‌বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম” “সেই বস্তুকে জানিতে ইচ্ছা কর—সে বস্তু ব্রহ্ম।” তৎশব্দের সামান্য অর্থ যেমন যা তা বস্তু এবং বিশেষ অর্থ যেমন পরম বস্তু—সৎশব্দের সামান্য অর্থ তেমনি তুমি আমি তিনি প্রভৃতি যে-সে সজ্জন বা সৎপুরুষ, আর, তাহার বিশেষ অর্থ পরম পুরুষ পরমাত্মা। বেদান্তাদি-শাস্ত্রের মতে পরমাত্মা শুধুই কেবল পরম লক্ষ্য বস্তু নহেন—শুধুই কেবল তৎ নহেন; একদিকে যেমন তিনি জ্ঞানের পরম বিষয় “তৎ,” আর এক দিকে তেমনি তিনি জ্ঞানের পরম আশ্রয় (subject)—স বা সৎ কিনা পরম আত্মা। “তৎ” কিনা সত্যস্বরূপ পরম বস্তু, “সৎ” কিনা

মঙ্গল-স্বরূপ পরম আত্মা। "ওঁতৎসৎ" কিনা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা পরমেশ্বর সত্য এবং মঙ্গল একাধারে; তিনি জানিবার বস্তু এবং জানিবার কর্ত্তা একাধারে; তিনি উপাদান কারণ এবং নিমিত্ত কারণ একাধারে; তিনি প্রকৃতি এবং পুরুষ একাধারে; তিনি মাতা এবং পিতা একাধারে; এক কথায়—তিনি মোট জ্ঞানের মোট সত্য—তিনি পরিপূর্ণ সত্য পরমাত্মা।" ভগবদ্‌গীতার শাস্ত্রকার মহর্ষিদেব তাই বলিতেছেন

"শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান-কালে অনুষ্ঠাতা "ওঁ তৎসৎ" উচ্চারণ পূর্ব্বক অনুষ্ঠিতব্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। তৎশব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক ফলাভিষন্ধি পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে লক্ষ্য স্থির করিবেন, এবং সৎশব্দ উচ্চারণ-পূর্ব্বক মঙ্গল স্বরূপ পরমাত্মাতে মনঃসমাধান করিয়া সদ্‌ভাবে এবং সাধুভাবে অনুষ্ঠিতব্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন।"

গীতা-শাস্ত্রের মুখ্যতম সার উপদেশ শেষ অধ্যায়ে এইরূপ পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে :—

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন

"সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততোবক্ষ্যামি তে হিতং॥
মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং তে সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

ইহার অর্থ :—

সর্ব্বাপেক্ষা নিগূঢ়তম একটি বাক্য এবার তোমাকে আমি বলিতেছি—আমার সেই পরম বাক্যটি শোনো। তোমাকে আমি বড্ড

ভালবাসি তাই তোমার হিতের জন্য বলিতেছি। তুমি আমাগত-চিত্ত হও, আমার ভক্ত হও, আমার প্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠাতা হও, আমাকে নমস্কার কর; তোমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি আমি তোমাকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিব—প্রিয় তুমি আমার। সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র তুমি আমার শরণাপন্ন হও—আমি তোমাকে সমস্ত পাপতাপ হইতে মুক্ত করিব—কাঁদিও না।"

কিয়ৎ পরে যখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন

"কচ্চি দেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেন চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞান সম্মোহঃ প্রণষ্টস্তে ধনঞ্জয়॥"

অর্থাৎ

"মনঃস্থির করিয়া শুনিলে পার্থ যাহা আমি বলিলাম? তোমার অজ্ঞান-জনিত মনের ধন্দ ঘুচিল ধনঞ্জয়?

অর্জ্জুন বলিলেন

"নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎ প্রসাদান্ ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥"

অর্থাৎ

"মোহ বিনষ্ট হইল! তোমার প্রসাদে অচ্যুত আমি চৈতন্য লাভ করিলাম! আমার সন্দেহ গিয়াছে, আমি স্থির হইয়াছি! করিব আমি যাহা তুমি বলিলে।"